দিনের আলোয়

সোভিয়েত লেখকদের সম্প্রতিকালের কিছু সেরা গল্প স্থান পেয়েছে সংকলনটিতে। লিখেছেন রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, কিরগিজিয়া, তুর্কমেনিয়া প্রভৃতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের লেখকেরা। তার মধ্যে আছেন লেনিন পুরস্কার ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিজয়ী চ. আইতমাতভ, এ. কাজাকেভিচ, ন. চুকোভস্কি প্রভৃতি কথাসাহিত্যিক। এমন সব নবীন লেখকের রচনাও এতে পাওয়া যাবে, ইদানীং কালে ছোটো গল্পে যাঁরা বিশেষ শিল্পকৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রায় সমস্ত গল্পই বাংলা ভাষায় অনূদিত হল এই প্রথম। সংকলনে একটি ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচয়ও দেওয়া আছে।

দিনের আলোয়

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের গল্প

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ইউরি ক্রাস্নি

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ
НАРОДОВ СССР

На языке бенгали

সূচি

ভূমিকা

১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসের সময় বহু প্রতিনিধি ও বিদেশী অতিথিদের চোখে পড়তে পারত সভাপতিমণ্ডলীতে মাক্সিম গোর্কির পাশে দাগেস্তানের লোক-কবি সুলেমান স্তালস্কির বর্ণোজ্জ্বল মূর্তি। এই যে কবিকে গোর্কি বলেছিলেন 'বিশ শতকের হোমার' তিনি সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে বসে বসে গুনগুন করে নিজের কবিতা রচনা করছিলেন এবং কিছু পরেই সবাইকে অবাক ক'রে তা আবৃত্তি ক'রে শোনান। সম্ভবত সেই সময়েই সেই প্রথম কংগ্রেসেই প্রথম পরিষ্কার হয়ে ওঠে এক তর্কাতীত ঘটনা: সোভিয়েত সাহিত্য মানে মাত্র রুশী সাহিত্য নয়, সারা সোভিয়েত জগতের সাহিত্য।

সোভিয়েত সাহিত্যের অর্ধশতকী অস্তিত্ব ও প্রথম কংগ্রেসের পরবর্তী তেত্রিশ বছরের মধ্যে দেশের সাহিত্যিক মানচিত্র একেবারে বদলে গেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি ও জাতিসত্তার সংখ্যা শতাধিক। অক্টোবর বিপ্লবের পর তাদের অনেকের মধ্যেই শুরু হয় সত্যিকারের এক সাংস্কৃতিক নবজাগৃতি ও নবায়ন। সংস্কৃতি রক্ষার প্যারিস কংগ্রেসে সে কথা মনে করিয়ে দেন বিখ্যাত তাজিক কবি হাসেম লাহুতি। তিনি বলেন, 'মহম্মদ বা খৃষ্ট মৃতের পুনর্জন্ম দেবেন; এটা অবশ্যই কিংবদন্তী, কল্পকথা... কিন্তু লোকে তাঁদের কথা বলেছে, গড়ে উঠেছে উপাখ্যান, রূপক। জয়গান গেয়েছেন কবিরা। আর অক্টোবরে পুনর্জন্ম পাওয়া জাতি এটা হল ঘটনা, বাস্তবতা... এদের

কথা কোথাও উঠত না, এমন কি অভিধানে তাদের নাম পর্যন্ত পাওয়া যেত না। স্তেপে ও তুন্দ্রায়, পাহাড়ে ও উপত্যকায় অজ্ঞাত বিস্মৃত এক জীবন কাটাত তুর্কমেনীরা, কারেলরা, তাজিকরা, নেনেৎসরা, উইগুর, কারাকল্পক এবং গণ্ডা গণ্ডা যাযাবর ও স্থিতুবসতী ছোটো বড়ো নানা জাতি।' এটা অতীতের ব্যাপার। এখন কথা ক'য়ে উঠেছে পূর্বের নির্বাক জাতিরা। লাহুতি যাদের কথা বলেছেন, তাদের নিয়ে ৪০টির বেশি জাতিসত্তা ১৯১৭ সালের পর লাভ করেছে নিজেদের লিপি, নিজেদের মাতৃভাষায় পত্রিকা ও পুস্তক।

বর্তমানে সোভিয়েত সাহিত্যের একই 'চালার' তলে যেমন পাওয়া যাবে অতি প্রাচীন সংস্কৃতির জাতি যাদের লিখিত লিপি শুরু হয়েছিল প্রায় দেড় হাজার বছর আগে (আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি) তেমনি এমন সব জাতি যাদের সাহিত্য বিকশিত হয়েছে কেবল সোভিয়েত রাজের আমলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান সাহিত্য আজ নানা সাহিত্যে গড়া, আলেক্সেই তলস্তয়ের ভাষায় 'বহু কণ্ঠের পরস্পর সমৃদ্ধ ঐকতানের এক সাহিত্যিক কোরাস'।

অতীতে যে সব জাতি ছিল সবচেয়ে পশ্চাৎপদ তাদের দৃষ্টান্ত থেকেই জাতীয় সংস্কৃতির নবজন্মের প্রক্রিয়াটা সবচেয়ে ভালো লক্ষ করা যায়। ছোট্ট একটি জাতি উদেগে — আলেক্সান্দর ফাদেয়েভ এদের নিয়ে লিখেছিলেন তার উপন্যাস 'শেষ উদেগে' — আজ সে জাতি থেকে এসেছে জান্সি কিমোঙ্কোর অপূর্ব প্রতিভা, বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস 'যেথা ছোটে সুকপাই'। তুভা জাতির নিজস্ব লিপি জোটে কেবল তিরিশের দশকে, আর পনের বছরের মধ্যেই দেখা দেয় তুভা সাহিত্যের নিজ কবি, নিজ কথাসাহিত্যিক। তুভা সাহিত্যিক সালচাক তোকার 'রাখালের

উপাখ্যান' সীমান্তের বাইরে বহু দেশেই পরিচিত। চুকচি লেখক ইউরি রীৎহেউয়ের বইয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলের স্বকীয় এক রূপ ও বৈশিষ্ট্য।

আর যেসব জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস আরো প্রাচীন, তাদের ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে অসাধারণ সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসাবে মধ্য এশিয়া, ট্রান্স-ককেশাস ও সাইবেরিয়ার বহু জাতির নাম করা যায়, যাদের সাহিত্যে উপন্যাস, দীর্ঘ কাহিনী, ছোটো গল্প প্রভৃতি শাখা ছিল না। আজ বহুজাতিক সোভিয়েত ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সেটা ধনোচ্ছল।

লেনিন পুরস্কার জয়ী কাজাখ লেখক মুখতার আউয়েজভের অপরূপ মহাকাব্যিক ক্যানভাস আজ সারা বিশ্বেই পরিচিত ('আবাই')। বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে সাদ্রিদ্দীন আইনীর 'আরব্য রজনীর' মতো বর্ণবহুল, ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত ('বোখারা' প্রভৃতি), কিরগিজ লেখক চেঙ্গিস আইতমাতভের অতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ছবি 'পাহাড় ও স্তেপের কাহিনী।'

ইউক্রেন, বেলোরাশিয়া, বলটিক প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির সাহিত্যে বর্তমানে অতি চিত্তাকর্ষক ফলপ্রদ সব ধারা দেখা যাচ্ছে। ইদানীং কালে সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার — লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন এস্তোনিয়ার লেখক ইউ. স্মুউল, লিথুয়ানিয়ার লেখক এ. মেজেলাইতিস, ইউক্রেনের লেখক ও. গনচার।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশন ইতিমধ্যেই বার কয়েক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতীয় প্রজাতন্ত্রের সেরা লেখকদের রচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। 'দিনের আলোয়' সংকলনটিতে সে পরিচয় আরো পরিবর্ধিত হবে।

রুশ ফেডারেশন ও অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের যে সব লেখকেরা হালে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের রচনা সংকলিত হয়েছে এতে। দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের পাশেই আছে কাব্যময় তরুণ সাহিত্যিকদের রচনা, যাদের বই জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে মাত্র পাঁচ ছয় বছর। প্রায় প্রতিটি গল্পই আমাদের বর্তমান কাল নিয়ে। তবে সুদূর ও নিকট অতীতের কিছু পাতাও আছে এতে, আছে মহান স্বদেশী যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। তবে অতীতের ছবির মধ্যেও লেখকেরা উদ্ঘাটিত করেছেন বর্তমানের সমস্যা। অতীত যেন হয়ে ওঠে আধুনিক মানুষেরই আত্মার কাহিনী।

বইটির পাতা উলটিয়ে গেলে আপনি সোভিয়েত দেশের নানা অঞ্চলই ঘুরে আসবেন। ম. তেভেলেভের সঙ্গে যাবেন ট্রান্স-কার্পেথীয় অঞ্চলে, আর আ. কাখহারের সঙ্গে পেঁছবেন উজবেকিস্তানের মহল্লায়, আর সারিখানভের 'কিতাব' গল্পে বুড়ো তুর্কমেন ভেলমুরাত-আগা তাঁর ঘরের দরজা খুলে দেবেন মেহমানের জন্যে, আর সমান আতিথেয়তায় কাজাকেভিচের গল্পের মস্কো আপনাকে বরণ করে নেবে। আর প্রতিটি লেখকই বলেছেন সবচেয়ে বড়ো কথাটি — মানুষের কথা, তার সংগ্রামের কথা, মানুষের জীবননাট্য যত কঠিনই হোক, তার সুখের সংকল্প, সুখলাভের আনন্দ যে অপরাজেয়, সেই বার্তা।

নুরমুরাদ সারিখানভ

কিতাব

তুর্কমেন বিজ্ঞান আকাদমির সাহিত্য ইনস্টিটিউটের নির্দেশক্রমে আমার কাজ পুরনো পুঁথি জোগাড় করা। ভাগ্যচক্রে সেবার গিয়ে পড়েছিলাম কারা-কুমের একেবারে গভীরে, পশুপালক একটা আউলে, চারিদিকে বালির মধ্যে অনতিবৃহৎ একটা খাদের মতো জায়গাটা।

যা হয়, আউলের লোকেরা উৎসুক হয়ে উঠল: কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি? আগমনের কারণ জানালাম। উঠেছিলাম কলখোজ সভাপতির বাড়িতে। তাঁর কাছে শুনলাম তাঁর পড়শী ভেলমুরাত-আগার কাছে একটি কিতাব আছে, ঠিক যেমনটি আমার দরকার তেমনি।

বললেন, 'জিনিসটা খুবই দুর্লভ! ভেলমুরাত-আগা ওটিকে চোখের মণির মতো আগলে থাকে। কতবার বলেছে, অমন কিতাব সোনার সিন্দুকে তুলে রাখার মতো...'

গেলাম কিতাবের মালিকের কাছে। মালিককে ঘরেই পেলাম। লোকটির বয়স হয়েছে, এক বুক সুন্দর দাড়ি।

আমার দিকে চাইলে ঠিক স্তেপের শিকারীর মতো সন্ধানী দৃষ্টিতে, কিন্তু ভদ্রতা করলে যথেষ্টই।

'বসো ছেলে, চুল্লির কাছে এসে বসো,' ডাকলে সমাদর করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল প্রশ্ন:

'কোত্থেকে আসা হল?'

জবাব দিলাম।

'জন্ম কোথায়? কুলের লোকেরা কোথায় থাকে? কী করা হয়?'

সংক্ষেপে নিজের জীবন বৃত্তান্ত জানিয়ে বললাম পুরনো পুঁথির সন্ধানে রাজধানীর একটা প্রতিষ্ঠান থেকে আসছি।

'ভালো কথা!' বিশাল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুড়ো ফের আমায় নজর করতে লাগল। তারপর বৌয়ের দিকে ফিরে হুকুম দিলে, 'কিতাবটা দাও তো!'

ছাউনির জাফরি কাটা দেয়ালে টাঙানো গালিচায় তৈরি চুভাল*, তার ভেতর থেকে বুড়ি নকসা কাটা রেশমী রুমালে বাঁধা মস্ত এক কিতাব বার করলে। সসম্ভ্রমে সেটা সে স্বামীকে দিলে এমন ভাব করে যেন একটা পবিত্র জিনিস। বুড়ো আরেকবার সন্ধানী দৃষ্টিতে চাইলে আমার দিকে।

বললে, 'পেশার কথাটা যদি সঠিক বলে থাকো তাহলে এটা যে কী জিনিস বুঝতে দেরি হবে না।'

বইটা বেশ মোটা এবং ভারি, বিবর্ণ রঙীন কাপড়ে বাঁধানো, তাতে লালচে ফুলের ছাপগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। প্রতিটি পাতায় সমান ছাঁদের টকটকে লাল আরবী হরফে প্রায় কুড়িটি ক'রে পঙক্তি। পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না — বোঝা যায় লিপিকার তার কাজটা ভালোই জানত। দানার পিঠে দানার মতো প্রতিটি হরফ সাজানো। বোঝা যায় এ কিতাব আগ্রহ ক'রেই পড়া হয়, পাতার ধারগুলো দোমড়ানো, ভেতরে আঙুলের কালচে ছাপ।

তাড়াতাড়ি পাতা উলটিয়ে গেলাম, চোখ বুলিয়ে কিছু কিছু পড়েও দেখলাম। এটা ঠিক সেই জিনিস যার সন্ধানে আমার পেশার লোকেরা রাতে ঘুময় না, আউলে আউলে ঘুরে বেড়ায়, হাজার দুয়োরে করাঘাত করে... আরো একশটা আউল আর ছাউনি ঘুরলেও এমন একটা সংকলন মেলা কঠিন। আমার প্রথম কর্তব্য দাঁড়াল আলাপীর কাছ থেকে মনের আনন্দ যথাসম্ভব চেপে রাখা। কিন্তু অচিরেই পরিষ্কার

---

* থলি। — সম্পাঃ

হয়ে গেল যে বুড়ো তার গুপ্তধনের দামটা ভালোই জানে। 'এ কিতাবের এক একটা শব্দেরই দাম এক এক জোড়া উট' কথাটা সে খামোকাই বলে নি। বুড়োকে যাচাই করার জন্যে আমি পাণ্ডুলিপিটির কিছু কিছু জায়গা চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কয়েক ছত্র পড়তে না পড়তেই বুড়ো পরের পঙক্তিগুলো মুখস্থ আউড়ে গেল...

'এবার বিশ্বাস হল তো ছেলে, এ কিতাব সোনার সিন্দুকে তুলে রাখার মতো?' এই বলে সুর ক'রে যে শ্লোকটি প'ড়ে শোনালে সেটা বোঝাই যায় তার একটি প্রিয় কবিতা। উদ্দীপনার সঙ্গে বললে, 'দেখলে কেমন? যত পড়বে তত জমে যাবে, মাতাল করে ছাড়বে।'

এ সবই খুবই ভালো, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি দখল করা যায় কী ক'রে? বোঝা গেল, বুড়ো ওটা বেচবে না। শুধু বুড়োই তো নয়, তার বৌ এবং আউলের অধিকাংশ বাসিন্দাই যে কিতাবটির ভক্ত।

আমি ভাব করলাম যেন ও কিতাবে আমার তত বেশি আগ্রহ নেই, অন্য প্রসঙ্গে কথা ঘোরালাম। জিজ্ঞেস করলাম: ওদের আউলটা নাকি আমু-দরিয়ার কাছে উঠে যাবার তোড়জোড় করছে, সেখানে নাকি চাষবাসে লাগবে? বুড়ো জবাব দিয়ে ফের কিতাব নিয়ে উচ্ছ্বাস শুরু করলে। এমন ধনের সে অধিকারী এ নিয়ে তার গর্বের সীমা ছিল না, এবং বলাই বাহুল্য কদাচ সে বইটি হাতছাড়া করতে রাজী নয়।

আমি চলে এলাম। ঠিক করলাম পুঁথিটি কী ক'রে যোগাড় করা যায় তার সম্ভবপর উপায় নিয়ে কলখোজ-সভাপতির পরামর্শ নেব।

সভাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটিকে হাত করা যায় কী ক'রে? বুড়ো মনে হয় পাণ্ডুলিপি তো বেচবেই না, নকল ক'রে নিতেও দেবে না।'

'এ কিতাব যদি তোমার এতই দরকার, তাহলে নিজেই উপায় খোঁজো। আমি নাচার।'

সন্ধ্যায় ফের গেলাম ভেলমুরাত-আগার কাছে। ফের বেশ আদর ক'রেই বসালে।

'ও আমি জানি। এ জিনিস যে একবার দেখবে সে আর সহজে নড়তে চাইবে না। তুমিই তো আর প্রথম নও।'

বুড়ো আমায় পুঁথিটা দিলে।

'ইচ্ছে হয়েছে যখন, বেশ, পড়ো।'

আমার আগমনের উদ্দেশ্যটার খানিকটা ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন বোধ হল। দ্বিধাভরে শুরু করলাম, 'ভেলমুরাত-আগা!'

'কী?'

'এ কিতাব আপনার কাছে আছে কতদিন?'

'চল্লিশ বছর।'

'চল্লিশ বছর?'

'হ্যাঁ বেটা।'

'কতকগুলো কবিতা আপনার মুখস্থ কেন সেটা এবার বুঝলাম!'

'কতকগুলো নয় হে,' সংশোধন ক'রে দিলে গৃহস্বামী, 'গোটা কিতাবের প্রতিটি কথাই আমার মনে আছে। কিতাব না খুলে তার যত গান আছে সব পর পর শোনাতে পারি। গানগুলোর ভাব যে আমার কলজের মধ্যে আঁকা আছে গো।'

বললাম, 'চমৎকার! খোদ পাণ্ডুলিপিটার তাহলে তত দরকার নেই।'

ক্ষিপ্র একটা তীব্র দৃষ্টিপাত করলে বুড়ো।

বিব্রত লাগল আমার, সহজ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা ক'রে বললাম:

'যা দাম চান বলুন, কিতাব আমায় বেচে দিন!'

মুহূর্তের মধ্যে বুড়োর চেহারা বদলে গেল, অদ্ভুত রকমের বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, মুখটা হয়ে উঠল টান-টান, ফ্যাকাশে। বুড়িও শিউরে উঠল।

হুট করে পুঁথিটা আমার হাত থেকে নিয়ে বুড়ো বৌকে দিয়ে দিলে। কড়া ক'রে বললে, 'জায়গা মতো রেখে দাও!'

তারপর ফের চোখ তুলে মৃদুস্বরে বললে, 'আমি আর আমার বৌ, এ বই আমরা হাতছাড়া করব না! কেন, সে কথা বলি নি তোমায়? তুমি মেহমান, তাই মন খুলেই বলছি, ও কিতাব বাপু চেয়ো না। আমি যদি বা ও কিতাব দিতে রাজীও হই, বৌ কিন্তু দেবে না। বৌ যদি বা দেয়, যত দৌলতই দাও আউলের লোক দেবে না। এমন কি যখন দুর্ভিক্ষ লেগেছিল, শুকনো রুটি ছিল না ঘরে, তখনো কিতাব বেচার কথা স্বপ্নেও মনে হয় নি। তাছাড়া ও কিতাব কী ক'রে পেলাম তা তো তুমি জানো না।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বুড়ো যেন আপন মনেই ফের বলতে লাগল:

'কিতাব কী ক'রে হাতে এল শুনবে নাকি? আজ পর্যন্ত কাকেও সে কথা বলি নি। আমি আর আমার বৌ ছাড়া সে কাহিনী প্রায় আর কেউই জানে না।'

'বলুন! বলুন-না ভেলমুরাত-আগা!' সোৎসাহে ব'লে উঠলাম আমি, আগ্রহ চেপে রাখার চেষ্টাও করলাম না।

ভেলমুরাত হাতের চেটো দিয়ে চাপড় মারলে কোশমায়*, তারপর চোখ তুলে স্থির কণ্ঠেই বললে:

'বেশ, তবে শোনো!..'

'বয়স আমার পঁয়ষট্টি। এ কিতাব যবে থেকে আমার হাতে এসেছে, এই শরতে তার চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। যে বছর এটা পাই সে বছরটার নাম হয়েছিল শীতের বছর। বরাবরের মতো আমি তখনো রাখাল, বুঝতেই পারছ, কিতাব যে কী জিনিস তার কোনো জ্ঞানই ছিল না, কথাটা শুধু কানে শুনেছিলাম মাত্র। ব্যাপারটা হয়েছিল এই। সংসারী হলাম, ছাউনি জোটালাম, তারপর উট কিনলাম একটা। লোকজনের সঙ্গে বাস, তাই ঠিক করলাম শীতের জন্যে দানা জমাতে হবে, আরকাচে** যাবার তোড়জোড় করলাম। পশমের বোঝা বাঁধলাম, তারপর সাকসাউল কাঠ দিয়ে কয়লা বানিয়ে রওনা দিলাম। আরকাচে চেনা লোক কেউ ছিল না, আমার কাছ থেকে পশম আর কয়লা কিনেছিল যে লোকটা তার কাছেই উঠলাম। লোকটা ধনী। রইলাম ওর ওখানেই রাত কাটাবার জন্যে। সন্ধ্যার আগে ঘরে লোক জুটতে লাগল: আউলের বুড়ো জোয়ান যত পুরুষ। সকলের মধ্যে একটা লোককে খুবই চোখে পড়ল — বেশ ঘটা ক'রে সাজ করেছে, গালভরা কোদালে দাড়ি, মুখখানা পুরুষ্টু, লালচে। লোকে তাকে ডাকছিল 'মোল্লা সায়েব' ব'লে।

---

* মোটা ফেল্টের সতরঞ্চি। — সম্পাঃ

** তুর্কমেনিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের একটি জায়গা (কোপেত-দাগের পাদদেশ)। — সম্পাঃ

'ওদের মধ্যেই কে একজন বললে, 'জনাব, মোল্লা সায়েব, আমাদের একটু প'ড়ে শোনান না।' এই ব'লে এই কিতাবটি এগিয়ে দেয়।

'মোল্লা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললে, 'এহ্, বেআক্কেলে সব! এ কিতাব এক বেমগজ শায়েরের লেখা, ধরম উল্টে দিতে চেয়েছে। যত বেয়াড়া খেয়াল জুটিয়েছে কোত্থেকে, কু আর গুনাহ্ প্রচার করেছে। আমি বরং অন্য কিতাব প'ড়ে শোনাই,' এই বলে তার চাপকান থেকে নিজের পুঁথি বার করলে।

'কিন্তু বৈঠকের লোক মোল্লার চেয়েও নাছোড়বান্দা। কে খানিকটা ভেট গুঁজে দিলে, মোল্লাও নরম হল। কিতাব পড়া চলল মাঝ রাত্তির পর্যন্ত, তারপর ভোর সকাল। বসে বসে আমি কেবলই শুনে গেলাম... কিতাব আমায় অবাক ক'রে দিলে, কাণ্ডজ্ঞান আমার আর নেই। কী যে আমার ভেতরে চলছে বুঝেই পাচ্ছিলাম না। ব'সে আছে লোকটা, কাগজ দেখে দেখে যেন নিজের কথাই বলছে, আর আমি যখন কান খাড়া ক'রে শুনি, দেখি আরে আমার কথাই বলছে। আর কী বুক দোলানো সোজা সোজা কথা! আগে কখনো ভাবিই নি যে কিতাবের মধ্যে এমন সাংঘাতিক জোর থাকতে পারে, জিন্দিগির কথা বলতে পারে অমন জ্ঞানীর মতো, নতুন ভাবে ভাবতে বলে। এই তুমি আজ যা ভাবছিলে ঠিক সেই কথাটিই মনে হল আমার: উহুঁ, এ জিনিস কেনার মতো দৌলৎ দুনিয়ায় নেই, এ বোধ হয় মোটেই বেচবার নয়। মনটা আমার ক্ষেপে উঠল: এ কিতাবের যদি কোনো দাম থাকে, আমার টাকায় যদি কুলোয়, তাহলে ও কিতাব আমি কিনবই।

'সকালে ঘরের কর্তার সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, মোল্লা-আগা যে কিতাব প'ড়ে শোনালে তার দাম কত?'

'কর্তা কেন জানি হেসে বললে, 'সঠিক দাম কেউ জানে না। কিতাব সে তো আর মেয়েদের রুমাল কি কয়লার বস্তা নয়। অত সহজে কিতাবের দাম ঠিক হয় না।' — 'তাহলে বলুন, কত দাম?'

'কর্তা ফের হাসলে, তারপর ঘরে যে লোকটি ছিল তার সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে বললে, 'এ কিতাবের দাম একটা উট, ভালো জাতের উট।'

'হয়ত লোকটা ঠাট্টা করেছিল, কিন্তু আমি বিশ্বাস ক'রে খুশি হয়ে উঠলাম। এতটুকু দোমনা না ক'রে ঠিক করলাম, যে উটে আরকাচে এসেছি, সেই উট-টাই দিয়ে দেব।

''আমার এই মাদী উট-টা খাসা উট, তার ওপর পেটে বাচ্চা। উট নিয়ে আমায় কিতাব দিন।' — 'তা বেশ, উট রেখে যা, কিতাব নিয়ে চলে যা খোদা হাফিজ ক'রে,' বললে কর্তা।

'নিজের উটটির দিকে শেষ বারের মতো চেয়েই আলখাল্লার তলে কিতাবটি লুকিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। তিন দিন ধ'রে হেঁটেছি, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বৌ আমায় দেখেই চিৎকার ক'রে ছুটে এল, 'আমাদের উট কোথায় গো? কী করলে ওটার?' বললাম, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। চেঁচামেচি করো না। না কেঁদে বরং আনন্দ করো। আমাদের উট-টা জাত উট, চমৎকার বাচ্চা দিয়েছে।' এই ব'লে আলখাল্লার তল থেকে বার ক'রে দিলাম কিতাব, বললাম, 'এই দ্যাখো, এই কাপড়ের মলাটের নিচে প্রতিটি কথার দাম সবচেয়ে দামী উটেরও বাড়া।'

'বৌ তাকিয়ে দেখলে কিতাবটার দিকে, খুললে, কপালে ঠেকালে, সারা মুখের ওপর বুলিয়ে নিলে। ভেবেছিল ধম্মের

কিতাব। অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বৌ, ভেবে পাচ্ছিল না খুশি হবে নাকি কাঁদবে। টের পাচ্ছিলাম, মাথা থেকে ওর উটের কথাটা যাচ্ছে না। ওই উটই তো আমাদের গরিব সংসারের একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা।

'বললাম কী ভাবে মোল্লা কিতাবটা পড়ে শুনিয়েছে, লোকে কী ভাবে কান খাড়া ক'রে শুনেছে, স্থির হয়ে আমি ব'সে থাকতেও পারি নি। কতকগুলো জায়গার মোট কথাটা বললাম — চিরকালের জন্যে কথাগুলো আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। দেখি, বৌয়ের চোখে জল চিকচিক করছে।

'বললে, 'তার চেয়ে বলো যে উট-টা তুমি জলে দিয়েছ। আমাদের সব ভরসা গেল...'

'হঠাৎ আফশোস হল কিতাবটা কিনেছি ব'লে। কিন্তু করবার কী আছে? আমাদের ওখানে বুদ্ধিমন্ত লোক ছিল এক জনা, সবাই বললে তার কাছে গিয়ে বুদ্ধি পরামর্শ চাইতে। আমি গিয়ে কবুল করলাম যে আমার কাছে এক কিতাব আছে, সে কিতাব পড়তে পারবে এমন লেখাপড়া জানা কারুর সন্ধান যদি দেন ভালো হয়। আমার কথায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে ও কিতাব আমার হাতে এল কী ক'রে? বললাম, 'শস্তা দর পেয়ে কিনেছি।'

'আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসলে, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরদ দেখিয়েই বললে, 'আরে বেকুফ ছোকরা! বিনা পয়সাতেও যদি পাস, সে কিতাবে তোর ফয়দা কী? ও কিতাব তোকে প'ড়ে শোনাবে কে?'

'যত দিন যায়, ততই অবস্থা আমার কাহিল হয়ে ওঠে। বৌ রাতদিন গজ গজ করে। আরো দু'চার জনের কাছে

পরামর্শের জন্যে গিয়েছিলাম, অন্য আউলেও খোঁজ নিলাম, কিন্তু লেখাপড়া জানা লোক আর কোথাও পেলাম না। লোকে আমায় বলত, 'আরে তুই যে রাখাল, গরিবের বাড়া গরিব, এ তোর কী খেয়াল বল তো!' আমি হার মানতে শুরু করলাম... ঘরে ফিরেই আমার দৌলৎটিকে ঢোকালাম চুভালের একেবারে তলায়, তার ওপর যত রাজ্যের আজেবাজে জিনিস চাপালাম। বললাম, 'চোখে তো আর দেখতে হবে না, দিনরাত্তির আফশোস থেকে কলজেটা জুড়বে।' এইভাবেই ও কিতাব প'ড়ে রইল এক বছর, দু'বছর ক'রে সাত বছর। আর এই সাত বছর ধ'রে বৌ কেবলি গজ গজ করেছে, 'আহ, কী জাত উটই না ছিল গো, গাভীন উট! আরো বার তিনেক বাচ্চা দিত আমাদের। সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটত। বুক এমন মোচড়াত না!..' তারপর কিন্তু হঠাৎ ক'রে ঝোঁক ধরত, 'সত্যি, কী ক'রে একবার শোনা যায় কিতাবটা বলো তো?'

'একদিন দুজনে চা খেতে বসেছি, বৌ বললে, 'লেখাপড়া জানে কেবল মোল্লা আর ইমামরা। ওরাই কেবল পুঁথি পড়তে পারে। অমনি কোনো জ্ঞানীগুণীর কাছে আমাদের ছেলেটিকে মুরাৎজানকে দিলে হয় না? মোল্লার কাছে থেকে পড়তে শিখবে, আমাদের কিতাবটা শোনাবে। যেমন ধরো আকচি-ইমাম — লোকে বলে ভারি বিদ্বান। ছেলেটিকে ওর কাছেই দিই, নিজেরা একলাই কোনো রকমে সংসার চালিয়ে নেব। পাঁচ বছরেই দেখো ও লেখাপড়া শিখে যাবে।'

'বৌয়ের কথায় ভারি আনন্দ হল। কিতাব পড়বার জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজী। ওই কথাই ঠিক হল। বয়স তখন ওর বছর আটেক — ছেলেটিকে নিয়ে গেলাম আকচি-ইমামের কাছে। আকচি-ইমামকে বললাম, 'দূর এলাকা থেকে আসছি গো আপনার কাছে আর্জি নিয়ে। আমাদের ছেলেটিকে

লেখাপড়া শেখাবার জন্যে নিন গো। যতদিন আপনার এখানে থাকবে, ততদিন যা নিয়ম তাই চলবে, ওর গতরটা আপনার, হাড়গুলো আমার। মারতে হয় মারবেন, কাজ করাতে হয় — হুকুম করবেন। শুধু লেখাপড়াটি ওকে শেখান।'

'ইমাম আমায় ভরসা দিলে।

'বললে, 'ছেলেটিকে এই যে নিয়ে এসেছিস, সাবাসের কাজ করেছিস। আমার নুন যে খেয়েছে, সে মানুষ হয়ে গেছে। ছেলেকে তোর যদি নিই তো দেখে নিস কী হয়। চার বছর পরে আসিস, ছেলেকে আর চিনতেই পারবি না।'

'আমি তাই বিশ্বাস করে সুখের ডানায় উড়ে চললাম বাড়িতে। বৌয়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'দুঃখ করিস না বৌ। চার বছর সহ্য ক'রে চলব, তার পর দেখিস কী হয়, তখন নিজেই বলবি কিতাব কিনে ভুল করেছি কি করি নি।'

'তিন বছর পেরিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, মুরাৎজান এর মধ্যে নিশ্চয় কিছু কিছু শিখেছে। ফের রওনা দিলাম ইমামের কাছে। আর কী দেখলাম জানো?

'ছেলে আমার সারা দিন খাটে, লেখাপড়া তো শেখেই নি, হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল তাও প্রায় যায়-যায়। কেঁদে কেটে কেবলি মিনতি করে, 'এখানে আমায় রেখে যেয়ো না বাপজান, শীগগির নিয়ে চলো। ইমাম আমায় খাটিয়ে খাটিয়ে মেরেছে, না খাইয়ে রেখেছে। আকচি-ইমাম নিজেই নিরক্ষর, লেখাপড়া মানে কী তাও সে জানে না।' আমি ছেলের মুখ চেপে ধরলাম, ইমাম সম্পর্কে অমন কথা মুখে আনাই যে পাপ! মুরাৎজান কিন্তু মানে না, আরো জোরে চেঁচায়, 'সঙ্গে যদি না নিয়ে যাও, পালাব, এখানে আর থাকব না!'

'ছেলে আমায় তাজ্জব বানালে। একেবারে হতভম্ব আমি। ঠিক করলাম ছেলের কথা যাচাই করি। আকচি-ইমামের এক পড়শীর কাছে গিয়ে উঠলাম। বললাম এই এই ব্যাপার। 'আপনার কী মনে হয়, ছেলেকে উনি লেখাপড়া শেখাবেন, নাকি শেখাবেন না?' দেখা গেল লেখাপড়ার ব্যাপারটা মুরাৎজান ঠিকই বলেছিল। ইমাম লিখতে পড়তে কিছুই জানত না। তাহলে লেখাপড়া জানা অনেক মোল্লার চেয়ে ওর দাপট বেশি কেন? আকচি-ইমামের দাপটটা হল ওদের বংশের দাপট, কী একটা গুহ্য মন্ত্র নাকি ওদের আছে। এ বংশের নাম করলেই গোটা আউল ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠত, ওদের নিন্দে করার সাহস কারো হত না... কিন্তু এই গুহ্য মন্ত্রটার ব্যাপারটা কী?

'ইমামের পড়শী আমায় বললে, 'একদিন এক তাজ্জব ব্যাপার হয়েছিল। আকচি-ইমামের এক পূর্বপুরুষ — সেও ছিল ইমাম, তার বাড়ি থেকে এক চাষী একদিন এক বোঝা বিচালি চুরি করে। বাড়ি ফিরে চাষী কিন্তু কিছুতেই আর পিঠ থেকে বোঝা নামাতে পারে না। ছেলেকে ডাকলে, সেও কিছু করতে পারল না। মনের দুঃখে অনুতাপ করে চোর ফিরে গেল যেখান থেকে বিচালি এনেছিল সেইখানেই রেখে আসবে ব'লে। কিন্তু সেখানেও কিছু হল না। সারা রাত সে পিঠে বস্তা নিয়ে সারা আউলে ঘোরাঘুরি করলে, ভেবে পেল না কী ক'রে আপদ বিদেয় করে। মালিকের কাছেই যেতে হল, মাপ চাইতে হল। বললে, 'ইমাম-আগা, অন্যায় কাজ করেছি, সারা রাত এই পাপ ব'য়ে বেড়িয়েছি কাঁধে। কলজে আমার অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। মাপ করো ইমাম-আগা, পিঠ থেকে বিচালি নামিয়ে নাও।' ইমাম অপরাধ ক্ষমা করলে, যেখান থেকে চুরি করেছিল সেই জায়গায় চোরকে পাঠালে। সেখানে ইমামের হুকুমে চোরের পিঠ থেকে বোঝা নামল। আকচি-ইমামের এই

পূর্বপুরুষ ছিল ডান। আকচি-ইমামেরও অনেক তুকতাক জানা আছে। ওর কাজ চলে নুন দিয়ে। যদি নুনে ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়ে, তাহলে আঁটকুড়ের ছেলে হয়, রোগীর রোগ সারে।'

ভেলমুরাত-আগা ব'লে চলল, 'এই সব শুনে আর ভেবে দেখারও কিছু ছিল না, মুরাৎজান নুনে ফুঁ দিতে শিখবে, ওতে আমার দরকার নেই। ইমামের কাছ থেকে নিয়ে ওকে রাখালির কাজে দিলাম।

'এইভাবেই চলল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। বসন্তে আমরা ছাউনি উঠিয়ে চলে যেতাম নতুন নতুন চারণ এলাকায়, শরতে আবার ফিরে আসতাম এই উপত্যকায়। কিতাবখানা চুভালেই প'ড়ে ছিল। মাঝে মাঝে মন কেমন করত, কিতাবখানা নিয়ে বেকার পাতা উলটে যেতাম আস্তে আস্তে। বসতাম মোল্লার মতো ক'রে, কিতাবখানাও ধরতাম ঠিক তারই কায়দায়, নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতাম, কিন্তু কিছুই আর হয় না, কিতাব আর কথা কয় না। বৌ-ও ফের আফশোস করত, 'এ কিতাব না কিনলে কী সুখেই না দিন কাটত। এতদিনে আমাদের পুরো এক পাল জাত উট হয়ে যেত ...'

'তারপর শুরু হল নতুন দিন,' ব'লে চলল ভেলমুরাত-আগা, 'আউলে আউলে যাযাবর এলাকাগুলোতে শুরু হল সোভিয়েত রাজ। মাস্টাররা এল, বই আনলে সঙ্গে ক'রে। আমাদের আউলেও এসে হাজির হল এক মাস্টার, ছেলে বুড়ো সবাইকেই জোটাতে লাগলে, যে পড়তে রাজী তাকেই। প্রথম দিন থেকেই আমি জুটে পড়লাম, বললাম আমার কিতাবের কথা। কিতাবখানা আনতে বললে মাস্টার, দিন' দুই নিজের কাছে রেখে ফিরিয়ে দিলে।

'বলে, 'তুই জানিস না ভেলমুরাত-আগা, এটা এক ভারি দামী তুর্কমেন পুঁথি। ছেলেকে পাঠিয়ে দিস আমার ইশকুলে। পড়তে শিখুক। আমার ঘরে ওকে সাকসাউল লাকড়ি কুড়িয়ে বেড়াতে হবে না, জলও বইতে হবে না, ক্ষেতমজুর আমার দরকার নেই। যতদিন মেয়াদ ততদিন ছেলেটা ইশকুলে আসবে, তারপর মা-বাপকে তোর কিতাব পড়ে শোনাবে।'

'আমি রওনা দিলাম স্তেপে, মুরাৎজান যেখানে রাখালি করত, খুঁজে বার করলাম সেই পালটা। বললাম, ফের ওকে পড়তে পাঠাব। 'যখন শিখে যাবি, তখন এতদিন ধ'রে এই যে দামী কিতাবখানা জমিয়ে রেখেছি সেটা তোর মা-বাবাকে পড়ে শোনাবি।" ছেলে বলে, 'উহুঁ, যাব না, দু'চক্ষে দেখতে পারি নি ওই মোল্লা ইমামদের।' বলে, 'এখন শহরে আউলে সোভিয়েত রাজ, আকচি-ইমামের বৌ যে আমায় দিয়ে জল বওয়াবে, সেটি আর হচ্ছে না।' বললাম, মোল্লার কাছে পড়তে হবে না, লোকেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে সরকার থেকে মাস্টার পাঠিয়েছে। মুরাৎজানের মত করালাম, ছেলে সংসারের কাজে মায়ের সাহায্য করত, সেই সঙ্গে দেখতে না দেখতে লিখতে পড়তেও শিখে গেল। মুরাৎজান এখন পাশের জেলায় পশুখামারের কর্তা।

'লেখাপড়া ও যখন শিখলে, তখন চুভালের তল থেকে কিতাবখানা বার করলাম আমি, ছেলে আমাদের আগাগোড়া পড়ে শোনালে। তখন আমার খেয়াল হল, কিতাব সে কিছু আর আসমানের জিনিস নয়, আমাদের মতো লোকের বুদ্ধিতেও তার মানে বোঝা কঠিন নয়। এমন কি এমন সব গানও পাওয়া গেল কিতাবে, যা আমরা রাখালেরাই স্তেপে গেয়েছি কতবার।

তাছাড়া কবিতাগুলোর বেশির ভাগই সু-কু'য়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে, হকের কথা, সত্যের কথা নিয়ে, নির্ভয়ে বীরের মতো যারা নিজেদের সুখের জন্যে লড়েছে তাদের নিয়ে। দেখা গেল মোল্লার মুখে যখন শুনেছিলাম তখন এ কিতাবের শতকরা এক ভাগও বুঝি নি। অথচ নিজের ঘরসংসারটির মাঝে ছেলের মুখে যখন শুনলাম, তখন তার পুরো রূপটি যেন ফুটে উঠল। এর পর আমার বৌয়ের কাছে, গোটা আউলের লোকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে উটের বদলে কিতাব কিনে ভেলমুরাত-আগা ঠকে নি...'

'দেখলে তো ছেলে,' কথা শেষ ক'রে বললে ভেলমুরাত-আগা, 'এ কিতাবের জন্যে কত আমাদের সইতে হয়েছে। আমাদের গোটা সংসার যা কষ্ট করেছি সে কথা জানার পর এ দৌলৎ আমার কাছে চেয়ে নেবার সাহস কি কারো হতে পারে? নাও না, এই তো কিতাব রয়েছে, যত খুশি পড়ো, কিন্তু ও কিতাব আমি হাতছাড়া করব সে মতলব ছেড়ে দাও...'

ভেলমুরাত-আগার গল্প যখন শেষ হল তখন মাঝ রাত অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। এর পর বুঝিয়ে রাজী করাতে যাওয়া একেবারেই বৃথা। আশখাবাদে পুঁথিটা আমরা ছাপাতে পারি, অনেক কপি করতে পারি, আউলের সব চাষীই তখন এ বই পড়তে পারবে, শেষ কথা, পুঁথিটা তার কাছ থেকে নিয়ে দু'তিন মাস পর পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় সেটা ফেরত দিতে পারি, এ সব কথা যদি বলতে যেতাম তাহলে কানেও সে তুলত না। ও পুঁথির মধ্যে যে তার নিজের কলজেটাই রয়েছে, তার গোটা জীবন যে ওর সঙ্গে জড়িত, কোনো রকম কিছু বুঝিয়েও ওর মন গলানো সম্ভব নয়।

তাহলেও সুযোগ বুঝে ফের একবার বললাম:

'ভেলমুরাত-আগা!'

'বলো, ছেলে, শুনছি।'

'আমার একটা আর্জি কি মেটাবেন?'

'কী আর্জি?'

'বিক্রি ক'রে দিন আমায়...'

হেসে ও দাড়িতে দু'হাত বুলাতে লাগল। এমন কি চটে পর্যন্ত উঠল না, আমার কথায় এতটুকু গুরুত্বই ও দেয় নি।

'না বেচব না, ভায়া। দুনিয়ায় এমন জিনিস আছে যা কোনো দামেই বেচার নয়।'

'কিন্তু আপনাকে তো বেচেছিল...'

'বেচে ঠকেছে!'

ফের হাসল সে।

কিন্তু ফাঁকা হাতে যে আমি ফিরতে পারি না, সেই কথাটা বুড়োর মনে গেঁথে দেব ঠিক করলাম। অনেকক্ষণ ধ'রে গুরুতর সুরেই কথা হল আমাদের, শেষ পর্যন্ত বুড়োর মন টলল।

বললে, 'তা ছেলে, মেহমান তুমি, এ কিতাব যখন তোমার এতই ভালো লেগেছে, এখেনে ব'সে ব'সে টুকে নিও।'

ভেলমুরাত-আগার চুল্লির পাশে বসে পুঁথি নকল ক'রে কাটল দু'সপ্তাহ। সারাটা সময় ও নিজেও প্রায় আমার সঙ্গেই থাকত। কখনো কখনো মুখস্থ ব'লে যেত আমায়, কখনো স্রেফ কাজ দেখত আমার। 'এক আধটু পড়তে শিখেছি, কিন্তু লেখাটা তো আর অমনি অমনি হয় না।' আমার লেখা দেখে প্রায়ই মন্তব্য করত সে। বুড়ি আমাদের সবুজ চা খাওয়াত, তন্দুরী রুটি খাওয়াত, মাঝে মাঝে এনে দিত ফেনায়িত মদিরা। বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম আমরা।

ভেলমুরাত-আগার কাছে যে কবিতাগুলো চল্লিশ বছর ধ'রে গচ্ছিৎ ছিল তার লেখক হলেন বিখ্যাত কবি মাখতুম-কুলি*, তুর্কমেন চিরায়ত সাহিত্যের জনক।

---

* মাখতুম-কুলির (চলতি নাম — ফ্রাগি) জন্ম হয় ১৭৩০ সালের কাছাকাছি, মৃত্যু আঠারো শতকের আশীর দশকে। খিভার খাঁ, বোখারার আমির আর ইরানের শাহের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দেবার জন্যে সমস্ত তুর্কমেন উপজাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য। — **সম্পাঃ**

মরিস সিম্মাশকো

ফ্রাগির প্রলোভন

না, মোটেই তেমন ছিল না সে*... মাথাটা ঈষৎ ফেরানো, চাপা ঠোঁট... হ্যাঁ, অহঙ্কার ছিল তার, কিন্তু অমন ভাবে ঘাড় কখনো সে ফেরায় নি। ভারি মেধাবী ছিল যে।

আর ঠোঁটের রেখায় এই পাথুরে প্রতাপ... জানত সে, লোকের ওপর তার প্রতাপ আছে, কিন্তু সে তো এমনি ধারা প্রতাপ নয় যাতে এমন উপেক্ষায়, ঘেন্নায় ঠোঁট চেপে বসতে পারে।

আর ঔদ্ধত্য কী, বেপরোয়া মুখের ভাব... এমন লোক কি কবি হতে পারে, কবি যে সর্বদাই যন্ত্রণায় সন্দেহে দোলায়িত? কিন্তু কবি সে ছিল সত্যই, নইলে আজ দু'শ বছর ধরে তার রচিত গান লোকে গাইত না।

পার্কে খেলছে শিশু। চারিদিকে ঝলমলে আশখাবাদের কোলাহল। অথচ নকশা তোলা কামিজ পরা এক তরুণ, বোঝা যায় ছাত্র, দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে আছে মূর্তির দিকে। চোখে ওর চিন্তা। অলক্ষ্যে কাঁধ নেড়ে চলে গেল ও...

এ চেহারা ছিল একেবারেই অন্য এক লোকের। খাটো ঘাড়ের ওপর অল্প একটু মাথা ফিরিয়ে আছে সে। ঠোঁট বেঁকে গেছে আত্মতৃপ্তিতে, তাচ্ছিল্যে। একেবারে উন্মুখ হয়ে, শুধু চোগাচাপকান থেকেই নয়, যেন গায়ের চামড়াটা থেকেও বেরিয়ে এসে সহালাপী উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছে তার কথা। কবি ছিল একপাশে, বার বার চেয়ে দেখছিল এই পরিচিত মুখটার দিকে।

ছেয়ে রঙের অ-তুর্কমেনী চোখ সে মুখে — এ মুখ তার

---

* ফ্রাগি — মাখতুম-কুলি। — সম্পাঃ

ভালোই জানা আর কী ঘৃণাই না তার জাগে। কতবার এই রাশভারী স্বর সে শুনেছে, গমগমে, সোচ্চার — যেন খিভার কার্নাই-এর* মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। এমন লোক জন্মায় কোত্থেকে, এই কথা সে এখন ভাবছিল।

কবি লক্ষ করল, ঠোঁট তার বেঁকে যাচ্ছে ঠিক কর্তার মতোই। কোনো লোককে যখন সে বুঝতে চাইত তখন অজান্তেই সে অনুকরণ ক'রে বসত তার ভাবভঙ্গি। অন্যের কথা ভাবতে গিয়ে নিজেকে একেবারেই ভুলে যেত সে।

কিন্তু সেইদ-খাঁ'র ক্ষেত্রে সেটা খাটল না। লোকটার ভাবভঙ্গি সে হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারত, কিন্তু কী ভাবছে সে তা কিছুতেই কল্পনায় আসত না। সেটা এইজন্যে নয় যে সেইদ-খাঁ লোকটা জটিল। দাঁত দিয়ে কাঁচা মাংস যারা ছিঁড়তে পারে এমন প্রতিটি জন্তুর মতোই তার আকাঙ্ক্ষাও ছিল সহজ, পরিষ্কার। শুধু কবি আর এলাকার সর্বেসর্বা — এ যে দুই ভিন্ন লোক।

তাকিয়া ছেড়ে খাটো শরীরটা টান টান ক'রে উঠে দাঁড়াল কর্তা। এ লোকের নাম শুনলেই লোকে ভয়ে কাঁপত। রোগা কাঁধ, তুলনায় অস্বাভাবিক বড়ো মাথা, ছোটো ছোটো পা। সিধে হয়ে দাঁড়াতে চাইছিল সে, ফলে পাছাটা কেমন উচ্চকিত হয়ে রইল বানরের পাছার মতো। কবির ধারণা হল, দোষটা তার খাটো শরীরের। জীবনে অনেকবারই তার চোখে পড়েছে, বেঁটে লোকেরা নিজেদের দেখাতে চায় লম্বা, ভয়ংকর। এই থেকেই আসে তাদের অহংকার, সন্দিগ্ধতা, নিষ্ঠুরতা। প্রতি পদেই ওরা দুষমন দেখে, তার অকিঞ্চিৎকরতায় সে দুষমন যেন এই বুঝি হেসে উঠবে। সেইজন্যেই যারা সত্যিই বড়ো, তাদের

---

* তুর্কমেনী শিঙ্গা। — সম্পাঃ

ওপর তারা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেয়, নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চায় তাদের... কিন্তু না, এত সহজ নয়। কতবারই তো কবি দেখেছে ছোটোখাটো লোক, কিন্তু বিপুল তার অন্তঃকরণ!

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গালিচার ওপর পায়চারি করলে সেইদ-খাঁ, পেয়ারের আফগানী তরোয়ালটাকে নেড়ে দেখলে, আরবী প্রথা মতো সেটা ঝোলানো ছিল দেয়ালে। ভেতরে ভেতরে কাপুরুষ প্রতিটি লোকের মতোই সে ছিল হাতিয়ারের ভক্ত। গায়ের চোগাচাপকান তার সর্বদাই সামরিক ধাঁচের। অথচ লড়াইয়ের জিনের ওপর কখনো সে বসে নি। কবে একবার বিশ বছর আগে ইসফরগন আটকের সময় কাজারদের ডাকাতে বাহিনীর জন্যে সে ঘোড়া জুটিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে নিজেকে সে ভাবে সেনাপতি — সর্দার। খুঁড়িয়ে যে চলে, সেটা লড়াইয়ের জখমের জন্যে নয়। কে জানে কোথায় ওর কৈশোর কেটেছে, কোথায় ওকে দলে নেয় কাজাররা, শাহের তখতের স্বপ্ন তখন তারা সবে দেখতে শুরু করেছে...

ঘুরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসল সেইদ-খাঁ। সে যে খোঁড়া সেটা সে দেখাতে চাইত না, তাই পায়চারি করার সময় হাঁটত আড়ষ্ট হয়ে। তাহলেও লোকে তাকে ল্যাংড়াই বলত। এখানে, শহরে, পরস্পর কথাবার্তায় তাকে ইয়াশুলি বা পরম শ্রদ্ধাভাজন বলা হয় তা সত্যি, কিন্তু এমন উদার বিশেষণ প্রয়োগ করার সময় কী অনুদার হাসিই না তখন লোকের মুখে ফুটে ওঠে।

কাজাররা ওকে কুড়িয়ে না পেলে কী হত সেইদ-খাঁ? কবি তাকে কল্পনা করতে পারে এক মিরাব*, এক সওদাগর, কিংবা নিতান্তই উট চালক হিসাবে। সমস্ত মিরাব, সওদাগর, উট চালকদের মতোই সাধারণ মানবিক দুর্বলতা থাকত তার।

---

* সেচ কর আদায়ের গোমস্তা। — সম্পাঃ

মেহনতের গুণে দিনে দিনে হয়ত বা মনে তার দয়া মায়া দেখা দিত। লোকেদের ওপর, তাদের জীবন মরণের ওপর, তাদের ছেলেমেয়ে ধনদৌলতের ওপর ভয়ঙ্কর আধিপত্যে এ লোকটা আজ সেইদ-খাঁ হয়ে উঠেছে। আর হিংসুক অকিঞ্চিৎকর লোকেরা কী দ্রুতই না ভাবতে শুরু করে হুকুম করা তার জন্মগত অধিকার।

সেইদ-খাঁয়ের মেহমান তার নিজের ব্যাপারটা নিয়েই কথা শুরু করলে, প্রকান্ড একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো সে তাকিয়েছিল সোজাসুজি সেইদ-খাঁয়ের চোখের দিকেই। লোকটা শক্তিমান, পালোয়ান, সুন্দর পুরুষালী মুখ। এমন মুখে যখন তোষামোদ আর দাস্যবৃত্তি ফুটে ওঠে, তখন বেঁচে থাকতে ঘেন্না হয়।

সমুদ্র এলাকার যে সব আউলে কর্তৃত্ব করত মামেদ-সর্দার, সেখানে ক্ষমতার বিষে বিষাক্ত লোক ছিল অনেক। মুখে তারা তার তারিফ করত, কিন্তু তলে তলে সেইদ-খাঁয়ের কাছে, এমন কি খোদ শাহের কাছেও গুপ্ত খবর পাঠায়। হিংস্র হায়েনার মতো তারা তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খেতে চাইছে, নিজেই সে যে ভাবে একদা তার পূর্ববর্তীকে ছিঁড়ে খেয়েছিল। কত দিন তার কর্তৃত্ব চলবে তা নির্ভর করছিল সেইদ-খাঁয়ের ওপর। হন্যে কুকুরের মতো সেইদ-খাঁয়ের চোখের দিকে চেয়ে মামেদ-সর্দার তার মনের কথা আঁচ করার চেষ্টা করছিল।

আরো সব লোকজনেরা আসছিল। তাদের কাউকে কাউকে সেইদ-খাঁ মখমলের তাকিয়া এগিয়ে দিচ্ছিল নিজের হাতে, কাউকে আবার বসতে ইশারা করছিল নেহাৎ মাথাটা একটু নেড়ে।

এদের সবাইকেই কবি ভালোই জানত। সেইদ-খাঁয়ের ডান হাতের কাছে স্ফীত এক মাংসের পাহাড়ের মতো হাঁসফাঁসিয়ে

তাকিয়ায় দেহরক্ষা করল কাকাবাই-আগা। লোকটা সেইদ-খাঁয়ের পুরনো ইয়ার, মনে হয় আত্মীয়। তার পেছু পেছু নিঃশব্দে আসন নিলে শীর্ণকায় মোহাম্মদ পার্সি — কাকাবাইয়ের বিশ্বস্ত অনুচর। থেকে থেকে কর্তার কানে কানে কী যেন বলছিল সে, আর ভুরু কোঁচকাচ্ছিল কর্তা। এই ধূর্ত শৃগালটিকে কেউ দেখতে পারত না, ভয় করত শহর আর চারিপাশের আউলের কর্তা খোদ কাকাবাইয়ের চেয়ে বেশি। সবাই জানত ভূরিভোজনে শিথিল-দেহ আলসে এই কর্তাটিকে মোহাম্মদ যেমন খুশি চালাতে পারত।

সেইদ-খাঁয়ের বাঁয়ে বসেছিল দুর্দি-খাঁ — পাহাড়ে এলাকার বদরাগী মালিক। দেখতে ছোটোখাটো, হিংস্র — সেইদ-খাঁয়ের সঙ্গে কেমন একটা মিল ছিল তার।

বেশ একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে সিধে হয়ে রাশভারী চালে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আছে কালো-দাড়ি ছুঁচলো-গাল খোজামুরাদ-আগা। খোদ সেইদ-খাঁ তাকে সসম্মানে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে। খোজামুরাদ বংশটা জনবহুল নয়, কোনো রকম কর দিত না তারা, এমন কি শাহের যুদ্ধবিগ্রহের জন্যে ঘোড়সওয়ার জোগাবার দায়ও তাদের ছিল না। স্বয়ং পয়গম্বর মোহাম্মদের উত্তরপুরুষ বলে ধরা হত তাদের। রক্তারক্তি লড়াইয়ের সময়েও খোজামুরাদের লোকেরা খিভা বোখারা ইরানে চলে যেত অনায়াসে। তাদের ওপর হাতিয়ার ওঠাবার সাহস হত না কারো। পুণ্যাত্মা যত ইমাম আর সওদাগর সব আসে এদের বংশ থেকেই।

কিন্তু কবি জানত, পুণ্যাত্মা এই খোজামুরাদ-আগা তার জোয়ান বয়সেই জেঠতুতো ভাইকে আতরেকের জলে ডুবিয়ে মারে — ক্ষমতার পথে সে ভাই তার বাধা হয়ে উঠেছিল। মাত্র কিছু দিন আগেও পরস্ত্রীর সঙ্গে সে ধরা পড়ে এবং একেবারে

নিরীহ একটি লোকের জান দিয়ে সে প্রতিহিংসা থেকে ছাড় পায়। এ কাহিনী শহরের লোকে বলত কানাকানি ক'রে।

লোকেদের জীবন মরণের ওপর ক্ষমতার পর্যায় অনুসারে সারি বেঁধে বসেছিল অন্যান্য সর্দার আর সরকাররা: খোজাগেলদি-খাঁ, কৌশুৎ-আগা, সাপারকুলি-খাঁ... লাল মখমলের তখত-টায় আসন পাবার জন্যে এদের প্রত্যেকেই সেইদ-খাঁকে কেটে টুকরো টুকরো করতে রাজী। কিন্তু সবাই বসেছিল চুপ ক'রে, তার মুখের দিকে চেয়ে।

টান-টান প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, নেশায় চকচকে চোখ, কাঁপা কাঁপা হাত। কবির চোখে এ সবকিছুই মিলে যাচ্ছিল একটা দাঁত বার করা মুখ হয়ে। ইস, এদের কথা যদি কবি একবার গান গেয়ে শোনাতে পারত! নানা দিক থেকে যদি তাদের চেহারাগুলো মেলে ধরতে পারত লোকের কাছে! হাত মুঠো হয়ে এল কবির, চোখ জবলতে লাগল।

কিন্তু কাঁধ তার ফের নুয়ে এল, খুলে এল হাতের মুঠো। মাথার মধ্যে যে কথাগুলো ঝলকে উঠেছিল, সেগুলো কেমন ঝাপসা হয়ে অর্থহীন হয়ে উঠল। চোখ তার হয়ে এল সাধারণ, সেইদ-খাঁয়ের প্রকাণ্ড গকলেনী গালিচার ওপর যারা বসেছিল, তাদের মতোই। কবি এখন আর সেই আগের মতো বোকাটি নয়, যৌবনে যার জন্যে তাকে অত ভুগতে হয়েছিল। বহু বছরের জুলুম আর তাড়নায় তার জ্ঞান হয়েছে। দুনিয়াই যে এই রকম, প্রবল এখানে পীড়ন করে দুর্বলকে। লোকের জন্মই হয় দুঃখ সইবার জন্যে। এই হয়ে এসেছে, এই চলবে। জীবনের এই সোজা কথাটা সে কী ক'রে না বুঝে পারে! তার অনেক বন্ধুই তা বুঝেছে বিশ বছরে, কেউ তিরিশ বছরে, আর সে...

শীগগিরই সে পঞ্চাশে পড়বে। গান তার ইতিমধ্যেই এমন

অনেক জিনিসে ভরা যার জন্যে পরে তার রচনাকে সাবধানী কোবিদেরা অভিহিত করেছে 'স্ববিরোধী' বলে।

উপবিষ্টদের দিকে ফের তাকাল কবি। এখন আর তাদের অত খারাপ মনে হল না। বোঝা যায়, জীবনের অর্থ ওরা তার চেয়ে ভালো বোঝে। হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন কবির এই তৃপ্তি লুকিয়ে ছিল যে তার নিমন্ত্রণ হয়েছে কর্তাদের দরবারে। ভাবনাটা তাড়াতাড়ি দূর করে কবি সগর্বে সিধে হয়ে বসল। মোহাম্মদ নজর করছিল তাকে, পাতলা ঠোঁট তার বেঁকে গেল বিশ্রী একটা উপহাসে...

খিভার খাঁ তার রাগ ঝেড়েছে ইয়োমুদ-দের* ওপর। চিরকালই এই হয়েছে, জলের জন্যে রক্ত দিতে হয়েছে ওদের। উত্তর এলাকায় খাঁয়ের মহাযুদ্ধে ইয়োমুদরা এবার সওয়ারী দেয় নি। খাঁ তখন খালের জল বন্ধ করে দেয়। ইয়োমুদরা জোর করে খাল খোলে, খাঁ তাদের শাস্তি দেয়। খিভার সমস্ত সৈন্য গিয়ে হামলা করেছে তাদের এলাকায় আর যারা প্রাণে বেঁচেছে তারা এবার ছুটে আসছে এই রাজ্যে। যাবার পথে খিভার লোকেরা বালখান তেকে-দের** ওপরও আক্রমণ করে। খাঁয়ের হুকুম ছিল ক্ষেপা নদী জেইখুন আর শাহের রাজ্যের মাঝখানে কেউ যেন প্রাণে না বাঁচে।

এই কাহিনী শোনাচ্ছিল দুর্দি-খাঁ, গলার স্বর তার শান্ত। খিভার খাঁকে সে ভালোই চেনে।

পলাতকদের নিয়ে কী করা যাবে? ক্ষুধার্ত ওরা, হিংস্র ওরা, সঙ্গে তাদের কিছুই নেই। তাছাড়া 'কালা বালি' পেরিয়ে খোরাসানের কাছে এসে থামবে না তো খিভার সওয়ারীরা?

---

* তুর্কমেনীয় একটি উপজাতি। — সম্পাঃ

** তুর্কমেনীয় আরেকটি উপজাতি। — সম্পাঃ

সকলেই কথা কইছিল সেইদ-খাঁয়ের সামনে মাথা নুইয়ে। মাঙ্গিশলাকের দিকে যায় তো যাক। ছেড়ে দেওয়া যাক — নয় কুর্দদের রাজ্যেই যাক। ইরানী হায়দরের সেবা করে যারা, তাদের গায়ে হাত দেবার সাহস খিভার খাঁয়ের নেই। চুপ করে ছিল কেবল দুর্দি-খাঁ। কবি শুনলে, পাহাড়ে নাকি দু'শ ইয়োমুদ ছাউনি গোপনে দখল করা হয়েছে। ইর্জমির আর দামাস্কাসের গোলাম বাজারে ফের দেখা যাবে মাথামুড়নো তুর্কমেনীদের।

জিন্দিগি অন্ধকার, ভয়ঙ্কর, কোথাও তার আলোর রেখা নেই। এ রাজ্যকে শাপ দিয়ে রেখেছেন আল্লা। কবিকে গান বাঁধতে হবে নসিবের খেয়াল নিয়েই, অবাস্তব স্বপ্ন দিয়ে লোককে দোলায়িত করে কী হবে? দুনিয়ায় সবকিছুই অনিত্য। লোক জন্মায় গোলাম হয়ে কি শাহ হয়ে — কিন্তু কবরই তার শেষ। সে কবর কবির জন্যেও অপেক্ষা ক'রে আছে। ঘন ঘনই আজকাল মৃত্যুর কথা ভাবে কবি, ঠোঁটে ওর গুনগুনিয়ে উঠল আশাহীন অপরূপ কয়েকটা কথা।

যুগের পর যুগ ধরে তেমন কথার পুনরাবৃত্তি করে গেছে এখানকার কবিরা। আর যখন তাদের খুবই অসহ্য লেগেছে, তখন ক্ষণিক আনন্দের গান গেয়েছে তারা — প্রিয়তমার সঙ্গসুখ, নিষিদ্ধ সুরা আর মাতোয়ারা অনস্তিত্বের তমসায় নিমজ্জন ...

প্রচলিত রীতি অনুসারে সেইদ-খাঁ সকলের কথা শুনে গেল আগে। তারপর রায় দিলে। হ্যাঁ, যেখানে ইচ্ছে যাক। গকলেনী এলাকায় ইয়োমুদদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। জল দেওয়া চলবে না ওদের, ঘোড়া দেওয়া চলবে না, দিলে গর্দান যাবে। সমস্ত আউলে সে ফরমান জারী করা হোক। খিভার খাঁ দেখুক যে ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেইদ-খাঁ কথা শেষ করতে না করতেই চেঁচিয়ে উঠল কারাজা-শাহির:

'ন্যায্য হুকুম, অতি ন্যায্য হুকুম!'

নিজের ভাবনায় মগ্ন থাকায় কবি কারাজা-শাহিরের আগমন লক্ষ করে নি। গোলগাল মসৃণ চর্বিফোলা মুখ কারাজা-শাহিরের, কালো কালো চোখ, দেখতে তাব্রিজের চটপটে শাঁসালো সওদাগরদের মতো। সবচেয়ে লজ্জাকর বাণিজ্যই তার পেশা — কথা বেচে সে। কবির মনে আছে তাকে, সুশ্রী এক কিশোর — চমৎকার গান গাইতে পারত। কিন্তু কারাজা-শাহির পনের বছর বয়সেই জীবনের দিব্যজ্ঞান লাভ করে, যেটা দাড়ি পেকে গেলেও কবি এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। কারাজা-শাহিরের এখন শহরে তিনটে কুঠি, পাহাড়ে পাঁচ কি ছয় হাজার ভেড়া। কথা গাঁথার কৃতিত্ব তার অবশ্য একেবারেই গেছে, কিন্তু তাতে তার বয়েই গেল: এক টুকরো রুটি আর মাথার ওপর একখানা চালার বিনিময়ে তার জন্যে ভালো ভালো কবিতা রচনা ক'রে দেবার মতো লোক আছে অনেক। কর্তা আর কুলপতিদের বৈঠকে আজ বহু বছর ধ'রেই তার নেমন্তন্ন হয়ে আসছে। অথচ কবির নিমন্ত্রণ হয়েছে কেবল এইবার, যদিও কবিতা তার খিভা আর বাগদাদেও ছড়িয়েছে।

এতদিন পরে শেষ পর্যন্ত ডাকলে কেন? না, না, আগের মতোই খাসা কবিতা সে এখনো লেখে, কিন্তু কেন জানি লেখাটা এখন কঠিন হয়ে উঠেছে, বহুক্ষণ ঠিক কথাটি মনে জোগায় না, রাগ হয় নিজের ওপর, সকলের ওপর। ঠিক যে কথাটি চাই, সে কথাটি সে আজকাল আর তেমন ক'রে খোঁজেও না, মামুলী কথাই লিখে যায়।

হয়ত এটা বার্ধক্য। কিন্তু অত বুড়ো তো সে নয়। অথবা... নাকি জীবনের সার কথাটা সে বুঝেছে ব'লেই

ব্যাঘাত হচ্ছে? আজ হোক কাল হোক, সকলকেই তো সেটা একদিন বুঝতে হয়, এমন কি কবিকেও... নিজের দরবারে সেইদ-খাঁ তাকে ডাকতে শুরু করলে কেন?

খাঁয়ের গোলাপী চালের পোলাও খাওয়া হল। তারপর হল কারাজা-শাহিরের গান। সে গানে বহু নারীরই পদযুগল পুরুষ্টু, গোলাপ রঙা গা, সাপের মতো সর্পিল বেণী। গান গাইতে গাইতে সে রসিয়ে চুমকুড়ি কাটলে, যেন মেয়েগুলোকে বেচা হবে, মালের তারিফ করছে ও। লালা গড়িয়ে এল বুড়ো খোজাগেলদি-খাঁয়ের মুখ থেকে।

বিদায় নেবার সময় সেইদ-খাঁ কৃপা ক'রে একটু রসিকতা করলে কবির সঙ্গে। ফের মন ভালো হয়ে উঠল কবির...

ঘরে ফেরার সময় এই কথাটাই সে ভাবছিল। হ্যাঁ, কৃতার্থ বোধ করেছিল সে। কী দুর্বলই না মানুষ!

রাস্তায় লোক অনেক। পরের দিনকার বাজারের জন্যে তোড়জোড় চলেছে। গাড়ি চলেছে মাল বোঝাই। তাড়া দেওয়া হচ্ছে গরু ভেড়ার পালে। শহরের জলাশয়টার কাছে কবির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল কলস মাথায় একটি সুন্দরী আর্মানী মেয়ে। তার গমন পথের দিকে চেয়ে কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আগে সুন্দরী মেয়ে দেখলে কবি বুক টান ক'রে তাঁর দৃষ্টি লাভ করতে চাইত। জীবন ভালো লাগত তার। মনে হত, আল্লা যে জীবনটা এমন ক'রে গড়েছেন সেটা খুবই সঙ্গত। আজকাল কিন্তু সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার নিজের দেহভার আর শাদা দাড়ির কথাই মনে পড়ে প্রথমে, নিজেকে নিয়েই তার লজ্জা হয়। নারীর চকিত কটাক্ষ, গালে তাদের হঠাৎ লালের উচ্ছ্বাস, সাড়া দেওয়া হাসি... এ ছিল তার যৌবনের সাথী...

রাস্তার চড়াই ভেঙে উঠে কবি দম নেবার জন্যে থামল। কষ্টে ওঠা নামা করল তার বুকের খাঁচা, মোচড় দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডের কাছে। বুকের মধ্যে আজ বছর দুই তিন হল এই ভোঁতা যন্ত্রণাটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

থাকত ও শহরের প্রান্তে, আউলে, তুর্কমেনীরা যেখানে সাধারণত বাস পাতে। শহরের ধুলো ভরা সরু সরু রাস্তা তাদের পছন্দ নয়। শহরে থাকত তুর্কীরা, ইরানীরা, আর্মানী সওদাগররা, খাজনা আদায়ী পেয়াদা, মুনশী, পোদ্দাররা। যারা একেবারেই কাঙাল অথবা কুল থেকে বিতাড়িত, তেমন তুর্কমেনীরাই কেবল শহরে আসত। উঁচু উঁচু দেওয়ালের চাপে অনভ্যস্ত, কোলাহল গোলমালে বধির হয়ে অচিরেই ক্ষয়রোগ শুরু হত তাদের, কাসির সঙ্গে রক্ত উঠত, মারা যেত বালুভূমির প্রশান্তির জন্যে হাপিত্যেশ ক'রে।

কিন্তু এখানে, এই শহরতলিতে অত কষ্ট হত না। ন্যাড়া ন্যাড়া লালচে পাহাড় দেখা যেত এখান থেকে আর পাহাড়ের ফাঁক বেয়ে বাতাসে বয়ে আসত এমশানের দিশী গন্ধ, ঝাঁঝালো কাঁটা আর দগ্ধ বালির ভাপ। আর ঘর তোলা হত এখানে ছাড়া ছাড়া, দূরে দূরে। পাথুরে কাদামাটির ঘর, আলো আসার সংকীর্ণ এক একটা গবাক্ষ। কিন্তু প্রতি ঘরের কাছেই থাকত পশমে ঢাকা তাদের হালকা তাঁবু, কিবিতকা। সংসারের শান্তির পাহারায় থাকত চৌকো মুখওয়ালা মস্ত মস্ত হলদে কুকুর।

প্রতি শরতে কিবিতকা গুটিয়ে বাটিয়ে চাপানো হত উটের পিঠে। চলে যেত তারা উত্তরে, 'কালা বালিতে'। প'ড়ে থাকত শুধু কুলের গরিবেরা, ভেড়া বা উট চরাবার প্রয়োজন যাদের ছিল না। মাটি তারা আঁকড়ে আছে বহুদিন থেকেই, কালো গুবরের মতো মাটি খোঁড়াই তাদের কাজ।

কবির পড়শী সাখাৎ দুর্দি ছিল এই ধরনের লোক। এখনো সে তার ঘরের কাছেই খাটছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কবি দেখল তার চাষের কাজ। হাঁটু পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকটা বেলচা দিয়ে ভেজা ভেজা মাটি খুঁড়ছে, দরকার মতো আল বানাচ্ছে... এ একেবারে অন্য দুনিয়া, সেইদ-খাঁয়ের দুনিয়ার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, সাখাৎ দুর্দির এতটুকু ঔৎসুক্য নেই কে হবে শহরের কর্তা — কাকাবাই-আগা নাকি যে তার জায়গা দখল করতে চাইছে সেই সাপারকুলি-খাঁ। ও শুধু এইটুকু জানে, কর্তাকে আসতে দেখলে পথ থেকে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অথচ খোজামুরাদ-আগার সঙ্গে তার কৌলিক আত্মীয়তা আছে, সাখাৎ দুর্দিও এই পুণ্য বংশেরই লোক। কিন্তু সে সওদাগরও নয়, ইমামও নয়। এমন কি ঘোড়া পর্যন্ত তার নেই। যখন কুলের স্বার্থ রক্ষা করার ডাক পড়ে, তখন ধনী আত্মীয়রা ঘোড়া জোগায় তাকে। তবে দুঃখের দিন তার শীগগিরই শেষ হবে। খোদ খোজামুরাদ-আগা নাকি বিয়ে করবে তার মেয়েকে।

মেয়েটিও বেশ। কী চটপট গরম ছাই বার করছে তামদির* থেকে। কী সুশ্রী ক্ষিপ্র তার ভঙ্গি। পড়শীর মেয়ে কবে এমন বেড়ে উঠল কবি তা লক্ষই করে নি। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি তাকাল তার দিকে, অমন গভীর কালো চোখের দিকে চাইতে কেমন অদ্ভুত লাগে। দৃষ্টির মধ্যে কেমন একটা স্পর্ধা যা ঠিক মেয়েলী নয়। না, হরিণীর চোখে এমন স্পর্ধা নেই, হরিণীর চোখ অনেক সুন্দর, কিন্তু ভীরু ভীরু, নির্বোধ।

বহু দিন থেকেই খোজামুরাদ বংশ সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদেরই কনে বাছে। আর সে পুণ্য বংশ থেকে এ পর্যন্ত কোনো নারীই কুল ছাড়ে নি।

---

* চুল্লি। — সম্পাঃ

ঘরের দিকে গেল মেয়েটি, কবি লক্ষ করল গলায় তার রুপোর তারের হাঁসুলি। তার মানে বাগ্‌দান হয়ে গেছে। খোজামুরাদ-আগা ছাড়া আর কেউ ওর স্বামী হবে না...

ঘরে এসে কাজে বসল কবি। সরু উকো দিয়ে সে কালচে রুপোর পাত কাটতে লাগল। মেয়েলী বক্ষালঙ্কার গুলিয়াকা প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। বৃত্তের মাঝখান থেকে অপরূপ সব নকশা চলে গেছে চারিদিকে, এখন শুধু খাঁজ কেটে স্বচ্ছ লাল পাথরটা বসানোই বাকি, কুলজুম বা লোহিত সাগরের তীর থেকে এ পাথর বেচতে আসে সওদাগরেরা।

রুপোর কাজে কবি ছিল ওস্তাদ, কিন্তু এ কাজ তার ভালো লাগত না, এতে দরকার একটানা ধৈর্য, আর ছেলেবেলা থেকেই কবির স্বভাব অধীর। কিন্তু তার কবিতা আর গান, সবাই তা জানে তবে তার জন্যে পয়সা দেয় না কেউ। এতে কেবল লোকসানই সার হয়েছে কবির। বিদ্বান মোল্লা ছিল সে, শিরগাজির বিখ্যাত মাদ্রাসায় সে শাস্ত্রীয় বিদ্যার চর্চা করেছে। কিন্তু বিয়ে সাদির কলমা পড়ার সময় লোকে কেন জানি এমন মোল্লাদেরই ডাকত যারা কবিতা লেখে না। ভাবত তাদের কলমা বেশি খাঁটি।

কিছুটা কাজ করার পর গুলিয়াকাটিকে সরিয়ে রেখে কবি একটা লড়ুইয়ে তলোয়ারের খাপ টেনে নিলে। আগাগোড়া খাপটা চমৎকার নকশা কাটা, মাঝে মাঝে জটিল সব সূক্ষ্ম রেখা, কেমন যেন তার কবিতার মতোই। তেমনি দোলায়িত, ভাবব্যঞ্জক, ভেতরকার কী একটা গভীর বলিষ্ঠতায় ঋজু। নকশার মাঝে মাঝে জ্বল জ্বল করছে দামী পাথর — কিন্তু লাল নয়, কালো আর নীল। এটা তারই তলোয়ারের খাপ, তার বংশে পুরুষানুক্রমে হাত বদল হয়ে পেশছেছে তার কাছে। কিন্তু কী দরকার তার তলোয়ার বা খাপের? বংশের

অনুশাসনটা মনে এল তার। লড়াইয়ের সময় এ পবিত্র তলোয়ার এক হাত লম্বা হয়ে ওঠে, সত্য ধর্মের যে দুষমন তার ওপর হানে মোক্ষম আঘাত। কিন্তু এ তরোয়াল সে কাকে দিয়ে যাবে যদি ঘরে তার শিশুর কাকলী না শোনা যায়।

কিন্তু এটা ছিল তার মনের মতো কাজ। ফরমাশের কাজে কবির মন লাগত না। তাই গুলিয়াকাটা সরিয়ে রেখে খাপের ওপর নকশা কাটতে বসল সে।

বাধ্য ধাতুর ওপর মসৃণ ছন্দে কাজ চালালে তার উকো। ভেতরে ভেতরে যা তাকে বিঁধছিল, ধীরে ধীরে সে সবকিছু ভুলে গেল সে।

সান্ধ্য নামাজের সময় হল। বহুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল চিন্তাহীনের মতো, কিছুতেই মন ঠিক করতে পারছিল না। ঠোঁট তার অস্ফুটে উচ্চারণ ক'রে গেল আল্লার প্রচলিত জয়গান, কিন্তু মন ছিল না সেখানে। ফের ভারি-ভারি লাগল বুকটা...

রাতে শুয়ে রইল খোলা চোখে, কিবিতকার খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। কী জটিল এই দুনিয়া, অথচ আগে মনে হয়েছিল কী সরল। আর দুনিয়া জিনিসটাই বা কী? জলপ্রবাহের মতো সে চঞ্চল। নানান লোকের কাছে তার নানান রূপ। তার পড়শী সাখাৎ দুর্দির একরকম দুনিয়া, তার অন্যরকম, সেইদ-খাঁয়ের একেবারেই আলাদা। এর মধ্যে কোন দুনিয়াটা সাঁচ্চা দুনিয়া, আল্লার তৈরি দুনিয়া? ও জানত যে ধর্মদ্রোহিতা হচ্ছে, মন থেকে এসব পাপচিন্তা দূর করে দিতে চাইছিল সে, কিন্তু কেবলি ফিরে ফিরে এল এই ভাবনা, ঘুম হল না তার।

এমন দুর্বল, তুচ্ছ, অসহায় ব'লে নিজেকে তার আর কখনো লাগে নি। এ জীবনে ভোর নেই। আল্লার ইচ্ছায় এ জীবন যে এক দারুণ পরীক্ষা, মেনে নিতে হবে তাকে।

পরের দিন তার বাড়ি মেহমান এল নগরপালের সহকারী মোহাম্মদ পার্সি। মাংস খেল সে, নিজের তন্দুরীর টুকরোটা নিখুঁত ভাবে ধ'রে রইল, বিজ্ঞের মতোই তারিফ করলে কবিকে।

এ দুজনের মধ্যে কোনো সদ্ভাব ছিল না। মোহাম্মদ নিজেই কবে একবার শায়ের হওয়ার চেষ্টা করেছিল। এবং যে কোনো ব্যর্থকাম ব্যক্তির মতোই সে তেমন লোককে দেখতে পারত না আল্লা যাকে বাণী গাঁথার মহাশক্তি দিয়েছেন। আর এ হিংসার চেয়ে ভয়ঙ্কর, যন্ত্রণাকর আর কিছু নেই। সাপের মতো সে হিংসা হিংসুকের কলজেয় বাসা নেয়, কিছুতেই তৃপ্তি নেই তার। আর যে লোক নির্গুণ, কবিরও ভালো লাগত না তাকে।

রোগা, হলদে-মুখো এই লোকটা তার কত ক্ষতিই না করেছে! আর সেই লোকটাই কিনা এখন তারিফ করছে তার। এটা ভালো লাগল কবির। মোহাম্মদকে এখন আর ঠিক তেমন তুচ্ছ জীব ব'লে তার মনে হচ্ছে না। ফের মানুষের দুর্বলতার কথাই মনে হল কবির।

ধূর্ত পার্সি তাহলেও কেন তার কাছে এল? কবি যখন নির্বিচারে লোককে বিশ্বাস করত সে সুখের দিন যে আর নেই।

আসল ব্যাপারে মোহাম্মদ এল ঘুরপথে। অনেকক্ষণ ধ'রে সে সেইদ-খাঁয়ের বুদ্ধি বিবেচনা, তার উদারতার কথা বললে। তেমন গুণ থাকলে সে সাগ্রহেই এমন লোকের যশোগান করত কবিতায়। সেইদ-খাঁ অবশ্যই তার দাম বুঝবে। কবির বেয়াদব গানকেও মাপ ক'রে দেবে। যৌবনে ভুল কার না হয়! তাছাড়া, শীগগিরই এক মস্ত আসরের আয়োজন করছে সেইদ-খাঁ। সেখানে ভালো কিছু গান গাইলে কর্তার মেজাজ শরীফ থাকবে।

কবি সৌজন্য সহকারে পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ জানালে। হ্যাঁ, এ লোকটাকে কবি ভালোই চেনে। ভারি ওর ইচ্ছে হয়েছে সকলের সামনে কবি যেন প্রমাণ ক'রে দেয় যে সে কোনো দিক দিয়েই মোহাম্মদের চেয়ে ভালো নয়!

এবং মেহমান চলে যাবার পর ফের বুকের মধ্যে একটা গুরুভার ব্যথা জাগল। তেমন স্বচ্ছ বেদনা নয়, যাতে মধুর গান গেয়ে ওঠে হৃদয় — এ এক আবিল, নিরুপায় যন্ত্রণা... বটেই তো, মোহাম্মদ তার চেয়ে বুদ্ধিমান। কারাজা-শাহিরের মতো জীবনের সারকথাটা সে অনেক আগেই ভালো ক'রে বুঝেছে। কোনো গুণ না থাকলেও এ লোকটা বাগিয়ে নিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আল্লার কাছ থেকে দুর্লভ প্রতিভা পেয়েছিল কবি। মেধা বলতে কী বোঝায়? একদা এ এলাকার সবচেয়ে মেধাবী লোক বলতে ধরা হত তার বাপকে। কিন্তু শেমাখিনের সওদাগর মুস্তাফাকে কবির ভালোই মনে আছে, কাপড় কেনার সময় প্রতিবার সে দরে আর মাপে বাপকে ঠকাত। এদের মধ্যে মেধাবী কে — অধার্মিক মুস্তাফা নাকি তার বাপ, যে ইসলামের শাস্ত্র সবই পড়েছে, অন্যকে তা শেখাত? মুস্তাফা কেবল মনে মনে হাসত। সন্দেহ নেই যে কবির বাবাকে সে ভাবত শহরের সেরা আহাম্মক।

কিন্তু করা যাবে কী? সেইদ-খাঁয়ের সম্মানে দুটো ভালো কথা সে লিখবে কী ক'রে? হঠাৎ পরিষ্কার একটা ছবি দেখতে পেল সে: কবি চলেছে রাস্তা দিয়ে, লোকে চাইছে তার চোখের দিকে। প্রবল একটা উত্তেজনায় রঙের উচ্ছ্বাস ফুটল মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরকম চোখও ভেসে উঠল মনে: কাকাবাই-আগা, সাপারকুলি-খাঁ, মোহাম্মদের চোখ। কী গোপন আত্মতৃপ্ত বিজয়গর্ব সে চোখে! আউলে আউলে কী কথাই না রটবে!

না, লিখবে না সে! কেউ যেন না ভাবে যে নেকড়ের দাঁত প'ড়ে গেছে! ফের হাত মুঠো বেঁধে উঠল তার। লাফিয়ে উঠে সে নরম কোশমায় পায়চারি করতে লাগল। মাথার মধ্যে রোষদীপ্ত এক একটা কথা ভেসে উঠছিল দমকায় দমকায়। কিন্তু না, কবি নিজেকে ভোলাচ্ছে। মনের গভীরে সে জানত যে সেইদ-খাঁয়ের উৎসবে সে কবিতা রচনা করবে। মোহাম্মদ কথাটা পাড়া মাত্রই সে এটা জানত। পদচারণা ধীর হয়ে এল তার, থেমে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, বসল।

রাতে ফের সে শুয়ে রইল খোলা চোখে, এবার সোজাসুজি ভাবছিল কী লিখবে। অবশ্যই খাঁয়ের স্তুতি গাইবে না সে, কারাজা-শাহিরের মতো খাঁয়ের পদধূলিতে ধন্য মানবে না। স্রেফ শিকারের কথা লিখবে সে, হিংস্র জানোয়ারকে ঘেরাও ক'রে ধৈর্য ধ'রে কী ভাবে অপেক্ষা করতে পারে খাঁ, হাত তার কত অটল। সেটা মিথ্যা হবে না। লোকে বলে, সেইদ-খাঁ পাকা শিকারী।

সকালে চা পান করলে সে, আঙুর দিয়ে চাপাটি খেলে, তারপর লিখতে বসল। কড়া তুলট কাগজের কুণ্ডলীটাকে সে দু'বার ঠেলে সরিয়ে দিলে, ফের টেনে নিলে। তারপর লেখা এগুল। মন বসে গেল তার, যেমন মাঝে মাঝে মামুলী রুপোর কাজেও মন বসত। নিটোল, সুশ্রী সব শব্দ নেমে এল তার কলম থেকে, ঠেলে নিয়ে চলল তাকে। আগে এমন হয় নি। লিখছে কবি আর একই সঙ্গে দূর থেকে যেন লক্ষ করছে নিজেকে, লক্ষ করছে তার চিন্তা, তার অনুভূতিকে...

যতটা কঠিন মনে হয়েছিল তেমন নয়। সবটা পড়ে দেখল কবি, বলতে কি ভালোই লাগল। মনে না হয়ে পারল না: সাধ্যি থাকলে কারাজা-শাহির একবার লিখে দেখুক...

পরের সারাটা দিন ধ'রে সে লিখলে। মন তার জমে উঠেছিল, অথচ নিজের ওপর অপক্ষপাত সমালোচনার দৃষ্টি

তার যায় নি। যেটা লেখা হল তা থেকে এই মানেটা ফুটে উঠতে পারত: নির্ভয়ে নিখুঁত ভাবে যে লোকটা জানোয়ার মারছে, ঠিক তেমনি নিশ্চয়তায়, তেমনি বিবেচনায় সে লোক শাসন করতেও পারে। একটু দ্বিধায় পড়ল কবি। এই ভাবনাটাকেই পল্লবিত ক'রে যাবে কি? কিন্তু অচিরেই প্রবোধ মানল: তার কবিতা শুনে সেইদ-খাঁ নিজেই হয়ত ভালো হতে চাইবে, দয়ালু হয়ে উঠবে। তাহলেও কবি ঠিক করলে এই শেষ স্তাবকগুলো সে প'ড়ে শোনাবে না। আলাদা কাগজে এমনিই সেটা লিখে রাখবে।

ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ, পাহাড় চুড়োয় বজ্রপাতের মতো। বেশ রোদভরা উৎসবের দিন। শান্ত সমতাল পদক্ষেপে কবি চলেছে সেইদ-খাঁয়ের বাড়িতে। হাতে তার কবিতা পত্রের আঁটো কুণ্ডলী। অন্য যে কুণ্ডলীটায় সে লোকশাসক হিসাবে খাঁয়ের স্তুতি করেছে সেটা তার চোগাচাপকানের তলে লুকনো। তবে দরকার হলে চট ক'রেই বার ক'রে নেওয়া যায়।

হঠাৎ স্তব্ধতা শুরু হল। এমন স্তব্ধতা যে হৃৎপিণ্ড থমকে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দেখলে কবি... রাস্তার মাঝখান দিয়ে সারির পর সারি বেঁধে ওরা চলেছে। রাস্তার নরম ধুলোয় সন্তর্পণে উঠছে নামছে ঘোড়ার খুর। প্রতিটি ঘোড়ার ওপর একজন দুজন ক'রে বসে আছে হাতকাটা সব ছেলে।

ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক যে এমন কি আর্তনাদও গলার মধ্যেই শুকিয়ে যায়। ইয়োমুদ ছোকরা এরা, চলেছে নীরবে। লোকের যেখানে কব্জি শেষ হয় সেখানে এদের রক্তে কালচে হয়ে আসা খানিকটা ক'রে তুলো শুধু। খিভার খাঁয়ের সওয়ারীরা এদের হাত কেটে দিয়েছে, তুর্কমেনী বাঁকা তলোয়ার যাতে আর জীবনে কখনো ধরতে না পারে।

কত জন ওরা? দশ জন নাকি একশ?.. গুণবে কে? কবির মনে হল বুঝি দুনিয়ার সমস্ত ছেলেদের হাত কাটা গেছে, ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে তারা কবির সামনে দিয়ে চলেছে এক শেষহীন সারিতে। মৃত্যুসম ক্লান্তিতে জর্জরিত ঘোড়াগুলো বরাবরের মতোই মাথা তুলে আছে উঁচুতে আর তাদের ওপর চুপচাপ, শুকনো বিস্ফারিত চোখে ব'সে আছে ছেলেরা।

তাদের নেতৃত্ব করছে লম্বাটে, একেবারে কিশোর এক তেকে। কালো রঙের আখালী একটা ঘোড়ায় সে চুপচাপ সামনে চলেছে। তার লাল ডোরাকাটা চাপকানটা তলোয়ারের ভয়ঙ্কর আঘাতে আগাগোড়া ছিন্নভিন্ন। সারা দেহ ওর রক্তে মাথা, তার কিছু নিজের, কিছু অপরের। রক্তমাখা মুখ, এমন কি শাদা উঁচু তেলপেকটাতে* লাল লাল ছোপ। সমতালে শান্ত ভাবে যাচ্ছিল সে। জ্বলছিল শুধু তার কালো চোখদুটো।

একলা শুধু সেই খিভার সওয়ারীদের সঙ্গে লড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। পুরনো একটা পরিত্যক্ত কুয়োর কাছে এই মুমূর্ষু ছেলেগুলোকে দেখতে পায় সে। তাদের জল দেয়, জখম বেঁধে দেয়, তারপর নিয়ে আসে সঙ্গে ক'রে। খিভার লোকেদের হাত থেকে অক্ষত থেকে গেছে এমন কিছু চোভদুর** আর তেকে পরিবার রাস্তায় তাদের সঙ্গে জোটে। দিনে তারা বালিয়াড়ির তপ্ত ধুলোয় শুয়ে থাকত। যখন রাত হত, তখন তেকে তরুণটি পালা ক'রে ছেলেদের ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিত। রাতের পর রাত চাঁদের স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় শোকাহত স্তব্ধ ছায়াগুলো পাড়ি দিয়েছে 'কালা বালি'। তারপর আজ এসে পেঁছেছে লোকের কাছে...

গোটা রাস্তায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল লোকে। নিমন্ত্রণের

---

* তুর্কমেনী টুপি। — সম্পাঃ

** তুর্কমেনীয় একটি উপজাতি। — সম্পাঃ

জন্যে ডাক দিতে হলে বুকে হাত দিয়ে ডাকতে হয়। কিন্তু একটা হাতও বুকে উঠল না কারো। তারা জানত কাজারদের উপশাসকের হুকুম ভাঙার অর্থ কী।

হঠাৎ কেঁপে উঠে দুলে উঠল একটা ঘোড়া, হাতকাটা একটা ছেলে বসেছিল তার ওপর। অন্য ঘোড়াগুলো থেমে গেল। চঞ্চল কান নাড়াতে নাড়াতে লাগল তারা, বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে। এমন ঘটনা ঘোড়াদের জীবনে হয় নি, যখন মরুভূমির দুরূহ পথ পেরিয়ে আসার পর সবুজ-বসতি এলাকায় তারা দানা পায় নি, জল পায় নি। শুধু হাতকাটা ছেলেগুলোরই কিছু অবাক লাগল না, দৃষ্টিহীন চোখে তারা তাকিয়ে রইল কোন এক দূরের দিকে।

হঠাৎ যেন একটা হালকা বাতাস উঠল ভীড়ের মধ্যে। বুদ্ধি বিবেচনার পরোয়া না ক'রে শত শত জোরালো পুরুষালী হাত এগিয়ে গেল পড়ন্ত ছেলেটাকে ধরবার জন্যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা পিছিয়ে এল: মনে পড়ে গেল পাশেই, তার পেছনেই যে রয়েছে নিজের ছেলেমেয়েরা। লোকজনদের সামনেই দেখা গেল তাজা টগবগে ঘোড়ায় চেপে এসেছে সেইদ-খাঁ আর তার অভ্যাগতরা। ছেলেগুলোর খবর শুনে উৎসবের আসর থেকে ছুটে এসেছে সবাই। উঁচু উঁচু মখমলের জিনের ওপর বসে আছে ক্ষুদে দুর্দি-খাঁ, রক্তিম-মুখ বিরাট-বপু কাকাবাই, নীলঠোঁটো বুড়ো খোজাগেলদি-খাঁ...

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগল ঘোড়াগুলো। গুমোট স্তব্ধতায় গরম ধুলোর মধ্যে প্রায় শোনাই যায় না তাদের খুরের শব্দ। যে ঘোড়াটা টলে পড়ছিল, শেষ একটা মরীয়া চেষ্টায় সে তার পা টেনে তুলতে গেল, কিন্তু পারল না, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ধুলোভরা রাস্তার মধ্যে, বাধ্যনিরীহ উন্মাদ চোখদুটিতে তার চিক চিক করছিল জল।

হঠাৎ সোজা রাস্তা বেয়ে এগিয়ে এল একটা লোক। ঘোড়াটার কাছে গিয়ে সে রুগ্ণ ছেলেটাকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেইদ-খাঁয়ের প্রতি দৃকপাত না ক'রে ঘুরে দাঁড়াল পথের লোকেদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেগুলোর দিকে ছুটে গেল সবাই, দুজন তিনজন ক'রে তারা ওদের দিগ্বিদিকে নিয়ে চলে গেল। জীবন্ত জ্বলজ্বলে সূর্য দেখা দিল আকাশে।

চুপ ক'রে রইল সেইদ-খাঁ, কেবল চোখ কুঁচকে তাকালে কবির দিকে। কবি কিন্তু ভুলে গিয়েছিল তার কথা। হাতে তার মাথা এলানো রুগ্ণ ছেলেটি। হাতকাটা সেই ছেলেটির সামনে দুনিয়ার সবকিছুই তখন তুচ্ছ!

সেইদ-খাঁ আর তার অতিথিরা ভেবে পেল না কী করবে, ঠায় ওই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল তারা। শুধু কবির ওপর থেকে নজর সরালে না দুর্দি-খাঁ। কিন্তু সেও কিছু করবার সাহস পেল না। শেষ হাতকাটা ছেলেটিকেও যখন রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল, তখন ক্ষিপ্ত ক্রোধে নিজের ঘোড়ার ওপরই চাবুক কষলে দুর্দি-খাঁ, লাগামটায় এতটুকু ঢিল না দিয়ে ভয়ঙ্কর ঘা মেরে মেরে ঘোড়ার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিল সে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে লাগল বিহ্বল ঘোড়াটা। নরম ধুলোয় উড়ে পড়ল ছেঁড়া ছেঁড়া চামড়া আর রক্ত। মুখ ভরে উঠল শাদা ফেনায়।

মৃদু ককিয়ে উঠে দুর্বিষহ স্বপ্নের মধ্যে ছটফট করছিল ছেলেটা। কিন্তু বাস্তব জীবনের চেয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সে আর কী দেখবে? কবির খেয়াল ছিল না কতক্ষণ ধ'রে সে ওই একই ভাবেই ব'সে আছে, নীরবে চেয়ে দেখছে ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে। নীরবে আসা যাওয়া করছিল বৌ — বিচার বুদ্ধি তার কেমন যেন ভোঁতা হয়ে এসেছে, বড়ো ভাইয়ের মৃত্যুর পর এ

নারী ঘরে এসেছে তার। কবির প্রেমাস্পদা, তার আদরের মেংলি যখন অন্যের ঘরে গিয়ে উঠেছিল, তখন তার চেয়ে বড়ো দুঃখ কবি কল্পনাও করতে পারে নি। এই ভয়ঙ্কর দুঃখ নিয়ে কত বেদনার্ত কবিতাই না সে লিখেছে! কিন্তু সত্যিকার মানবিক দুঃখ কি তখন কল্পনা করতে পেরেছিল কবি, যে দুঃখ আজ তার ঘরে এসে উঠেছে এই হাতকাটা ইয়োমুদ ছেলেটির সঙ্গে?

বহু বছরের পর কবির সঙ্গে ফের দেখা হয়েছিল মেংলির। কেমন একটা মধুর যন্ত্রণায় বুকের মধ্যে তার কী যেন নড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেটা ওই একান্ত সাধারণ সরু-কপালে, গাল-উঁচু মেয়েটির জন্যে নয়, নিজের যৌবনের কথা মনে প'ড়ে গিয়েছিল কবির। এর পর রোজই সে মেংলিকে দেখেছে, কিন্তু কলজে তখন তার শূন্য। তারুণ্যের কোন বাঁকে হারিয়ে গেছে সেই সুঠাম, কাজল-নয়না গকলেনী জাতের মেয়ে, যার দ্বিতীয় মিলবে না...

কিন্তু এ দুঃখ যে তার জীবন থেকে মেলাবার নয়। কাঁদছিল ছেলেটা, ঘুমের মধ্যে হাত নাড়ছিল। কবির মনে হল যেন কী বুঝি ধরতে চাইছে সে।

গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠল কবির। চোখে হাত দিয়ে দেখলে পাতা ভিজে উঠেছে। কিন্তু এবার লাফিয়ে উঠল না সে, মুঠো বাঁধল না হাতে। ধীরে ধীরে প্রদীপটা উশকিয়ে কলম টেনে নিলে। চারিদিকে বধির রাত। ঠিক তার সামনেই কম্বলের ওপর ছটফট করছে রোগতপ্ত ছেলেটা। আর লিখে চলল কবি, তার হৃৎপিণ্ডটাই যেন ঝরে ঝরে পড়ল কথা হয়ে। কবি টের পেলে, আল্লার কাছে এত অকপট সে আর জীবনে কখনো হয় নি।

খুন আর অশ্রু বইছে দুনিয়ায়... ওগো লোকেরা, তোমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদছে ফ্রাগি, এ যে ফ্রাগির অশ্রু, ফ্রাগির খুন। কারণ ফ্রাগি যে মানুষ।

ফ্রাগি মানে লক্ষ্মীছাড়া, ভাগ্যহারা। কেমন ক'রে কথাটা তার এসে গেল কবি লক্ষও করে নি। কিন্তু নিজেকে এখন আর সে অন্য নামে ডাকতে অক্ষম। পাশেই যে হাতকাটা ছেলে।

আর শুধু কাঁদলেই না ফ্রাগি। দগ্ধলাল কথার পর কথায় সে অবারিত ক'রে তুললে জীবনের বীভৎসতা। একে মেনে নিতে কবি আর পারে না।

সকালের হাওয়া বইল। শান্ত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগল ছেলেটা। কলম রেখে জাগন্ত দুনিয়ার দিকে চাইলে কবি।

অনেকক্ষণ থেকেই কঠিন কী একটা যেন তার বুকের পাশে বিঁধছিল। চাপকানের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সে বার করলে সেইদ-খাঁয়ের স্তুতিগানের সেই কুণ্ডলীটা। কিছুকাল থেকে যে সব ভাবনা সন্দেহে কবি পীড়িত হচ্ছিল এখন কী ক্ষুদ্র ও তুচ্ছই না লাগল সে সব! হ্যাঁ, আল্লার মহা আশীর্বাদ যে মানুষের কাছে একই সময়ে মহা শাস্তি। মাথা হেঁট করার যত ইচ্ছাই তার হোক, প্রতিভা যে তাকে উদ্ঘাটিত ক'রে দেবে। দুর্বল মানুষের চেয়ে আল্লার আশীর্বাদের জোর যে অনেক বেশি। প্রতিভার অভিশাপই তো এইখানে... আর নির্মল ঊষায় মামুলী শাদা কোশমার উপর হাতকাটা ছেলেটার পাশে বসে ফ্রাগি তার সমস্ত হৃদয় ঢেলে এ শাস্তির জন্যে কৃতজ্ঞতা জানালে আল্লাকে।

তার হাত থেকে ছেলেটা চাপাটি খেলে কেঁপে কেঁপে, গলায় আটকে। রোগা ঘাড়টা যথাসাধ্য বাড়িয়ে বেশি ক'রে কামড় দিতে চাইছিল সে। এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল দুয়োরের ওপাশে। ডেকে উঠল কুকুর। কুঁকড়ে গেল ছেলেটা। ফ্রাগি বেরিয়ে এসে দেখলে সেই তরুণ তেকে। কেমন যেন তার জানাই ছিল যে তেকে তার কাছে আসবে, তাই অবাক লাগল না।

জিগিতের জখমগুলো এখন ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে,

ফলে তাকে মনে হল আরো তরুণ, প্রায় বালক। কিন্তু বেশ লম্বা সে, সবল, তেজী। তার শান্ত চোখে এখন ফুটে উঠেছে শক্তি, প্রতিজ্ঞা। এক সত্যিকারের মরদ, কিশোর 'বাতির'। হাত বাড়িয়ে ফ্রাগি তাকে ঘরে ডাকলে।

এই প্রথম সাক্ষাতে ওদের মধ্যে প্রায় কোনো কথাই হল না। তেকে বললে ওদের পরিবারের চেনা একটি লোকের ঘরে সে থাকবে। নীরবে চা খেলে। কবি তারপর কুণ্ডলী টেনে এনে রাতে যেটা লেখা হয়েছে পড়ে শোনাল। কেবল একেই, এই কিশোর বাতিরকেই সে এখন তার কবিতা শোনাতে পারে। মেহমান কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে না। কিন্তু তার স্থির চোখকে বিশ্বাস করলে ফ্রাগি। এমন যাদের চোখ, তারাই কবিতা বোঝে...

মেহমান চলে যাবার সময় ছেলেটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে ঘেঁষে এসেছিল তার চাপকানের কাছে। আর এই তরুণ তেকের চোখে ফ্রাগি যা দেখলে তাতে তার হৃদয় আনন্দে ভরে এল। হ্যাঁ, দুনিয়ায় উঁচু লোক, সবল লোক আছে, ভালোবাসতে জানে তারা, মায়া করতে জানে!.. অথচ লোকের ওপর বিশ্বাস তার চলে গিয়েছিল।

ওরা যখন দরজায় এসে দাঁড়াল তখন যা ঘটল সেটা দুনিয়ায় প্রতিমুহূর্তে ঘটে। তরুণ জিগিৎ আর তার পড়শী সাখাৎ দুর্দির মেয়ে — দুজন দুজনকে চেয়ে দেখলে চোখ মেলে। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা টের পেল ফ্রাগি। শুধু মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হল ওদের, তরুণ বাতির আর কুমারী। কিন্তু গোপন কোন এক দুর্বার শক্তিতে বাঁধা পড়ল তারা। এ দেখা যে স্বয়ং আল্লার আয়োজনে!

মুহূর্তের জন্যে মেয়েটি জিগিতের দিকে চেয়েই ঘাড়

ফিরিয়ে নিলে। সাকসাউল গাছের শুকনো ডাল ভাঙার কাজটা তার থামে নি বটে, কিন্তু তার ভঙ্গিটা, কাঁধের ঘুরুনিটা, সবই একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠল। তেকের যে চোখ ছিল এতক্ষণ পর্যন্ত শান্ত, তাতে বিস্ময় ফুটে উঠল। এমন কি মুখটাও কেমন ছেলেমানুষের মতো ফাঁক হয়ে গেল। যে কোনো নারীর মতোই মেয়েটি ছেলেটির চেয়ে বুদ্ধিমান। যা বোঝবার চট করেই সে বুঝলে, ছেলেটি কিন্তু কিছুই বোঝে নি।

তেকে ঘোড়ায় চেপে ফের বিমূঢ়ের মতো তাকালে। কিন্তু মেয়েটি চোখ তুলে চাইল শুধু তখন যখন ধুলোভরা রাস্তায় তার ঘোড়া ছুটতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মেংলিকে একবার দেখার ইচ্ছায় বুকের ভেতর তার মুচড়ে উঠল। মেংলির সেই চেহারাটাই তার মনে ভেসে উঠল যে মূর্তিতে তাকে সে দেখেছিল প্রথম। রুগ্ণ ছেলেটা কি তার ঘুমন্ত জীবনটাকেই জাগিয়ে তুলল? আজ যে সব একেবারেই অন্যরকম লাগছে।

ফের ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেটি। ফ্রাগি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক কোথায় সে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে খেয়াল ছিল না তার। কিন্তু মনের মধ্যে ফুটে উঠছিল একটা নীরন্ধ্র কালচে দেওয়াল, সংকীর্ণ একটা দুয়োর: বহুদিন থেকে মেংলি এখানেই বাস করছে।

আগেও লোকে সম্মান ক'রেই কুশল জিজ্ঞাসা করত কবির। কিন্তু আজ নিজের চিন্তা থেকে হঠাৎ জেগে উঠে কবি লক্ষ করল লোকের চোখে অনেক দিনকার বিস্মৃত কেমন একটা অন্যরকম দৃষ্টি। তাদের সেলামে আজ যেন বিশেষ একটা শ্রদ্ধা। ব্যাপারটা কী? নাকি এটা তার নিজেরই কল্পনা? হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার: পড়ন্ত ছেলেটা, সেইদ-খাঁয়ের

ভ্রূকুটিত চোখ, দুর্দি-খাঁয়ের ঠোঁটে ফেনা... কী যে সে করেছে সেটা এতক্ষণ পর্যন্ত সে ভেবেও দেখে নি।

কয়েকবার সে দুয়োরের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করলে। কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। নিজেকেই গালিমন্দ করে ফ্রাগি ঘরে ফিরে এল।

শহরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় দেখা হল মোহাম্মদ পর্সি'র সঙ্গে। লোকটা ভাব করলে যেন কবিকে দেখতেই পায় নি। শুধু তার পাতলা ঠোঁটেই পিছলে উঠল একটু হাসি। হাসতে পারলে অমন হাসি সম্ভব বোধ হয় কেবল সাপের পক্ষেই।

পুণ্যবান শরীফ খোজামুরাদ-আগা দাঁড়িয়েছিল গয়নার দোকানটার কাছে। কবির কুশল প্রশ্নে সে জবাব দিলে বটে, কিন্তু নিস্পৃহের মতো মুখ ফিরিয়ে নিলে। এটা ভয়ানক কুলক্ষণ। প্রতিটি লোকের উদ্দেশেই সৌজন্যের হাসি হাসা তার অবশ্য কর্তব্য ব'লে খোজামুরাদ-আগা ভাবত।

হ্যাঁ, এবার ওকে আর শান্তিতে থাকতে দেবে না। ও যে মোল্লা সেটাও ওরা ভেবে দেখবে না। কিন্তু কেন জানি ওদের নির্যাতনের আশঙ্কায় ফ্রাগির এখন আর মোটেই ভয় হল না।

ঘোলা নদীর ওপর যখন সে সাঁকোটা পেরচ্ছে, তখন পেছনে ঘোড়ার হ্রেষা শোনা গেল। ঘোড়াটা তাকে একেবারে কিনারায় ঠেলে দিলে, রেলিংটা না ধরলে জলেই পড়তে হত তাকে। মাথা তুলতেই নজরে পড়ল দুর্দি-খাঁয়ের ক্ষিপ্ত চোখ। বেঁটে খাঁ ঘোড়া হাঁকিয়ে গেল গালাগালি দিয়ে, আর একটু হলে চাবুকটা পড়ত ঠিক কবির পিঠেই।

হঠাৎ ভয় পেলে ফ্রাগি। ঠাণ্ডা ঘাম নামল পিঠ বেয়ে। ভয় পেলে নিজের জন্যে নয়। তরুণ তেকে আর মেয়েটির কথা মনে হল তার। তাদের অবস্থাটা যে এখন কী সাংঘাতিক সেটা

পরিষ্কার টের পেলে সে। গকলেনী কন্যা আর তেকে তরুণ — তাও আবার ভূতপূর্ব গোলাম বংশে জন্ম। ওদিকে মেয়েটি খোদ খোজামুরাদ বংশের কুলনারী। বাগ্‌দান হয়ে গেছে! মুহূর্তের জন্যেও কবির এ কথা মনে হল না যে ওরা দুজন দুজনকে ভুলেও তো যেতে পারে। ফ্রাগি যে কবি...

তেকে তরুণটি এল পরের দিনও। তেমনি নীরবে শুনলে কবির কথা।

দুনিয়ায় সবকিছু তখন ভুলে গেছে কবি। ছেলেটা আর প্রতি রাতে তার পাশে বসে লেখা কবিতা — এই হল ফ্রাগির সমস্ত জীবন। রাতে কাঁদত ছেলেটা।

আর প্রতি সন্ধ্যায় ফ্রাগি তার কবিতা শোনাত তরুণ বাতিরকে।

সামনে তার 'কালা বালি'। দশ দিকের হাওয়া তার বুকে, বালির সঙ্গে মিশে আছে কড়া নুন, অফুরান রোদে আতপ্ত, যেন তাড়া ক'রে এসেছে আল্লার অভিশাপ।

দুনিয়ায় সবচেয়ে দুর্ভাগা জাতের বাস এই বালিতে। কুটিল খিভা, ধূর্ত বোখারা আর ক্ষিপ্ত ইরান হানাহানি করে পরস্পর, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জখমগুলো থেকে যায় এই জাতিটির সর্বাঙ্গে। জল খাবার অধিকারের জন্যে তার সওয়ারীরা যায় খিভা, বোখারা, শাহের পল্টনের আগে আগে। তেষ্টায় প্রাণ না দেবার জন্যে ভাই খুন করে ভাইকে। তেকে, ইয়োমুদ, গকলেন, সালোর — একই মাতৃভাষায় তারা অভিশাপ দেয় পরস্পরকে আর মরা ছেলের জন্যে ওই একই ভাষায় কাঁদে তুর্কমেনী মায়েরা।

খাঁয়েদের মুখ চেয়ে থাকা বৃথা। মনুষ্যত্ব খুইয়েছে তারা, লুব্ধ লম্পট তারা শাহ্ বা আমিরের একটি কৃপাকটাক্ষের

জন্যে বেচে দেয় নিজেদের বাপকে। জয় হোক সেই বাতিরের যে উ'চিয়ে তোলে ঐক্যের তরোয়াল!

শীর্ণ কাঁধ থেকে গলা বাড়িয়ে এ কবিতা শুনত হাতকাটা ছেলেটা। ফ্রাগি লক্ষ করল কথাগুলো সে ফিসফিস ক'রে আউড়াচ্ছে। তারপর এক সন্ধ্যায় তিনজনে বসে আছে, ফ্রাগি টেনে নিল তার দোতারা, আর মৃদু স্বরে ছেলেটি তার গান গাইলে।

দুই মরদেরই গলা বুজে এসেছিল। ছেলেটির নির্মল, দুর্বল কণ্ঠে বাজল কবির দারুণ বাণী। মনে হল যেন দুর্ভাগা নির্যাতিত এই মাটি, অকরুণ এই স্বদেশই যেন কাঁদছে হাতকাটা ছেলেটির গানে।

কিন্তু হঠাৎ স্বর ওর কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। ফ্রাগির পৌরুষদৃপ্ত কবিতার দৃঢ়তা ও রোষ গর্জে উঠল তার গানে। খাপ থেকেই আপনিই নিষ্কাশিত হয়ে উঠছে খড়্গ, জঙ্গী ঘোড়ার করাল খুরে কে'পে উঠছে 'কালা বালি', প্রতিহিংসা ও মৃত্যু ছুটেছে দুষমনের দিকে!

কিন্তু জীবন চলল আল্লার ছকা পথে। রাত্রে সেচ খালটার দিকে এগুতে গিয়ে দুটি ছায়া দেখলে ফ্রাগি।

ধবধবে ছোট্ট চাঁদটা থেকে নির্মল জ্যোৎস্না ঝরছে। রহস্যের শাদাটে আবছায় স্থির হয়ে পড়ে আছে পৃথিবী। নীরবে জল বয়ে যাচ্ছে খালটা দিয়ে। কোন এক অপরূপের জন্যেই যেন আল্লা এই চাঁদিনী রাতের সশঙ্কিত স্তব্ধতা পাঠিয়েছেন।

গাছের ছায়ায় আড়াল পড়ে নি ওরা, দাঁড়িয়ে আছে তেকে তরুণ আর কুমারী, দুঁহু দোঁহা তাকিয়ে দেখছে। কবি জানত, ওরা দুজনে এই যে এসেছে সেটা আগে থেকে যুক্তি ক'রে নয়। এখনো ওরা একটা কথাও কেউ কাউকে বলে নি। তাহলেও দেখা হওয়াই যে ওদের ভবিতব্য।

ঠায় অমনি নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা, খোদার কাছে সভয়ে ওরা ওদের সমস্ত সত্তা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এই অমূল্য জীবনের জন্যে। ওদের চোখ দিয়ে যে প্রার্থনা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার চেয়ে বড়ো কলমা আল্লার আর কী হতে পারে... চারিদিক এমন নীরব যে ওদের হৃৎস্পন্দনও যেন শোনা যাচ্ছিল। নাকি ও স্পন্দন ফ্রাগির নিজেরই বুকের...

কার অধিকার আছে ওদের বাধা দেবে? ধীরে ধীরে কবি ফিরে এল ঘরে।

দিনের বেলায় ফের কবি গেল সেই বধির দেয়ালটার কাছে, দরজার প্রতিটি করাঘাতে সশঙ্কে মুচড়ে উঠছিল তার হৃদয়।

রুপোয় নকশা তোলা ফ্রাগি একেবারেই ছেড়ে দিলে, কেবলি লিখত সে। আর সুরেলা শব্দগুলোকে ঘুমের মধ্যে আওড়াত ছেলেটা।

শহরের পুরনো পরিচিতরা চোখ ফিরিয়ে নিত ওকে দেখে। কথা বলার জন্যে কখনো দাঁড়ালেও ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখত চারিদিকে। শহরতলির সাধারণ লোকেরাই শুধু আজকাল তার বাড়িতে আসে।

ফের খালটার কাছে সে গেল। তীরের ঢালুতে বসে তেকে ছেলেটি হাত ধরে আছে মেয়েটির, অপরূপ উদ্বেলিত কোন কথা শোনাচ্ছে। বুক দুলে উঠল কবির। এ কথা যে কবি তার মেংলির কানেই শুনিয়েছে। ছেলেটি জানত না কবিতাটা কার লেখা। যারা ভালোবাসে তারা সবাই আজ বহুকাল থেকেই এ কবিতাটাকে ধ'রে নেয় নিজের বলেই।

নীলাভ মেঘে ঢাকা পড়ল চাঁদ। মুহূর্তের জন্যে জ্যোৎস্না ফুটতেই মেয়েটি চোখ তুললে ওপর দিকে। জ্যোৎস্নায় তার গাঢ়

রঙের গ্রীবা ঘিরে চিক চিক করে উঠল একটা সরু শাদা রেখা। এটা ওর বাগ্‌দানের হাঁসুলি...

ঘুমতে ও পারল না। তার চিরকালের মেংলিকে নিয়ে, তার সমস্ত তারুণ্যে ফ্রাগি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল ঐখানে, ঐ খালপারে। ফের যেন বিচ্ছেদের জ্বালা সইলে সে, উন্মাদের মতো ঈর্ষা বোধ করলে ঐ প্রবল ধনবানের কাছে মেংলি গেছে ব'লে। সে সময় বাধ্য হয়ে যখন খিভায় যেতে হয়েছিল, তখনকার মতোই গলা ওর আটকে এল। ভুলে যাওয়া পদগুলোকে ক্ষিপ্তের মতো সে আওড়ালে।

না, কিছু কিছু জিনিস লোকে ঠিক তেমনটি ক'রে করে নি। মেয়েদের সম্পর্কে কোরানের ওই কথাগুলো — না, ও কথা আল্লার হাতে লেখা নয়। প্রেম, শান্তি, মায়া — এ সবই যে তাদের খোদাই দিয়েছেন। পুরুষের সামনে নারী যতদিন চুপ ক'রে থাকবে, ততদিন দুনিয়ায় কল্যাণ কি ন্যায়ের আশা নেই।

এবার কবির দেখা হল মেংলির সঙ্গে। শান্ত ভাবে তাকালে মেংলি: সাধারণ নারী, সংসারের ঝামেলায় জর্জরিত চল্লিশ বছরের গৃহিণী। নাক, নীরবতার রুমাল চাপা মুখ, মাথায় ভারি বরিক* — আরো হাজারটা মেয়ের মতোই সবই একরকম।

কিন্তু এ কী? তার চোখ, ফ্রাগির সেই তরুণ দিনের চোখ দেখে মেংলি কেঁপে উঠল। হাত তার উঠে এল বুকের কাছে। পরিচিত, ভরন্ত ঠোঁট থেকে খসে পড়ল রুমালের প্রান্ত। বড়ো বড়ো চোখদুটি তার বিস্ফারিত হয়ে অপরূপ ঝলক দিলে। কবির সামনে তারই সেই মেংলি! কী এসে যায় যদি আদরের

---

* মোঙ্গলী শিরোভূষণ। — সম্পাঃ

ঐ চোখদুটির পাশে আজ থাকে বলিরেখা, গণ্ডে না জাগে যৌবনের লালচে ছোপের আগুন, চুলে ধ'রে থাকে পাক। এ যে ওই! পঁচিশ বছর আগের মতো ওরা দুজন চেয়ে রইল দুজনার দিকে। তারপর সরে গেল কোনো কথা না ব'লে। কথার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তরুণ দিনের মতোই দিন কাটছিল অলক্ষ্যে। ফ্রাগি জানত যে তার মাথার ওপর ঘনিয়ে উঠছে কালো মেঘ, কিন্তু তা নিয়ে ভাবতে চাইত না। দুনিয়ার কাছে তার নিজের ক্ষুদ্র নির্বন্ধটা কতটুকু?

লিখত সে, লেখাটা প'ড়ে দেখত, শুনত হাতকাটা শিশুগায়কের কণ্ঠ থেকে তা কোন জীবন্ত বেদনায় ঝরে পড়ছে। মনে হত যেন সবাই তারা চিরকালের চেনা: কবি, ছেলেটি আর বাতির। ছেলেটা এ কয়দিনে কেমন যেন বেড়ে উঠেছিল, যে গভীর যন্ত্রণা সে সয়েছে, তাতে বড়ো দেখাত তাকে। আর দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ বাতির ছিল দেখতে শান্ত। কিন্তু সে শান্তির তলে কী যে চাপা ছিল সেটা কে বেশি জানে ফ্রাগির চেয়ে!

খালপারের দিকে গিয়ে ফ্রাগি আজকাল আর তাদের জ্যোৎস্নায় দেখতে পেত না। গাছের আঁধারে চলে যেত তারা। যাওয়াই যে দরকার...

শেষের বার ফ্রাগির মনে হয়েছিল যেন প্রেমিক যুগলের ওপর শুধু ওরই নজর নেই। যখন ফিরছিল তখন খালধারের একটা ঝোপ থেকে কার যেন ছায়া সরে গিয়েছিল। খোদার ব্যাপারে ফের নাক গলাচ্ছে মানুষ।

তরুণ বাতির প্রথমে তার চোখ নামালে। কান তার টকটক করছিল, ভেবে পাচ্ছিল না হাতদুটো সে কোথায় রাখবে, তার

এই লড়ুইয়ে, বড়ো বড়ো, লোহার মতো হাত। হঠাৎ সে সোজাসুজি কবির চোখে চাইলে, মিনতি করলে আর্জি শুনতে। ফ্রাগি ইশারা ক'রে থামালে তাকে, নীরবে মাথা নাড়লে।

প্রদীপের শিখার দিকে চেয়ে বহুক্ষণ এমনি ভাবেই ব'সে রইল তারা আর নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করলে তেকে তরুণ। শেষ পর্যন্ত ফ্রাগি জিজ্ঞেস করলে তার কোনো জিম্মাদার আছে কিনা। ছেলেটির মুখ হাঁ হয়ে গেল। কী তার আর্জি সেটা কোত্থেকে জানল লোকটা? নিশ্চয় পুণ্যবান শরীফ লোক। কিন্তু ফ্রাগি যে মাত্র কবি।

জিম্মাদার তেকের একজন ছিল বটে, বেপরোয়া সেই চোভদুর, খিভাওয়ালাদের তাণ্ডবের পর মরুভূমিতে যে তাদের সঙ্গ ধরে। কিন্তু হরণ করা কন্যের জন্যে জিম্মাদারণী পাওয়া যাবে কোত্থেকে? সে সাহস করবে কোন নারী? ফ্রাগি চুপ ক'রে চেয়ে রইল দীপ শিখার দিকে। তেমন নারী তার জানা আছে।

উৎসবের গালিচার ওপর ওরা বসেছে কবির সামনে, সসঙ্কোচে পরস্পরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে তারা। তরুণ তেকের পাশেই বসেছে সেই চোভদুর-টি, বেশ দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ, সাহসী চোখ। আর মেয়েটির পক্ষ থেকে বসেছে মেংলি। এতটুকু দ্বিধা না ক'রে সে চলে এসেছে কবির ডাকে।

তার সবচেয়ে সেরা সবুজ পোষাকটি পরেছে ফ্রাগি। মাথায় তার নিখুঁত ছাঁদে জড়ানো ধবধবে শাদা পাগড়ি। গম্ভীর উদাত্ত সুরে প্রশ্ন করে কবি। কে তুমি তরুণ জিগিৎ? কে তোমার বাপ? কে ঠাকুর্দা? কোন বংশের লোক, সে বংশে নিমকহারাম কেউ ছিল কি? পুরুষের অযোগ্য কোনো কাজ সে নিজে কিছু করেছে কিনা?

জবাব দিলে সাক্ষী-জিম্মাদার। কিছুই চাপলে না সে। তেকে ছেলেটির ঠাকুর্দা ছিল গোলাম। তাদের বংশের সাত পুরুষ পর্যন্ত কেউ স্বাধীন ছিল না। নিজে সে অবশ্য পুরুষ অভিহিত হবার যোগ্য। ফ্রাগি তার হাত উঠিয়ে বললে, স্বাধীন প্রজার মেহনতের মতো গোলামের মেহনতও খোদার কাছে সমান দামী।

তারপর জবাব দিলে মেংলি। হ্যাঁ, এ কন্যের বাপ, পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই শরীফ খোজামুরাদ বংশের লোক। স্বয়ং পয়গম্বর তাদের পূর্বপুরুষ, কিন্তু মেয়েটি তার গলা থেকে বাগ্‌দানের হাঁসুলি খুলে ফেললে... ফ্রাগির চোখে পড়ল হাঁসুলির সরু রুপোর তারে একটা গোলাপী দাগ ফুটে উঠেছে মেয়েটির গলায়। কবি বললে, আল্লার এই মর্জি।

পরপর তিনবার সে পালা ক'রে প্রশ্ন করলে ওদের দুজনকে। খোদার দেওয়া সমস্ত আইন মেনে তারা কি একসঙ্গে ঘর করতে চায়? আর তিনবার ক'রেই প্রথা মতো জিম্মাদাররা জবাব দিলে তাদের হয়ে। ফ্রাগি তখন তাদের দুজনকার কড়ে আঙুল মিলিয়ে দিয়ে কলমা পড়লে আল্লার কাছে।

এমন বিভোর হয়ে এ অনুষ্ঠান সে আর কখনো করে নি। বুড়োর সঙ্গে তরুণীকে, সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতকে, তরুণের সঙ্গে তরুণীকে জীবনে সে বিয়ের বাঁধনে কম বাঁধে নি। কিন্তু কাজটা সে ক'রে গেছে বিনা প্রেরণায়। এমন কি নিকার কলমা সে পড়েছে হড়বড় করে, মন্ত্রের অঙ্গচ্যুতিতে গা করে নি।

কিন্তু এখন কেন জানি সে বিচলিত হয়ে উঠল। কলমার একটা কথা বাদ গেলেও তার মনে হল যেন মহা অপরাধ হবে। প্রেমিক যুগলের মিলনের জন্যে খোদার প্রতিটি শব্দই আজ তার কাছে পরম অর্থময়।

অর্চনার দীপ জ্বলছে। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে আছে

সবাই। অস্ফুট স্বরে আসমানের সঙ্গে কথা কয়ে চলেছে কেবল এক ফ্রাগি। তার নিজের দয়াবতার, বিবেচক, মানবিক খোদার নামে সে আজ এই দুটি জীবনকে চিরকালের জন্যে বেঁধে দিলে। নিজেকে তার এত নির্মল আর কখনো বোধ হয় নি।

নিঃশ্বাস পড়ল সবার। ওদের আঙুলের জোড় খুলে দিয়ে কবি বললে, ওরা এখন থেকে স্বামী স্ত্রী। এতক্ষণে হাতকাটা ছেলেটি ঘরে ঢুকতে পেলে। ভাজা মাংসের চ্যাপটা রেকাব নিয়ে এল চোভদুর। তার মাঝখান থেকে ভেড়ার আধকাঁচা হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিলে সে। নিখুঁত সমান দুটি ভাগ ক'রে তার অর্ধেকটা দেওয়া হল তেকে ছেলেটিকে, অর্ধেকটা মেয়েটিকে। 'কালা বালির' প্রাচীন প্রথামতো সে হৃৎপিণ্ড খাইয়ে তাদের মিলনকে করা হল অটুট।

ঘর থেকে বেরল ওরা। ধারালো হাওয়া বইছিল শরতের। কালো মেঘে থমথমে আকাশটা ঢাকা। কিবিতকার পাশে দাঁড়িয়েছিল দুটো লাগাম-বাঁধা ঘোড়া, পিঠে তাদের স্তেপ এলাকার উঁচু জিন। তেকে ছেলেটি আর কন্যে — সবাইকে শুক্র্ জানিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল, তারপর কোনো শব্দ না ক'রে মিলিয়ে গেল আঁধারে।

চোভদুর বিদায় নিলে কবির কাছ থেকে, নিজের ঘোড়ায় উঠে সে পাড়ি দিলে অন্য দিকে। ফ্রাগি মেংলির দিকে ফিরে হাত তুললে বুকে। মেংলিও জবাব দিলে কুর্নিশ করে। তারপর ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে নীরবতার রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে চলে গেল নিজের ঘরে।

আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ফ্রাগি, শুনলে কান পেতে। পাহাড়তলির কোথায় যেন শেয়াল কাঁদছে। ছেলেটিকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে সে ঢুকল ফাঁকা কিবিতকার ভেতর।

সকালবেলায় বাইরে একটা ফাঁপা হল্লা শোনা গেল। ফ্রাগি বেরিয়ে এসে দেখে জন চল্লিশেক সওয়ারী — তাজা ঘোড়ায় চেপে তারা জুটেছে সাখাৎ দুর্দির বাড়ির কাছে। জুটেছে খোজামুরাদদের প্রায় গোটা বংশটাই।

স্তেপের প্রথামতো ফাঁকা ফাঁকা লম্বা সারি বেঁধে তারা ছুটল কাছের পাহাড়গুলোর দিকে। একজনও তাদের কবির দিকে মাথা ফিরিয়ে দেখলে না। ফ্রাগি চেয়ে দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। জানত কী সে করেছে। সৈয়দ বংশের কোনো লোক এবার আর কখনো তার সঙ্গে কথা কইবে না, কথা কইবে না তার ছেলেপুলে নাতিনাতনীর সঙ্গে। এ বংশ কখনো তাদের অপমান ক্ষমা করে না। আর খোজামুরাদ বংশের এমন ভয়ঙ্কর অপমান আগে কেউ কখনো করে নি!

কিন্তু কী করতে চায় ওরা? তেকের সঙ্গে মেয়েটির মিলন বাঁধা হয়েছে খোদার বাণী দিয়ে, সে তো সবাই জানে।

পথের ধুলো মিলাতে না মিলাতে নতুন একদল ঘোড়সওয়ার দেখা গেল পাহাড়টার দিকে। বুক কেঁপে উঠল ফ্রাগির। এই গোলামদলকে সে চেনে — সেইদ-খাঁয়ের ব্যক্তিগত প্রহরী এরা, মানুষের বেশে খাঁটি জানোয়ার।

সশঙ্ক কানাকানি চলল সারা শহরে। কবি কাছে আসতেই চুপ ক'রে যেত সবাই। গোপন কী একটা আতঙ্কে লোকে চাইত তার দিকে। ফ্রাগি যে কাণ্ডটা করেছে সেটা কারো পক্ষে কী ভাবে করা সম্ভব লোকে ধারণাই করতে পারত না। কেউ আর এখন তার ছায়া মাড়াতে চায় না। নীরবে লোকের দিকে দৃকপাত না ক'রে হেঁটে গেল কবি। তাদের সে বোঝে, তাদের সে ক্ষমা করলে।

তৃতীয় দিনে সারা শহর এসে জুটল সাঁকোটার কাছে। দূরের দিকে চেয়ে দেখছিল তারা। হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়ায়

ধূলিময় আবিল একটা কুজ্ঝটিকা। অটুট একটা ধারালো দেয়ালের মতো তা এগিয়ে আসছে 'কালা বালি' থেকে। অন্ধ এই বালু ঝড়কে লোকে বলে তুর্কমেনী বৃষ্টি।

কালো সেই ধুলোর মধ্যে থেকে দেখা দিল সওয়ারীরা, মনে হল যেন ঝড়ের সঙ্গেই ভেসে এসেছে তারা। এখন তারা ফিরছে প্রায় ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার এক ঘনবদ্ধ ঝাঁক বেঁধে। লোকগুলোর মুখের ভাব ক্ষিপ্ত, রুষ্ট। ছয়টি লাস বয়ে আনছে তারা।

লাসগুলোকে রাখা হল চাখানার কাছে, বিছানো হল সোজা তক্তাগুলোর ওপরেই। মোটা মোটা লাল দাগে চাপকান ওদের ডোরাকাটা। কালো হয়ে উঠেছে সাখাৎ দুর্দির বড়ো ভাইয়ের কাটা গলাটা...

পলাতকদের নাগাল ওরা ধরে সন্ধ্যার সময়, খাদ থেকে বেরবার মুখে। তেকে তরুণ ঘোড়া ফিরিয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ে পথের ওপর ভয়ঙ্কর এক লড়াই বাধে জট পাকানো। লড়াইয়ের শেষে দুজন শয্যা নেয় ওই পাহাড়ে পাথরের ওপরেই। ফের তারা ধাওয়া করে তেকের পেছনে, ফের আর একটা লোক ধরাশায়ী হয় পুরোপুরি দু'খণ্ড হয়ে।

শুধু তৃতীয় বারেই তার হাত থেকে রেহাই পায় ওরা। সাখাৎ দুর্দির বড়ো ভাই তার লিকলিকে আর্কান* ছুঁড়ে তাকে বেঁধে ফেলে। যারা ছিল সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। ফাঁস বাঁধা হয়ে মাটিতে থেকেই সে লড়াই চালায়, গা ঝাঁকিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে লোকগুলোকে।

হঠাৎ ঢিল পড়ল আর্কানের টানে। লাফিয়ে উঠল সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো। সবাই যার কথা ভুলে গিয়েছিল সেই নারীই

---

* ঘোড়া ধরার ফাঁস। — সম্পাঃ

তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর্কানধারীর ওপর। এ তার চাচা। মাটিতে উলটে পড়ে সে, আর অবিরাম ছোরা মেরে যায় মেয়েটি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই জানোয়ারের মতো গর্জন তুলে ছুটে আসে সেইদ-খাঁয়ের গোলামেরা।

কালো কালো নোনতা বালির ঝাপট বয়ে গেল মাটির ওপর দিয়ে। চৌমাথায় নিয়ে আসা হল ওদের। ঘোড়ার পিঠের ওপর বেঁধে রাখা হয়েছিল ওকে। বাঁধন খুলতেই মাটিতে পড়ে গেল সে। পশমের মোটা দড়িতে তেকের বলিষ্ঠ দেহ বাঁধা। নীরবে সে শুধু তাকাচ্ছিল ওপরের দিকে।

শক্ত ছাইরঙা কোশমায় জড়িয়ে রাখা হয়েছিল মেয়েটিকে, সেটা খুলতেই লড়তে শুরু করলে ও। দাঁতে কেটে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করলে সে। ধুলোর মধ্যে গড়াচ্ছিল মেয়েটি, বাঁধনের ঘর্ষণে ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিল। কিন্তু পিঠোপিঠি ওদের দুজনকে বাঁধতেই শান্ত হয়ে এল মেয়েটি।

বিচার হল মরুভূমির আদিম আইন — সংসার-দাশ, বা অভিশাপের শিলা অনুসারে। বাগদত্তা নারীকে যখন অন্যে দখল করেছে তখন আসমান জমিন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ওদের কাছ থেকে। লোকের শুধু একটা কাজই তখন করবার থাকে: অপরাধীদের বেঁধে ফেলে রাখা হবে বড়ো রাস্তায়। আর কাছ দিয়ে যেই যাবে, 'কালা বালির' হকের নামে সবচেয়ে বড়ো পাথরটা তুলে তাদের মারতে সে বাধ্য। ঢিল খেয়ে খেয়ে এই ভাবেই তারা মরবে। তাদের স্মৃতিটা পর্যন্ত হয়ে থাকবে অভিশপ্ত।

কিন্তু এ দুজনের যে বাঁধন পড়েছে স্বয়ং আল্লার বাণী নিয়ে! লোকেদের আইন যত প্রাচীনই হোক, আল্লার বাণীর

জোর কি তার চেয়ে বড়ো নয়? খোজামুরাদ বংশের চেয়ে সে কথা আর কে ভালো জানে?

টান টান প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল শত শত লোক। ক্রমাগতই আশেপাশের আউল থেকে লোক এসে নামছিল ঘোড়া থেকে। কোনো কথা নেই জনতার মুখে। শুধু ন্যাতাকানি-পরা পাগল মামেদ অভিশাপ দিচ্ছিল তেকে ছেলেটিকে। চ্যাঁচাচ্ছিল, তেকে আর ইয়োমুদদের সবাইকে কচু-কাটা করা উচিত। অস্বাভাবিক চোখদুটো তার কোথাও স্থির হয়ে থাকছিল না। লোকটার ভাঙা ভাঙা চ্যাঁচানি শুনছিল লোকে, আর অপেক্ষা করছিল।

হঠাৎ আলোড়ন জাগল জনতায়। শহর থেকে সাঁকো বেয়ে ধেয়ে আসছে সওয়ারীরা, ধেয়ে আসছে সদলবলে সেইদ-খাঁ। সেইদ-খাঁয়ের পাশেই পুণ্যবান শরীফ খোজামুরাদ-আগা। এসে থামল তারা। খোজামুরাদ-আগা ধীরে সুস্থে ঘোড়া থেকে নেমে ইঙ্গিত করলে সাখাৎ দুর্দির দিকে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মেয়ের বাপ, গোল নিটোল একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলে মেয়ের দিকে। মেয়ে সোজা তাকিয়েছিল বাপের দিকে। ঢিল এসে সোজা লাগল তার ছোট্ট কুমারী স্তনের ওপর। মুখ না ফিরিয়েই কয়েক পা পেছিয়ে এসে হাত নামাল সাখাৎ দুর্দি... খোজামুরাদ-আগার কটাক্ষপাতে কয়েকটা ঢিল ছুটে গেল বন্দীদের দিকে। ক্ষ্যাপা মামেদ ছুটে এসে প্রতিটি সফল লক্ষ্যভেদ দেখতে লাগল সানন্দে। বেশির ভাগ ঢিলই কিন্তু যথাস্থানে পড়ছিল না।

মারবার জন্যে আরো কিছু লোক হাত তুলেছিল, হঠাৎ সে হাত তাদের থমকে গেল। সরে পথ ক'রে দিলে ভিড়। ফ্রাগি এসে দাঁড়াল বন্দীদের সামনে। গায়ে তার সেই সবুজ পোষাক, মাথায় শাদা পাগড়ি।

লোকে পালাতে চাইছিল তার কাছ থেকে... এখানে আসার সাহস পেল কী ক'রে? নাকি এই বে-পেশা মোল্লা ভেবেছে তার শাদা পাগড়িতেই বুঝি মাথাটা বাঁচবে?

কিন্তু ফ্রাগিও ভরসা করে নি সে শাদা পাগড়ির ওপর। হাতকাটা ছেলেটিকে নিয়ে যে তাকে এখানে আসতেই হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে সবই।

এদের কাছে খোদার কথার কতটুকু দাম! আর কী সেই কথা যা এই সব লোকের ইচ্ছার অমন বশীভূত!..

সবাই ওরা তাকিয়েছিল ওর দিকে: উদ্ধত সেইদ-খাঁ, নির্বোধ কাকাবাই, লোল খোজাগেলদি-খাঁ, বিপুলতনু খোজামুরাদ-আগা। আর চারিদিক থেকে তাকিয়ে ছিল লোকে। সে দৃষ্টি নানা রকমের: কোনোটা ক্ষিপ্ত, কোনোটা কোমল, কোনোটা নির্বোধ, কোনোটা বুদ্ধিদীপ্ত, কোনো দৃষ্টি ঘোলা-ঘোলা, কোনোটা নির্মল। আর ঠিক তার সামনেই কালো দুটি তারার মতো জ্বলজ্বল করছে দুটি আয়ত কুমারী চোখ।

বাতাসে শুধু হিমেল ঝড়ের সমতাল গুঞ্জন। কী করবে সে? চিৎকার করতে শুরু করবে, মিনতি করবে, খোদার নামে অভিশাপ দেবে? কবি জানত এ সবই নিষ্ফল। এদের কাছে অন্য আইনের দাম কী? যে বিয়ে সে দিয়েছে তা এরা মানে না। সেই তাদের ইচ্ছে। আর তাদের যে আইন, সে আইন বিনা শাস্তিতে লঙ্ঘন করা সম্ভব এ কথা যে লোকের স্বপ্নেও মনে হওয়া চলে না। আর খোদা, তাদের খোদা সর্বদাই যে তাদের পক্ষে। আর তার খোদা, দয়াময়, মানবিক খোদা?

স্বয়ং পুণ্যবান খোজামুরাদ-আগা নিচু হয়ে মস্ত একটা পাথর তুলে নিলে। থপ থপ করে পা ফেলে সে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে ওদের সামনে, সজোরে সেটা ছুঁড়ে মারলে তেকের মুখে। তেকে কিন্তু পুণ্যবানের দিকে চেয়েও দেখলে না।

খোজামুরাদ এবার অন্যদিকে গিয়ে আর একটা পাথর তুলে নিয়ে মারলে মেয়েটির মুখে। ভিড়ের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার উঠল। গণ্ডা গণ্ডা, শত শত পাথর ছুটতে লাগল বন্দীদের দিকে। আর্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল তেকে, মাথা দিয়ে, পা দিয়ে রাস্তার ধুলো খামচাতে লাগল সে, নিজের বিরাট দেহটা দিয়ে সে কোনো রকমে আঘাত থেকে বাঁচাতে চাইছিল মেয়েটিকে। কিন্তু ঢিল পড়ছিল সব দিক থেকেই। রক্ত দেখে হঠাৎ জানোয়ার হয়ে উঠছে লোকে। মামেদ নাচতে লাগল একেবারে মত্ত হয়ে। যাকে কেউ কোনো দিন ঘরের চৌকাট মাড়াতে দিত না, সে আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকের জীবনমৃত্যুর মালিক। শেকল বাঁধা সিংহকে যেমন ক'রে ছিঁড়ে খায় কদর্য হায়েনা, তেমনি ক'রে সে ছিঁড়ে খেতে লাগল ওদের। শন শন ক'রে ছুটতে লাগল সেইদ-খাঁয়ের গোলামদের ঢিল।

বরাবরের মতো স্থির ছিল কেবল শরীফ খোজামুরাদ-আগা। ঢিলের পর ঢিল তুলে নিয়ে সে এবার মারতে লাগল কেবল মেয়েটিকেই। তার আলিঙ্গনে ধরা দিতে চায় নি এই জ্বালায় মেয়েটিকে খুন ক'রে চলল বিপুলদেহ, হিংস্র, পাষণ্ড এই বৃদ্ধ।

ঝড়ের জোর বাড়ল। নোনতা ধুলোর আবিল ঝাপট আসতে লাগল কেবলি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্রাগি এই বেদরদ লোকগুলোর মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নোংরা আকাশটাকে। কেঁপে কেঁপে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল হাতকাটা ছেলেটা।

বন্দীরা আর নড়ছিল না। কিন্তু ঢিল মারার বিরাম হয় নি তখনো। নিশ্চল দেহদুটির ওপর ধপধপিয়ে পাথর পড়ছিল। রাস্তার ধূসর ধুলোয় মিশল মানুষের কবোষ্ণ রক্ত। শুধু তরুণের খোলা চোখদুটো ছিল তখনো জীবন্ত।

লোকজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে এবার এসে দাঁড়াল ক্ষুদে এক ঘোড়সওয়ার, দুর্দি-খাঁ। আসতে তার দেরি হয়ে গেছে। মানুষের রক্ত ওকে টানছিল। লোকজন ঠে'লে সরিয়ে সে ক্ষেপার মতো চাবুক কষতে লাগল নিশ্চল দেহদুটির ওপর। সে চাবুকের কর্কশ গুছির আঘাত পড়ল তেকের খোলা চোখের ওপর... চোখ নামিয়ে ফ্রাগি চেয়ে দেখতে লাগল লোকেদের দিকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সবাই তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেইদ-খাঁ, খোজাগেলদি-খাঁয়ের দু'চোখ হাসছে সাপের মতো, খোজামুরাদ-আগার দৃষ্টি ক্ষমাহীন। এমন কি মৃতদের মারতে মারতে দুর্দি-খাঁও তাকিয়ে আছে তার দিকে, কিন্তু সবচেয়ে নিষ্ঠুর, অবারিত, আকণ্ঠ বিদ্বেষে জ্বলছিল মোহাম্মদ পর্সি'র চোখ! হ্যাঁ, এই মোহাম্মদ লোকটা তো আর বোকা নয়। এবং এই মুহূর্তে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা কে বেশি টের পাবে তার চেয়ে!

সবই দেখল ফ্রাগি। দেখল অনেকেই লোক দেখানির জন্যে ঢিল তুলছে, ছুঁড়ছে না। এমন লোকও ছিল যারা শুধুই দাঁড়িয়ে দেখেছে। একটি নারীও ছিল না ভিড়ের মধ্যে।

হঠাৎ দলবল সমেত ছুটে চলে গেল সেইদ-খাঁ। দ্রুত সরে যেতে লাগল লোকে। যারা ঢিল ছুঁড়ছিল তারা হঠাৎ যেন জেগে উঠল একটা মাতাল স্বপ্ন থেকে। পরস্পরের চোখে চোখে এখন আর তাকাতে পারছিল না তারা, ভেবে পাচ্ছিল না কোথায় তাদের হাতগুলো লুকুবে। তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘোড়া টেনে এনে দ্রুত বধ্যভূমি ত্যাগ করতে লাগল তারা।

রইল শুধু সেইদ-খাঁয়ের পাঠানো চারজন গোলাম। আগুন জ্বালিয়ে তারা লোহার কুমগান বসালে চায়ের জন্যে। চেঁচামেচি ক'রে পাগলা মামেদ তাদের বিরক্ত করছিল,

গোলামদের একজন তাকে লাথি মারতেই সে কেঁউ কেঁউ ক'রে ছুটল শহরের দিকে।

কালো আলখাল্লায় গা ঢেকে আগুন পোয়াচ্ছিল দাড়িওয়ালা গোলামগুলো, থেকে থেকে তারা চেয়ে দেখছিল কবির দিকে। ঠিক আগের মতোই ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ফ্রাগি। দুজনেই চেয়ে আছে শুধু ঢিলের উঁচু স্তূপটার দিকে... তরুণ বাতিরের স্থির যৌবনদৃপ্ত চোখদুটির ওপর তার এত আস্থা ছিল যে এ মৃত্যুতে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। হিমেল এই ফুঁসন্ত বাতাসের মতোই মাথায় তার শন শন করছে চিন্তা। কিন্তু সে চিন্তা আসমানের দিকে নয়।

রাস্তায় নিঃসঙ্গ এক একটা আরবা* কি সওয়ারী দেখা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। যাবার সময় ঘোড়া থামিয়ে ঢিল খুঁজে সে স্তূপটার দিকে ছুঁড়ে মারছিল তারা। পাথরের পর পাথর প'ড়ে খটাং ক'রে শব্দ উঠছিল শুধু।

এদিন এর মধ্যেই তিনবার গোলামগুলো গালিচা পেতেছিল নামাজের। মক্কার দিকে মুখ ক'রে তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালে, হাঁটু পেতে বসলে, সামনে দু'হাত বাড়িয়ে মুখ ঠেকালে মাটিতে। নীরবে সবই তাকিয়ে দেখল ফ্রাগি।

হিমেল রাত নামল পৃথিবীতে। আরো জোর বাড়ল হাওয়ার। চাপকানের খুঁটে গা ঢেকে শীতে কাঁপছিল ছেলেটা। পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হচ্ছিল ফ্রাগির, তাহলেও গেল না তারা।

শহরের শেষ সুদূর আগুনটাও যখন নিভে গেল, তখন গোলামদের মাতব্বর থুতু ফেললে ঢিলের স্তূপটার ওপর। তারপর ঘোড়ায় চেপে চলে গেল চারজনেই।

---

* গাড়ি। — সম্পাঃ

কাঠের সাঁকোর ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ওরা সরে এল পাথরের স্তূপটার কাছে। বিরাট স্তূপটা থেকে পাথর সরাতে শুরু করলে ফ্রাগি। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর দ্রুত, কেবলি দ্রুত হাত চলল তার। হাতকাটা ছেলেটাও যা পারে সাহায্য করলে। পুড়ে আসা অগ্নিকুণ্ডটার লকলকে নিভন্ত আভায় দপ দপ করছিল দুটো ছায়া: একটি বড়ো, একটি ছোটো...

হাত ওদের চটচট করছিল। কিন্তু হঠাৎ ফ্রাগির হাতে ঠেকল উষ্ণতা। তেকে ছেলেটির বিপুল বলিষ্ঠ কাঁধ এখনো উষ্ণ। অবিশ্বাস্য এক শক্তিতে ফ্রাগি নিজের কাছে টেনে নিল তাকে, শেষ পাথরটিও ঝরে পড়ল। বাঁধন কেটে দিলে ফ্রাগি, কিন্তু জীবন্ত দেহটা থেকে মেয়েটির ঠাণ্ডা দেহটা ছিন্ন করা হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব। ছোরার বাঁট দিয়ে তেকের হাতের মুঠো খুলতে হল...

শেষ কাঠ কয়লাটা পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত আরো কিছুটা সময় কাটল। আরো গহন হয়ে উঠল রাত। আলকাৎরা-মাখা চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর শোনা যাচ্ছিল না। উড়ন্ত বালির মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা চাঁদটা কখনো দেখাচ্ছে হলদে একটা দাগের মতো, কখনো একেবারেই অদৃশ্য হচ্ছে। উঁচু আরবায় যখন তেকের দেহটা কবি চাপাচ্ছে, তখন তিন পা দূরে হঠাৎ একটা লোক দেখলে ফ্রাগি। চাঁদের আলোটা একটু জ্বলতেই ফ্রাগি চিনলে তার পড়শী সাখাৎ দুর্দিকে। মেয়েটির দেহটাও আরবায় চাপালে ফ্রাগি।

ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে ফ্রাগি গাড়ি হাঁকালে শহর ছাড়িয়ে। আরবায় ব'সে কেবলি নজর রাখছিল হাতকাটা ছেলেটি। লোকটা আসছে তাদের পিছে পিছেই, এগিয়েও যাচ্ছে না, পেছিয়েও পড়ছে না।

বহুক্ষণ এমনি ক'রেই চলল ওরা। তারপর ঘোড়া থামিয়ে বেলচায় মাটি খুঁড়তে লাগল ফ্রাগি। মরা মেয়েটিকে কবর দিয়ে সে মাটির ওপর পুঁতে রাখল শাদা কানি বাঁধা একটা লাঠি। আবার চলতে লাগল তারা। কিন্তু পেছনকার সে লোকটিকে আর দেখা গেল না। কবরের কাছেই রয়ে গেল সে।

যখন তারা পাহাড়ে উঠেছে, তখন ফ্রাগির কাঁধ নেড়ে পেছনের দিকে দেখালে ছেলেটি। লকলকিয়ে সেখানে আগুন দুলছে বাতাসে। অনেক দূর থেকে হলেও নিজের বাড়িটাই যে জ্বলছে সেটা চিনতে ফ্রাগির দেরি হল না...

অনেকক্ষণ ধ'রে সে দূর থেকে চেয়ে দেখলে অগ্নিকাণ্ডটার দিকে। তারপর ফের লাগাম টেনে নিলে, পেছন দিকে আর একবারও না তাকিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

উপসংহার

দুরন্ত শীত শেষ হল। এত হাওয়া এত বরফ বুড়োরা জীবনেও দেখে নি। উদ্দাম ভেজা বালির মাতন শুরু হল নেভরুজে, সেই দিন যখন শীতের পর সবে গরম দেখা দেয়। তবে 'কালা বালিতে' এমন সবুজ ঘাস, এমন লাল পপি, এমন নীল আসমানও আগে কখনো দেখা যায় নি...

আর এই উদ্দাম বসন্তে পপি ফুলের লাল সাগর পেরিয়ে আউল থেকে আউলে ঘুরছে তিনজন সওয়ারী। দ্রুত গুজব ছড়াচ্ছে মরুভূমিতে। ওরা যখন এসে পৌঁছত তার আগে থেকেই লোকে প্রতীক্ষায় থাকত তাদের। তাদের একজন বাজাত দোতারা, আর হাতকাটা ছেলেটা গান গাইত। আর সে গানে এত ব্যথা, এত ক্ষোভ, এত মানবিক রুদ্ররোষ যে লোকের কলজে আর সুস্থির থাকতে পারত না। আর ওরা যখন গাইত,

তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত এক বাতির, এক চোখ তার কানা, সারা গায়ে জখমের দাগ। জোয়ান জিগিৎদের দিকে শুধু সে চেয়ে দেখত, আর সে দৃষ্টি এমন যে সে চ'লে যাবার পর কোনো কথা না ব'লে হাতিয়ার পরখ করতে বসত মরদেরা।

হ্যাঁ, এরা ওরাই: 'কালা বালিতে' এত বড়ো কবি, এত ভালো গায়ক, এত মহা বীর আর জন্মায় নি। সঙ্গে তারা নিয়ে চলেছে ঐক্যের খড়্গ। আর সে খড়্গের খাপে আঁকা কবিতার মতো অপরূপ এক নকশা।

বুক ভ'রে মরুভূমির তাজা নির্মল হাওয়া টেনে নেয় ফ্রাগি, বুকের সেই ব্যথাটা সে আর টের পায় না। কাঁধ টান ক'রে সে খোলাখুলিই মেয়েদের সামনে হাসে। আর দ্রুত কটাক্ষে, সাড়া দেওয়া হাসিতে তারা দেয় প্রতিদান; গালে তাদের ফুটে ওঠে লাল রক্তোচ্ছ্বাস। তারুণ্যের অজ্ঞান প্রজ্ঞায় সে আজ প্রাজ্ঞ, এর চেয়ে বড়ো প্রজ্ঞা দুনিয়ায় আর নেই।

প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন চিত্রকল্প জেগে উঠছে তার বুকে, তার মনে। অনায়াসে অবাধে কথা ভেসে চলেছে মাথার ওপর শাদা মেঘগুলোর মতো। ঠিক এই বছরগুলোতেই ফ্রাগি লেখে তার সেরা যত কবিতা।

মাতভেই তেভেলেভ

মানুষের দাম

স্তুদোনিৎসায়, বলতে কি স্তুদোনিৎসা কেন সমস্ত স্নেগোভেৎস এলাকাতেই ওলিয়োনা স্তেফাকোভার ব্যাটা আন্দ্রেই-র মতো রূপবান ছেলে মেলা ভার।

সবই তার খাসা: সুঠাম গড়ন, ময়লাটে মুখের মিহি আমেজ, ছেয়ে রঙের স্থিরদৃষ্টি চোখ, বাঁ ভুরুর কোনাচে বাঁক, যাতে মুখখানায় তার কখনো অবাক-অবাক কখনো বা মজাদার একটা ভাব ফুটে ওঠে।

শুধু পয়লা নম্বরের লেগিন* হিসেবেই নয়, পয়লা নম্বরের বাবু হিসাবেও আন্দ্রেই স্তেফাকের নামডাক। বলতে কি নিজের বহিরঙ্গ ও সাজসজ্জার প্রতি পাহাড়ে কলখোজের এই প্রধান রাখালটির যত নজর, সেটা স্থানীয় রূপসীদের মধ্যেও কদাচিৎ দেখা যায়। শাদা কাপড়ের কুর্তা পরত সে, তার সবুজ কলার. পুঁতি বসানো শার্ট, টুপির ফিতেয় গোঁজা ফারের ডাল, পায়ে নাল-লাগানো পাহাড়ে জুতো। কিন্তু চলনটা ওর বেশ অনায়াস, আড়ষ্টতা নেই, আর পোষাক পরার ধরনে প্রকাশ পেত ইচ্ছাকৃত একটা অবহেলা।

ফিওদর স্ক্রিপকা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই কী বল তো আন্দ্রেই, নেহাৎ সাধারণ দিনগুলোতেও সাজ করিস পরবের মতো!'

ছোকরা বেশ গুরুত্ব দিয়েই জবাব দিয়েছিল, 'মামুলী দিন আমার নেই, সবদিনই আমার কাছে উৎসবের দিন।'

একটা আড্ডা, একটা বিয়েও আন্দ্রেই-র বাদ যেত না, যদিও নাচত সে কদাচিৎ। আসত, দাঁড়িয়ে থাকত এক পাশে,

---

* ছোকরা। — সম্পাঃ

দাঁতের ফাঁকে ঘাস চিবুত আর তাকিয়ে থাকত যেন অবাক হয়ে।

মেয়েরা ওর জন্যে পাগল হয়ে উঠত। কিন্তু তাদের কেউ আন্দ্রেইকে বিয়ে করবে কিনা এ কথা জিজ্ঞেস করলে জবাব না দিয়ে সবাই তারা অনেকক্ষণ ভাবত। ভাবত, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ত, চোখের জল ফেলত নির্ঘাৎ, কিন্তু আন্দ্রেইকে বিয়ে করার সাহস পেত না।

বয়স্ক মেয়েরা বলত, 'অমন লোককে নিয়ে ঘর করতে হলে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। যাদের রূপ বেশি, তারা জ্বালায় বেশি, এটার আবার তার ওপর জিভে বড়ো ধার, চোখে মায়া নেই...'

তবে আন্দ্রেই স্তেফাক সম্পর্কে এই ধরনের মত শুধু মেয়েদের মধ্যেই ছিল না। এমন কি যে গোরুল্যা কখনোই লোকের সম্পর্কে চট করে মত দিত না, সেও ভাবত রূপ আর গুমর ছাড়া ওলিয়োনার ছেলেটির মধ্যে আর কিছুই নেই; তাই নিয়ে আফসোস করতে সে।

একদিন স্লেগোভেৎসের কলখোজের পার্টি সংগঠনের সেক্রেটারিদের সেমিনার থেকে গোরুল্যা স্তুদেনিৎসায় ফিরছে।

ফিরছে মোটরে করে কলখোজের জন্যে অটোমেটিক পানীয় ব্যবস্থার সরঞ্জাম নিয়ে।

সময়টা মার্চের মাঝামাঝি, আচমকা বরফ গলা শুরু হয়েছে। উপত্যকাতেও বাদলা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখানে পাহাড়ের ওপর আজ দু'দিন ধ'রে চলেছে বরফ মেশা বৃষ্টি। চারিপাশ কেমন বাদামী, ঘোলা ঘোলা। পাহাড়ী ঝোরা ছুটছে, তাদের ওপর পেতে দেওয়া কাঠের পাটাতনগুলো জলের তোড়ে কাঁপছে। মনে হবে যেন এই ভিজুনি থেকে আড়াল আর কোথাও নেই।

এমন কি ড্রাইভারের কেবিনেও জল ঢুকছে।

শীতে কুঁকড়ে গোরুল্যা বসে ছিল ড্রাইভারের পাশে, শুনছিল কী ভাবে মাল ঢাকা তারপলিনের প্রান্তটা পত পত করছে বাতাসে। এমন সময় যেন ইচ্ছে ক'রেই মোটর বিগড়াল। মুখখিস্তি ক'রে ড্রাইভার যতক্ষণে মেরামতটা সারল, ততক্ষণে কুয়াসা মাখা আঁধার নেমে এসেছে। অন্ধকার আর ভেজা তুষার কণার ঘন পর্দা ভেদ করা মোটরের আলোয় সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ স্তুদেনিৎসা তখনো অনেক দূর।

শেষ পর্যন্ত আরো এগুনো গেল। পথটা গেছে কেবলি পাহাড় বেয়ে ওপর দিকে। আর্তনাদ উঠছে মোটরে। যত ওপর দিকে যাওয়া যাচ্ছে, হাওয়ার জোরও ততই বেশি, ভেজা তুষার কণা ছুটছে আরো ঘন হয়ে।

জটিল সর্পিল পাহাড়ে পথটা বেয়ে ড্রাইভার কেমন ওস্তাদের মতো লরিটা চালাচ্ছে, তাই লক্ষ করছিল গোরুল্যা, প্রতিটি সফল মোড় নেবার সময় চেঁচাচ্ছিল তারিফ ক'রে। বুড়ো হলেও মানবিক যে কোনো কৃতিত্বে, বিশেষ ক'রে নিজে যেটা পারে না তাতে অবাক বোধ করার ক্ষমতা তার এখনো যায় নি।

এবার চড়াই। সমস্ত শক্তি লাগিয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল লরিটা। ডাইনে বাঁয়ে পিছলে পড়ছে মোটরের ঘোলাটে, প্রায়-মিটমিটে আলোটা, হঠাৎ এই রাতের আঁধারে সামনে একটা মানুষের মূর্তি দেখা গেল। পথ ছেড়ে ধারে সরে গেল লোকটা।

'এমন সময় কে হে লোকটা?' অবাক হয়ে বললে গোরুল্যা।

ড্রাইভার ব্রেক কষলে, দরজা খুললে গাড়ি থামিয়ে। মোটর থামতেই গোরুল্যার কানে গেল কী ভয়ংকর ঝড় ফুঁসছে পাহাড়ে।

'এই, ওহে মানুষটা? চলেছ কোথায়?' পথিকের উদ্দেশে হাঁক দিলে গোরুল্যা।

'বেশি দূরে নয়,' জবাব এল শান্ত স্বরে, 'ও পারে।'

'আর তুমি লোকটা কে?'

'সে কি চিনতে পারেন নি?'

গাড়ির কাছে এগিয়ে আসা লোকটার দিকে চাইলে গোর‍ুল্যা।

'আরে, একি তুই, আন্দ্রেই!'

'আমিই, নমস্কার।'

'তা কী এমন রাজকাজ পড়ল যে চুড়োয় উঠছিস?'

'এমনি,' তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর দিলে ছোকরা, 'একটু বেড়াবার ইচ্ছে হল।'

'থ‍ু থ‍ু!' রাগ ক'রে থ‍ু থ‍ু ফেলল গোর‍ুল্যা, 'গোল্লায় গেছিস, ঘটে তোর কিছ‍ু নেই।'

আন্দ্রেই হাসল, কিন্তু কী বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। তারপর ভেতরকার কী একটা বাধা জয় ক'রে অন‍ুচ্চ স্বরে বললে:

'বেশ বলছি, যাচ্ছি স্তেপান অস্ত্রভকার কাছে।'

গোর‍ুল্যা শঙ্কিত হয়ে উঠল। তার জানা ছিল যে ব‍ুড়ো স্তেপান অস্ত্রভকার মেয়েটি আজ বছর খানেক ধরে ভারি ভুগছে। বহ‍ুদিন উজ্‌গরদের হাসপাতালে ছিল সে, তারপর অস্ত্রোপচারের জন্য কিয়েভে পাঠানো হয়। অস্ত্রোপচারে সারবে এমন একটা ভরসা ছিল না, তবে ভয়ানক ব্যাধির কবল থেকে মেয়েটির জীবন রক্ষার সেই ছিল শেষ চেষ্টা।

'অস্ত্রভকার ওখানে তোর কী কাজ?' জিজ্ঞেস করলে গোর‍ুল্যা।

'এমনি,' শান্ত ভাবে জবাব দিলে ছেলেটা। 'গ্রাম-সোভিয়েতে বসে ছিলাম, দেখি ব‍ুড়োর নামে টেলিগ্রাম এসেছে, শ‍ুভ সংবাদ. গাফিয়কার জীবনের ভয় আর নেই। বাঁচবে।'

'তাই লিখেছে?' খ‍ুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলে গোর‍ুল্যা।

'হুঁ, হুঁ,' মাথা নাড়লে আন্দ্রেই।

'তুই তাহলে টেলিগ্রামটা নিয়ে যাচ্ছিস?'

'নয়ত টেলিগ্রামটা তো গ্রাম-সোভিয়েতেই সকাল পর্যন্ত পড়ে থাকবে,' বললে আন্দ্রেই, 'বুড়োদের রাত তো আর আমাদের মতো নয়, কাটতে চায় না... শুভ যাত্রা!' কপালের ওপর ভেজা টুপির কানাটা টেনে নামিয়ে ছোকরা চলে গেল।

স্তুদেনিৎসা পর্যন্ত বাকি আট কিলোমিটার পথ বুড়ো আর কথা বললে না। মাঝে মাঝে গাড়ি থামাচ্ছিল ড্রাইভার, কাঁচের ওপর থেকে ভেজা বরফগুলো সাফ ক'রে নিচ্ছিল। কেবল গাঁয়ে ঢোকার সময় বুড়োর মুখ ফুটল।

'মিখাইল!' ড্রাইভারকে বুড়ো এমন ভাবে ডাকলে যেন সে পাশেই বসে নেই।

'কী বলছেন কমরেড সেক্রেটারি?' সাড়া দিলে ড্রাইভার।

'তোকে কী বলতে চাইছিলাম জানিস,' চিন্তিতের মতো বললে গোরুল্যা।

'লোকের খাঁটি দামটা যদি জানতে হয়, তাহলে অন্যের দুঃখ, অন্যের সুখের সামনে তাকে দাঁড়িয়ে করিয়ে দেখিস। কখনো ঠকবি না!'

আনাতলি জ্নামেনস্কি

৩১৯ নং প্রমিথিউস

আমরা ছিলাম তিনশ আঠারো জন।

৩১৯ নম্বর আসে পরে।

বেশ মাঝরাতে দড়াম ক'রে দরজা ঝনঝনিয়ে উঠল। চৌকাটের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল হিমেল বাষ্প, তারপর টোটার খোলের ধোঁয়ার মতো প্রসারিত হয়ে এগিয়ে গেল মাচার দিকে। ভেজা পেছল মেজের ওপর দেখা গেল পোড়-খাওয়া, মরচে-রঙা হাই বুট পরা এক জোড়া পা, বুটের ওপর দিকটা ওলটানো। বাকিটা সব দেখা গেল না লোহার চুল্লির ওপর শুকতে দেওয়া পা-পট্টিগুলোর জন্যে। ব্যারাকটাকে প্রায় আধাআধি ক'রে ঝুলি-ঝুলি এই কানিগুলো কয়েকটা সারিতে ঝোলে।

হাই বুট?

সবাই আমরা তিনশ আঠারো জন দণ্ডিত যুদ্ধবন্দী এই নরওয়েতে বহুকাল ধ'রে কাঠের জুতো আর ছালের লাপ্তি টেনে চলেছি, হঠাৎ কিনা দোরগোড়ায় দেখা গেল হাই বুট, পুরনো বটে, তাহলেও ফ্যাশনসই, ওলটানো কানায় স্পর্ধিত খোলের মধ্যে থেকে ছেঁড়া একটু টিকিও বেরিয়ে আছে।

ঠিক করলাম একা একাই লোকটাকে নজর ক'রে দেখব। হাড়-ভাঙা খাটুনির পর চারিপাশে বন্দীদের সবাই নাক ডাকাচ্ছে, কোঁকাচ্ছে, ছটফট করছে। ক্ষীণ আলো আর বেগুনী ছায়ার মধ্যে দু'তলা মাচা, ন্যাতাকানি, আর ঘুমন্তদের মূর্তিগুলো জড়াজড়ি ক'রে আছে কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মতো। শার্সিগুলো তুষারে অন্ধ। তাহলেও সবাই কিন্তু ঘুমচ্ছিল না।

'কে ওখানে? স'রে এসো...' নতুন লোকটাকে ডাকা হল। খচমচ ক'রে উঠল আমার নিচের মাচাটা। সেভাস্তিয়ানিচ —

আমাদের নির্বাচিত সর্দার — গলা খাঁকারি দিয়ে সে তার কোনাচেমতো ন্যাড়া মাথাটা বার ক'রে উঠে বসল।

দরজার কাছ থেকে লোকটা বললে ভাঙা গলায়, 'নিজেদের লোক,' তারপর প্রশ্ন কর্তার দিকে এগিয়ে এল।

কোণে তার তীক্ষ্ন ছায়াটা পড়েছিল দু'ভাগ হয়ে, কেমন যেন বাদুরের মতো। সে ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গেই এসে হঠাৎ হাই বুটের তলায় অন্তর্ধান করল।

বাতির নিচে আমার তিন পা দূরে এসে দাঁড়াল গাল-উঁচু এক জোয়ান, গায়ে বালাপোষের জামা, বেল্ট নেই, মাথায় একটা শীতের জার্মান টুপি, পিঠে ঝোলা। ধূসর মুখখানার ওপর ঠিক যেন ফটোর নিগেটিভের মতোই শাদা শাদা হয়ে ফুটে উঠেছে তার ছোটো ভুরু দুটো। পুরনো কুর্তাটার বোতাম হাট ক'রে খোলা, তাতে তার টানটান ঘাড় আর কণ্ঠার হাড়ের কাছে শক্ত পেশী দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা আলো চিকচিক করছে সেখানে। এখনো শক্তিমান লোকটা, বোঝা যায় বন্দীজীবন এখনো ওকে কাহিল করতে পারে নি।

বন্দী শিবিরে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো, এমন কি বেশি কথা বলারও নিয়ম নেই। জার্মান ভাষায় এটিকে বলা হয় ব্লক, নতুন প্রত্যেকটি লোক এখানে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার খ্যাতিও নিয়ে আসে। নিতান্ত অকারণে কেউ আসে না এখানে: আমাদের শিবিরের উত্তরে নাকি দুনিয়ারও শেষ — এই হল সাধারণ মত।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সেভাস্তিয়ানিচ আগন্তুককে পরীক্ষা করলে: কেমন একটা বেপরোয়া ভাব ছিল তার মধ্যে, ভাগ্যে যাই আসুক অচঞ্চলে তার সম্মুখীন হতে সে যেন রাজী।

'পালিয়েছিলি?' অভ্যাসমতো মাচাগুলোর দিকে সন্তর্পণে চেয়ে অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল সেভাস্তিয়ানিচ।

'না...' ক্লান্ত গলায় বললে লোকটা, 'এমনি, বাজে একটা ব্যাপার... ধোলাই দিয়ে একজনকে ঠাণ্ডা ক'রে দিই...'

যোগ করলে, 'মামলাটার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই পাঠালে। মানে তদন্ত হচ্ছে... জায়গা একটা মিলবে?'

মাচাগুলো এত ঘেঁসাঘেঁসি যে মাঝখান দিয়ে লোক যাওয়াও দুষ্কর। আমার পাশে কাল একটা জায়গা খালি হয়েছে, গোর দেওয়া হয়েছে জাইৎসেভকে।

নীরবে মাথা নাড়লে সর্দার। লোকটা পাশকে হয়ে এগিয়ে গেল, ন্যাড়া তক্তার ওপর ঝোলাটা রাখলে, তারপর হাতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল ওপরে।

'নামটা কী?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে সেভাস্তিয়ানিচ।

'ভলোদকা...'

নিচু ছাতের নিচে কোনো রকমে এঁকেবেঁকে গায়ের বালাপোষের কোর্তাটা খুললে, বিছানা পাতলে, মাথার নিচে ঝোলাটা গুঁজে শুল আমার দিকে পিঠ ক'রে।

অন্য আর এক ভলোদকার কথা মনে পড়ায় বোধ হয় জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছিল আমার। জাইৎসেভ আসার আগে সে ছিল আমার পাশেই। লোকটা বুঝলে আমি ঘুমুচ্ছি না। পাশ ফিরলে আমার দিকে।

ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'খাটতে পাঠায় কোথায়?'

'বনে। কাঠ চেলাই করি...'

বলা উচিত ছিল যে আমাদের এই ঘাঁটির ওপরে দক্ষিণের জার্মান সিমেণ্ট ফ্যাক্টরির জন্যে কাঠ জোগাবার ভার চাপানো হয়েছে। গত বছরের শরৎ থেকেই জার্মানদের সিমেণ্টের প্রয়োজন হয়েছে অনেক বেশি — সব ফ্রণ্টেই পিছচ্ছে তারা।

কিন্তু সে কথা বললাম না। লোকটার মুখে একটা লালচে ক্ষতচিহ্নে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল। কপালের রগ থেকে থুতনি পর্যন্ত

একটা কর্কশ জখম তার লালচে দাগ রেখে গেছে — এ ছাপ আর মোছার নয়।

মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জার্মানদের কাণ্ড?'

'না... একটা মাতলামির ব্যাপারে আর কি...' উপহাসের দৃষ্টিতে ও চাইলে আমার দিকে।

সন্তর্পণে, যেন ক্ষতটা সারে নি, গালের ওপর হাত বুলাতে বুলাতেই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাত, ব্যারাকের গুমোট। ঢলে পড়ল সবাই।

'কেমন ধারা লোক,' ঘুমতে ঘুমতেই অবাক হয়ে ভাবলাম আমি।

শিবিরের রাত — দিনের নির্যাতনের হাত থেকে সংক্ষিপ্ত একটু পরিত্রাণ। আমাদের কাছে ভারি ক্ষণিক ব'লে মনে হয় তা। দু চোখ বুজতে না বুজতেই — সারা গতরে ব্যথা, দেহ বিশ্রাম চাইছে, — ওদিকে লোহার টুকরোয় কাজের ঘণ্টি বাজতে শুরু করে, তার ঘেরা এলাকাটার বাইরে শুরু হয়ে যায় কর্ণভেদী কুকুরের ডাক। জার্মান পাহারাদাররা ছুটে আসে ব্লকে, রুটিন ভাঙার সাহস যারা করেছে তাদের ধাক্কিয়ে তোলে। রসুইঘরের কাছে, অন্ধকারের মধ্যে শুরু হয় কালো নীরব সারি বাঁধা। ঝন ঝন করে কটোরা, দুর্গন্ধযুক্ত তরল সূপ ঢেলে দেওয়া হয়। না-ছোলা আলু, মূল আর মেছো গন্ধে কসমস ক'রে ওঠে চিবুক।

কাজে যেতে হবে 'শেষ লোকটিকে বাদ দিয়েই'।

সবচেয়ে শেষে যে আসবে তাকে রবারমোড়া লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটানো হবে বাকিদের হুঁশিয়ার করার জন্যে।

আগন্তুককে সঙ্গে টেনে কাজে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছিলাম আমি। কিন্তু কোনো ফল হল না। তৈরি হতে বড়োই দেরি

হচ্ছিল ভলোদকার, এমন সযত্নে পায়ের পট্টি বাঁধতে লাগল যেন সার্জেণ্ট-ইনস্ট্রাকটর নতুন রিক্রুটদের শেখাতে এসেছে। ব্লক থেকে সে বেরুল সব শেষেদের একজন, তাহলেও ফটক পর্যন্ত পেঁছিল মার না খেয়েই।

দূর থেকে আমি দেখছিলাম ওকে। হাঁটছিল ভলোদকা ভয়ানক কুঁজো হয়ে, খাড়া গর্দানটা গুঁজে, জানোয়ারের মতো তাকিয়ে দেখছিল চারিদিকে।

কেমন যেন খানিকটা নেকড়ের ভাব ছিল তার মধ্যে। ঘেরাও হয়ে ঠিক এমনি গুরুভার শান্ত কদমেই কেঁদো নেকড়ে চলে যায় বুনো খাদের দিকে। শিকারী কুকুরগুলো তাকে ছুটে এসে ধ'রে ফেলতে পারে বটে, কিন্তু প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস পায় না কেউ। মুহূর্তের জন্যেও নিজের গতিবেগ না কমিয়ে নেকড়ে শুধু একবার মুখটা ফেরায়, ঝট ক'রে তার শ্বাপদ দাঁত বসিয়ে তেজী উত্তেজিত অনভিজ্ঞ কুকুরকে দুটুকরো ক'রে ফের চলতে থাকে...

ফটকের কাছে শিবিরের লোকদের বাছাই করা হয় পাঁচ পাঁচ জন ক'রে। প্রতিটি দলের জন্যে এক একটি স্লেজ, টানার ব্যবস্থাটা খুবই সরল। সামনের লোকটা ঘাড়ে বন্ধনী চাপিয়ে স্লেজের দুই ডাণ্ডা চেপে ধরে দুই বগলের নিচে। অন্য দুজন ডাণ্ডার দুপাশে কাঁধে লাগাম চাপিয়ে টানে। আর বাকি দুজন লগি দিয়ে ঠেলে স্লেজের পেছন দিকটায়।

'অন্তত চিঁহি ক'রে ডাক ছাড়তে দেয় তো শালারা?' লগি ধ'রে তৈরি হয়ে বললে ভলোদকা।

কেউ জবাব দিলে না।

মিছিল শুরু হল। পাঁচ কিলোমিটার দূরে আমরা টেনে নিয়ে যাই খালি স্লেজ। সন্ধ্যায় শিবিরে পেঁছিতে হবে দুই

কিউবিক মিটার ক'রে চ্যালা কাঠ নিয়ে। বোঝাই করতে হবে ওয়াগনে।

রাস্তাটা সরু, গভীর তুষারের মধ্যে ঠিক একটা নালার মতো। আমাদের পাহারা দিয়ে চলেছে চার জন বয়স্ক জরাজীর্ণ জার্মান। দুজন সামনে চলেছে রাইফেল বাগিয়ে, দুজন তাড়া দিচ্ছে দলটাকে। শীতকালে পাহারার জোরটা কিছু কম, সঙ্গে কুকুর নেই। সুইডিশ সীমান্ত এখান থেকে তত দূরে নয়, কিন্তু পালাবে কোথায়, চারিপাশেই কোমর পর্যন্ত বরফ, পায়ে হাঁটার যে একমাত্র পথটা মিলবে সেটা সিধে গেছে স্টেশনে আর কণ্ট্রোল পয়েণ্টে।

ফুরফুরে তুষার কণায় ভরা নীলাভ নরওয়েজীয় প্রভাত ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে এল, পরিষ্কার হয়ে উঠছে গাছগুলোর আকার। বাতাস উঠছে, ঘূর্ণি খাচ্ছে নতুন পড়া তুষার, কাঠের জুতো আর লাপ্তির ছাপ পড়ছে রাস্তায়, ছুটন্ত স্লেজের পেছু পেছু পায়ে পায়ে, দম ফেলে ফেলে আমরা চলেছি...

যে প্লটটায় আমাদের কাজ, সেখানে গতকালকার অগ্নিকুণ্ডগুলো কালো হয়ে আছে। আমাদের সিনিয়র এস্কর্ট হেঙ্কে, দাড়ি গোঁপ কামানো মুখ, ঠ্যাংটা বাঁকা, গাছের গুঁড়ির ওপর লাইটার রেখে সরে গেল: চারটে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাতে হবে ওদের জন্যে, একটা আমাদের। সে আগুন জ্বলল। সেভাস্তিয়ানিচ রয়ে গেল জার্মানদের আগুনে কাঠ জোগাবার জন্যে। আমাদের কাজ বরফ ভেঙে গাছ ফেলা।

স্লেজ থেকে দুই হাতলের রুশী করাত টেনে নিলাম আমি। ভলোদকাকে বললাম অন্য দিকটা ধরতে। সন্দিহানের মতো সে একবার চেয়ে দেখলে করাতটার দিকে, তারপর আমার হাড়-খোঁচা কাঁধ আর লম্বাটে হাতটার দিকে। মুখ ঘুরিয়ে নিলে সে।

'ওই করাত হলেই হয়েছে আর কি...' বিড়বিড় করলে সে, তারপর একটা এক হাতলের করাত নিয়ে একাই চলে গেল কাছের গাছটার দিকে।

'শালা!' ভলোদকার উদ্দেশে কথাটা বললে বুড়ো ফেদোসভ, তারপর এগিয়ে এসে আমার করাতের অন্য দিকটা ধরল।

প্রথম ঝাঁকড়া ফার গাছটার চারপাশে আমরা পা দিয়ে বরফ দুরমুশ ক'রে গর্তের মতো করলাম, ভলোদকা কিন্তু পাশের গাছটার কাছে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মাথা তুলে মুগ্ধের মতো তাকিয়ে দেখছিল চুড়োর দিকে। হিমে আড়ষ্ট ফার কাঁটাগুলো আগাগোড়া বরফে মোড়া, মনে হয় যেন বাতাসে ঝনঝন করছে।

আমাদের দিকে ভালো মানুষের মতো চাইলে ভলোদকা, হাসলে:

'ওহ্, দ্যাখো শালা তোমার রুটির ছাল আর জোলো সুপ! একেবারে ডগায়।'

তারপর যোগ করলে:

'শালা বরফের গাদিতে একবার পড়লেই হয়েছে, তখন সন্ধে অবধি গ্যাঁতাও!'

তারপর হঠাৎ খ্যাপার মতো গাছের গুঁড়িটায় চালাতে লাগল তার চমৎকার ক্যানাডিয়ান দাঁতের করাত।

...সন্ধ্যার দিকে আমাদের আর শক্তি ছিল না।

তিন চার কিউবিক মিটার ক'রে কাঠ ফেড়েছি আমরা, নর্ম ছিল পাঁচ। সেজন্যে গভীর রাত পর্যন্ত আমাদের বনে আটকে রাখা হল। আগুন পোয়াবার জন্যে অগ্নিকুণ্ডের কাছে ঘেঁষাও নিষিদ্ধ। সে দিকে গুলি চালাচ্ছিল এস্কর্টরা।

কিন্তু ভয়ে কি আর কখনো মানুষের শক্তি বাড়ে?

রোগা, বেঢপ চেহারার ইতালীয় জোভান্নি আর তার সাথী, শিথিল দেহ, দাঁত-ভাঙা, লোরেনবাসী ফরাসী জাঁ একটা কাটা

পাইন গাছের আড়ালে ডালপালার ওপরেই ব'সে পড়ল। গুলি ছুঁড়েও এখন তাদের উঠিয়ে করাত চালাতে বাধ্য করা অসম্ভব।

ভলোদকা এসে বসলে তাদের কাছে, সরু একটা চুট্টি ধরালে, তারপর উৎসুকের মতো চেয়ে দেখলে অপরিচিত লোকগুলোর দিকে। খাটুনিতে, খিদেয় ওরা একেবারে অবসন্ন, কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসে আছে তারা, ফাঁকা চোখে নিরুপায়ের মতো চেয়ে আছে বনের নীল শিরদাঁড়ার ওপর শাদা শাদা উড়ন্ত তুষার মেঘের দিকে। কোন দিকে উড়ে যাচ্ছে ওরা? হয়ত দক্ষিণে, লম্বার্ডির উপত্যকায়, লোরেনের আঙুর ক্ষেতের দিকে?

লোকগুলো একেবারে অসহায়, করুণ। আর বোঝাই যায়, মানুষের দুর্বলতা ভলোদকার অসহ্য লাগত। ভাঙা ভাঙা জার্মান আর ফরাসী ভাষার সঙ্গে নিজস্ব রুশী মিশিয়ে ও কী যেন জিজ্ঞেস করছিল ওদের, তেড়ে গালাগাল দিচ্ছিল দুজনকেই, আর ওরা কখনো ভয়ে ভয়ে চোখ তুলছিল, কখনো বা তার ক্ষিপ্ত, নীলচে ঠোঁটে সিগারেটের টুকরোর দিকে চেয়ে চেয়ে অকারণেই হাসছিল।

গোঁয়ারের মতো সেটা টানছিল ভলোদকা, নাক চোখ কুঁচকে ভ্রূকুটি করছিল। তারপর ক্ষেপে গিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেললে তুষার স্তূপটার ওপর। অনাহত শাদা তুষারের উপর একটা কালো চিহ্ন বিঁধে রইল, যেন গুলির দাগ। এরা দুজন হতাশ হয়ে নিঃশ্বাস ফেললে, আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে স্ফুলিঙ্গ বিন্দুর দিকে।

'তোকে তাহলে জোভান্নি বলে ডাকে? আর তোর নাম জাঁ,' হঠাৎ হাঁটুর ওপর ব'সে প্রত্যেকের বুকে আঙুল দিয়ে দিয়ে ভলোদকা জিজ্ঞেস করলে। 'দেখ ভায়া কী দাঁড়াচ্ছে।

ভেবেছিলাম দুজনেই তোরা হলি ইভান, তাকিয়ে দেখি একেবারে দুবলা!'

পাশেই বসেছিলাম আমি, ভলোদকার আস্তিনে টান দিলাম:

'কী পেছু লেগেছিস ওদের, ছেড়ে দে! গত হপ্তা থেকেই ওরা ওপারে যাত্রা করেছে, দেখতে পাচ্ছিস না?..'

'কোত্থেকে এসে জুটল এখানে?' ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না ভলোদকা।

নরওয়ের শিবিরে ফরাসী এল কোত্থেকে কেউ জানত না। তবে জোভান্নির কাহিনীটা আমাদের কারো কারো জানা। সে কাহিনী গোপন রাখাই উচিত, কিন্তু কেন জানি ভলোদকার ওপর বিশ্বাস ছিল আমার।

গত বছর এই ইতালীয়ানটি পালিয়ে আসে আমাদের পার্টিজান দলে। ওকে তখনো ঠিক মতো পরখ ক'রে দেখা হয় নি, এমন সময় হঠাৎ পার্টিজান দলটাই জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

খুবই মারাত্মক ব্যাপার! জার্মানরা যদি জোভান্নির পরিচয় জানতে পারে, তাহলে তার কপাল মন্দ।

ভলোদকা তার আচরণ সংশোধনের জন্যে এক্ষুণি দ্বিতীয় সিগারেট বানাতে রাজী। কিন্তু পকেটে ওর আর মাখোরকা ছিল না...

একেবারে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। এস্কর্টের সারি বাঁধার হুকুম হল।

শিবিরে একটা ঘণ্টা আছে, যা একেবারে দেবদুর্লভ সার্বজনীন স্তব্ধতার ঘণ্টা। সেটা হল রাত্রের খাওয়ার সময়।

ক্ষুধা কী জিনিস সেটা যুদ্ধের সময় অনেকেই জেনেছে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ক্ষুধা, বহু বছরের অবিরাম একটা বুভুক্ষা,

অতৃপ্ত নিষ্ঠুর একটা রিপুর মতো যা সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে — তেমন ক্ষুধা জানে শুধু তারাই যারা অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়েছে।

কটোরাটা আশ্চর্য ছোটো, সেটা ভরতি হয় নিতান্তই এমন একটা তরল পদার্থে যাতে তলের মর্চেটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে না। আর কাঠের গুঁড়োর যে রুটি সেটি একেবারে সত্যিকারের অমৃত। নানা তার নাম 'চটা', 'পঙিখ', 'টুনটুনি' — কেননা আমাদের শূন্য জঠরে তা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যায়।

কটোরাগুলো বুকে ক'রে মাচায় বসে থাকে লোকে, যন্ত্রের মতো চিবুক নাড়ায়, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া খাদ্যাংশটি নিয়ে পূজারীর মতো ধ্যানস্থ থাকে। এই খাদ্যটুকুই যে জীবন।

আর কটোরা নিঃশেষ হওয়া মাত্রই আরো তীব্র হয়ে ওঠে ক্ষুধা।

ক্ষুধার্তের যে ঘুম আসে সেটা কেবল অসম্ভব ক্লান্তি ও দুর্বলতার ভারেই। আর স্বপ্নেও সে কেবল খাদ্যই দেখে... স্বপ্ন নয়, মরীচিকা। আর যা দেখে সেটা কোনো বিরল উপাদেয় খাবার কিছু নয় — দেখে যত দৈনন্দিন মোটা খাবার, পেল্‌মেনি, হলদেটে, সুসিদ্ধ, ঘি মেশানো গমের ঘ্যাঁট, গাদা গাদা সরু চাকলি, ফেনিল দুধের সাগর, ইঁটের মতো সারি দেওয়া রুঁশী ছাঁদের বড়ো বড়ো পাঁউরুটি।

কেউ কেউ আর পারে না, গল্প শুরু করে বাড়িতে, কলখোজে, বিয়ের নেমন্তন্নে, প্রতিবেশীর জন্মদিনে কী সুখাদ্যই না সে খেয়েছিল, মেসিন-ট্র্যাকটর কেন্দ্রের মেকানিকের বাড়িতে প্যান ভর্তি ভাজা মাছটা সব শেষ না ক'রে কী বোকামিই সে করেছিল... এ রকম গল্প করলে তাকে রূঢ় ভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়, প্রকাশ্য ঘৃণা ঝরে পড়ে মানবিক দুর্বলতার প্রতি।

সকলেরই একটা মৌন সম্মতিতে খাবারের গল্প করা বারণ। শক্তি তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

খাবারের পর ভলোদকা জুতো না খুলেই মাচার ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে রইল নীরবে, আমার পাশ কাটিয়ে কোথায় কোন শূন্যে চেয়ে রইল ভোঁতা চোখে, গোটা মুখে কেমন একটা অদ্ভুত তন্ময়তা।

'কী মনে হয়, খাবার দেওয়া এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে না?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে সে।

'শেষ হওয়ারই কথা...' বললাম আমি।

মাচা থেকে এক পা ঝোলালে সে, অলক্ষ্যে বুট থেকে ছুরিটা খসিয়ে সেটা রাখলে নিজের বুক পকেটে, তারপর কটোরাটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল ব্যারাক থেকে। কেউ সে দিকে খেয়াল করলে না।

যখন ফিরল তখনো আমি জেগে।

মাচার ওপর ও কটোরাটা রাখলে, পাতলা মণ্ডে সেটা ভর্তি, মনে হয় সুপ বিলি করার পর যা বাকি পড়ে ছিল তাই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল সে।

মাথাটা ওর ওপরের মাচার কাছাকাছি, কটোরাটা একেবারে মুখের কাছেই। পাত্রটার দুই পাশে কনুই দুটো রেখেছে স্থির ভাবে, প্রায় নড়ছিল না তা, কিন্তু এমন নিয়মিত ভাবে কান ওঠা নামা করছিল যে দেখে হিংসে হয়। মুখটা চিবিয়ে যাচ্ছিল।

নিজেকে কষ্ট না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়াই আমার বরং ভালো। কিন্তু ঘুমতে পারছিলাম না।

ইচ্ছে হয়েছিল টুল ছুঁড়ে ওকে মারি, কটোরাটা ছিনিয়ে নিই, অন্তত ওর চোখের দিকে একবার স্পষ্ট ক'রে তাকাই। কিন্তু চোখের পাতা আধো বুঁজে আমি শুয়েই রইলাম, চেষ্টা করলাম ঘুমতে।

ও অবশ্যই টের পেয়েছিল যে আমি ঘুমোই নি।

কটোরার তলে ঠং ক'রে চামচ রেখে ভলোদকা ধীরেসুস্থে ফিরল আমার দিকে, তারপর আমার বুকের ওপর কটোরাটা চাপিয়ে দিয়ে শান্ত ভাবে বললে:

'নে, চেঁচেপুঁছে খেয়ে নে, ধুয়ে রাখিস।'

সেই মুহূর্তে কী ঘৃণাই না ওর ওপর হয়েছিল! কিন্তু হাত আমার সলোভে সকৃতজ্ঞে টেনে নিল মণ্ডের ধারানির প্রচুর ছোপ লাগা কটোরাটা।

না, শূন্য কটোরা ও আমায় দেয় নি! তিন চার চামচ খাদ্য সেখান থেকে তখনো চেঁছে তোলা যেত, এমন তিন চার চামচ যা কোনো কোনো সময় মানুষের আয়ুকে পুরো একদিন বাড়িয়ে দিতে পারে!

ওর মণ্ড আমি খেলাম বটে, কিন্তু সেই দিন থেকে তাকে ভাবতে লাগলাম অধঃপতিত ব'লে।

সেভাস্তিয়ানিচ কিন্তু কেন জানি ভলোদকার ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠল।

পরের সন্ধ্যায় আমাদের নির্বাচিত সর্দার ওর সঙ্গে মাচায় বসে অনেকক্ষণ ধ'রে তার খবরাখবর নিলে, নিজের কাহিনীও শোনালে বেশ বিশ্বাস ক'রেই। ওদের নীরব সম্মতিক্রমে আমি সে আলাপের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

কখনো, এমন কি সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও, এমন কি 'কান খাড়া' ব্যারাকের মধ্যেও লোকে কখনো আমার কাছে তাদের মনের কথা বলতে ভয় পেত না! এবং হয়ত সেইজন্যই আমার ভাবনা সর্বদাই কেমন যেন আমার কমরেডদের ভাবনার সঙ্গে মিলে যেত, আমাদের ভালোবাসা বা ঘৃণা কখনো একার ছিল না, সেটা ছিল সবাই মিলে একসঙ্গেই।

সেভাস্তিয়ানিচ ঝুঁকে ছিল ভলোদকার দিকে, মনে হয়

ঝিমুচ্ছিল। ইলেকট্রিক বাতিটাকে আড়াল ক'রে বসেছিল সে, আলোর দপদপে পটে ওর কোলকুঁজো কালো সিলুয়েটটা চোখে পড়ছিল আমার। ঘুমন্তদের নাক ডাকানি আর ঘুমন্ত বকুনির মধ্যে তার মৃদু মাপা কথাগুলো শোনা যাবার কোনো আশঙ্কাই ছিল না।

অধিকৃত অঞ্চলে রোভনোর কাছে জার্মান কম্যান্ডেন্ট-দপ্তরের আস্তাবলে কাজ করত বুড়ো। কথাটা সে আগেই খোলাখুলি ব'লে রেখেছিল যাতে শিবিরের ভেতর জার্মান গুপ্তচরদের কোনো অবান্তর সন্দেহ না জাগে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনো একটা অতি জরুরী কারণ ছাড়া জার্মানদের কাজে ও এমনি 'ঢোকে' নি। খুব ভালো ক'রেই চিনি ওকে। নেহাৎ একটা পেটসর্বস্ব লোক ও নয়, খাঁটি রুশী মানুষ।

ভলোদকা হঠাৎ লাফিয়ে বসল মাচায়, মাথাটা ঠেকল চালের খুঁটিতে। থাবা দিয়ে বুড়োর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে:

'শালাদের কাছে গেলে?!'

ভলোদকার মুখের বদলে চোখে পড়ল শুধু একটা রোষ-কষায়িত লালচে ক্ষত।

সেভাস্তিয়ানিচ শান্ত ভাবে তার হাত ছাড়ালে:

'শুয়ে থাক, ছটফট করিস না। পরের টুকু শোন...'

গলার স্বরে ওর আফসোস শোনা গেল।

'পরে সবই বেশ ভালোই হত ভায়া, তবে একটা ঘটনায় ডুবিয়ে দিলে, ওহ্ ভগবান! এ কসুর আমার কেউ আর মাপ করবে না...'

একেবারে ধারে সরে এসে কান খাড়া ক'রে রইলাম আমি...

সেভাস্তিয়ানিচ ব'লে চলল, 'একবার এল কোন এক বড়ো কর্তা, ঠিক জানি না কী তার পদ, হয় ওবেরষ্টুর্মফুরার কিংবা আরো বড়ো কিছু একটা হবে...'

সেভাস্তিয়ানিচ ফ্যুরের-এর বদলে 'ফুরার' বলত।

'এল, পাশের গাঁয়ে তারান্তাস গাড়ি ক'রে তাকে পেঁছিতে হবে। বনের মধ্যে... তার পাশে বসল খোদ পুলিস কর্তা, শালা শুয়োরের বাচ্চা। আর আমি কোচোয়ানের বাক্সে...'

নিঃশ্বাস ফেললে বুড়ো, আরো নিচু হয়ে এল তার মাথা।

'তাকিয়ে দেখলাম ওবেরফুরারের দিকে, যখন কোচ বাক্সে উঠছিলাম। মন্দ দেখতে নয় জার্মানটা, বয়স হয়েছে, দেখনসই চেহারা, চোখ দুটি বুদ্ধিমান। দেখ, ওদের মধ্যেও তাহলে মানুষের মতো চেহারা মেলে... আর ওই হল আমার কাল। জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগল আমায়, খাঁটি রুশ ভাষায় বলে কে আমি, কোথায় বাড়ি, কলখোজ হবার আগে কত জমি আমার ছিল। আর আমি, সত্যি কথা বলতে, গরিব কাঙাল তো কখনো ছিলাম না, ক্ষেতমজুরি করতে আমার ঘেন্না লাগত... টের পেলাম আমার জীবন কাহিনীটা ওনার ভালোই লাগল। বলে 'বাউয়ের'। তারপর শয়তানটা জিজ্ঞেস করে-কি, যেন এমনিই, যেন কথার কথা, — কী বলিস বুড়ো, রাশিয়া হারবে, নাকি হারবে না?

'ঠিক যেন এক ডাণ্ডা মারলে মাথায়। আমার যা অবস্থা তাতে কী বা জবাব দিই? যদি বলি, তোমরাই জিতবে, তাহলে লোকটা তো বোকা নয়, পিঠে আমার থুতু দিত, ভাবত লোকটা একটা কৃমিকীট। শালা জানে তো মনে মনে কী ভাবছি, আমায় একটু পরখ ক'রে দেখাই তো ইচ্ছে। যদি বলি, না, হারাতে পারবে না, সে মুরদ নেই, তাহলে খামোকাই গুলি চালিয়ে দেবে খুলিতে। আর বাঁচার তো লোভ হয়, ভায়া! আর শুধু তো নিজের জন্যেই বাঁচা নয়, লোকের কাছে কর্তব্যও তো আছে... কী জবাব দিই?

'খানিকটা ভেবে নিয়ে ঘোড়ায় চাকুক হেঁকে মাথা না

ফিরিয়েই বললাম, — আচ্ছা বলুন তো হের অফিসার, আপনাদের ফৌজের সংখ্যাটা আপনি মোটের ওপর জানেন তো? বলে, — জানি বৈকি। বললাম, — তবে আর কি, আমাদের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি বসত পিছু আপনাদের এক জন ক'রে সৈন্য কুলাবে কি?

'কানে এল আমার প্রশ্ন শুনে যেন হেসে উঠল, বেশ জোর দিয়েই বললে, — বটেই তো, গ্রাম পিছু একটার বেশি সৈন্য আমাদের জুটবে না। বললাম, — এহ্! একটা সৈন্য, ও আর কতটুকু। আপনাদের ও একটা সৈন্যকে তো কুয়োর পারেই আমাদের মেয়েরা তাদের জল বইবার বাঁক দিয়ে সোজাসুজি...'

মাচার ওপর উঠে বসলাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কাহিনীকারের দিকে। 'কী হল তারপর?' ভলোদকার মুখের ক্ষতটা নিষ্প্রভ হয়ে উঠল, কেমন নীলচে হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল অন্ধকারে।

'দেখি ওবেরফুরার আমার কাঁধে হাত দিলে। এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলে, — ভয় পাস নি তাহলে, নে খোদ আমার কাছ থেকে উপহার, ভগবানের নাম নিয়ে টানিস...

'নিজে কিন্তু কী ভাবতে লাগল। সারা পথ মুখ আর খুললে না। দেখি, আমার অংকটা যতই বিদঘুটে হোক, ভাবিয়ে তুলেছে ওকে! কেননা পরদিনই আস্তাবল থেকে ছুটি মিলল আমার, সোজা একেবারে বন্দী শিবিরে — আমার ওপর ভরসা রাখতে আর পারে নি। দেখো ভায়া, কী গোমুর্খামি ক'রে বসলাম...'

চুপ করলে বুড়ো, কেমন যেন দমে গিয়ে। আর ভলোদকা বেশ একচোট খিস্তি ক'রে ব্যঙ্গ ভরে বললে:

'তা ওঁদের মুখচন্দ্রটি মাঝে মাঝে বেশ ভালোমানুষের মতোই লাগে বটে, কিন্তু কামড়ে কম যায় না!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল ওরা। তারপর ভলোদকা শোনাল তার নিজের কাহিনী।

যে শিবিরটায় ও ছিল, সেখানে এক চর আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু নির্যাতন এড়িয়ে লোকটাকে কী ভাবে সাবাড় করা যায় তা কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না। ওদিকে ভলোদকার আর ধৈর্যে কুলাল না। ঝুলির মধ্যে ইঁট ভ'রে গুপ্তচরটাকে ধরে পায়খানার মধ্যে। 'হাগতে বসেছিস?' চিরাচরিত আলস্যের সুরে সে শুধায় শুয়োরমুখোটাকে, 'তা বস...'

এই ব'লে কাঁধের ঝুলিটা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারে।

খুনের সন্দেহে কিছু লোককে পাঠানো হয় জোন্দারব্লকগুলোতে। ভলোদকা আসে আমাদের 'উত্তুরে কানা গলিতে'।

সেভাস্তিয়ানিচের কাহিনীর পর এ গল্প শুনে মনে আমার তেমন কোনো ছাপ পড়ে নি। কিন্তু খোদ ভলোদকাকে আমার মনে থেকে গেছে সারা জীবন, যদিও আমাদের এখানে সে ছিল মাত্র আর এক সপ্তাহ।

দিনের শেষে সিনিয়র এস্কর্ট হেঙ্কে অগ্নিকুণ্ডটার কাছে জাঁ-কে গুলি ক'রে মারলে।

নিভন্ত কাঠগুলোর ওপরে কুঁজো হয়ে ঝুঁকেছিল ফরাসীটা, গুলি খাওয়ার পর নিশ্চল হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ঠিক একটা বালিশের মতো আলগোছে কাঠ কয়লার আঙ্গারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

শিবিরের নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটল ব'লে মনে হয় না। শুধু কাঠের বোঝাইয়ে এদিন সচরাচরের চেয়ে দেরি হল অনেক, গুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল, এবং তাড়াতাড়ি ক'রে আমাদের

শিবিরে ফিরিয়ে আনা হল একটু আগেই, অন্ধকার শুরু না হতেই।

জাঁ-কে চাপানো হল কাঠের বোঝার ওপর। শুয়ে রইল কালো বিকৃত মুখখানা আকাশের দিকে ক'রে। হিমে ধোঁয়া উঠছিল তার আধ পোড়া পোষাকটা থেকে।

জোভান্নি একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল।

সেভাস্তিয়ানিচ আমায় বললে, 'তুই আজ সামনে টানবি। ভগবানের দয়ায় এখনো তোর গতরটা যায় নি! ইতালিয়ানটাকে পাশে রাখিস, অন্তত ডাণ্ডাটা যেন ধ'রে থাকে।'

আমার স্লেজটা যাচ্ছিল দ্বিতীয়। সামনেই ভলোদকা দুলকি চালে চলেছে, প্রথম স্লেজটা সে লগি দিয়ে ঠেলছে।

আলগা বরফ ভেঙে কাঠ বোঝাই স্লেজটাকে চলতি পথে টেনে তোলাই সবচেয়ে কঠিন। পদদলিত দানা দানা তুষারের পিণ্ডের মধ্যে স্লেজের রানারটা একেবারে ডুবে গেছে, আর স্লেজের মণ পঁচিশেক বোঝার ওপরে আরো একটা মস্ত পোড়া কাঠের মতো ধূমায়মান একটা মানুষ।

গায়ের সমস্ত ভার দিয়ে ঝুঁকলাম সামনে, তারপর হ্যাঁচকা টানে বাঁয়ে, তারপর বাঁ পা দিয়ে ধাক্কা দিলাম উল্টো দিকে। টানে মস মস ক'রে উঠছে ডাণ্ডাটা। সামনে বেশ নিপুণ ভাবেই ভলোদকা লগি ঠেলছে। তবে আমার পেছনের লোকেরাও খারাপ নয়। কোনোক্রমে বোঝা পৌঁছল রাস্তায়।

সঙ্গে সঙ্গেই বেশ হালকা বোধ হল। কিন্তু এই শক্ত গাড়ি-চলা পথেই ভয় হল আমার। টের পেলাম বাঁয়ের ডাণ্ডাটা ধরে রাখা বেশ কঠিন। জোভান্নি তার দেহের পুরো ভরটা দিয়েছে আমার ওপর, ঝুলছে, পা প্রায় চালাচ্ছেই না। কিন্তু এভাবে গোটা পথটা পাড়ি দেওয়া আমার পক্ষেও অসম্ভব হবে। তার ওপর আবার ওয়াগনে কাঠ বোঝাই আছে।

'দূর শালা হতচ্ছাড়া!' মাথা না ফিরিয়েই রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠলাম আমি। ঘোড়ার সরু লাগামে ঘাড়ের ছাল উঠে যাচ্ছে। 'কোনো রকমে একটু ঢিল দে, শক্ত হয়ে থাক! নইলে পড়ে যাব যে, টেঁসে যাব। ট্র্যাকটর তো আর নই!'

স্বাধীন ভাবেই হাঁটবার চেষ্টা করল জোভান্নি, লাগামের ফাঁসটাকে ভালো ক'রে পরলে, কিন্তু একবার টান মেরেই ঝুলতে ঝুলতে চলল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে ঘোড়া জুতবার সময় জোয়াল পরানো হয়। শিবিরে এতদিন পর্যন্ত সে কথাটা কারো মনে পড়ে নি...

সামনের স্লেজটা এগুচ্ছে, মস মস করছে ভলোদকার হাই বুট। অসুস্থের মতো রগে এসে দপ দপ করছে রক্ত। 'পাঁচ ভার্স্ট, পাঁচ ভার্স্ট, পাঁচ ভার্স্ট!' টিপ টিপ করছে নাড়ি। মুক্তি পর্যন্ত টিপ টিপ ক'রে যেতে পারবে কি? আজকের শিফ্‌টা পর্যন্ত?

শ'খানেক পায়ের বেশি এগোই নি, জোভান্নি ফের আমায় ধ'রে ঝুলতে লাগল। পড়ে যাওয়া ওর চলবে না — সঙ্গে সঙ্গেই গুলি খাবে।

হতভাগা সেভাস্তিয়ানিচ! ওর জন্যেই এই মৃত্যুর জোয়াল কাঁধে নিতে হয়েছে! শেষ রক্ষার আশা নেই!

একটু জিরিয়ে নিলেও হত! কিন্তু আমাদের পেছনে আসছে আরো গোটা পঞ্চাশ স্লেজ।

কী করা যায়? কোথায় উধাও হল হারামজাদা সেভাস্তিয়ানিচ? ও তো আর স্লেজ টানছে না, একটু হাত লাগালেও পারত।

সরু লাগামে চামড়া আরো কেটে বসছে। সব শক্তি দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে জোভান্নি, কিন্তু পারছে না, তার সব ভারটাই বেশি ক'রে পড়ছে আমার ওপর। দুজনে একসঙ্গেই টলে পড়ব

এই বাঁকা জোয়ালটার সঙ্গে। কয়েক মিনিট পরেই থুবড়ে পড়ব দুজনাই।

ধাক্কা মারব ওকে? জোয়াল থেকে ছিটকে ফেলে দেব পথের ধারে? আমার জীবনটা তাতে বাঁচবে। আর ওকে ওই রাস্তাতেই গেঁথে দেবে বটে, তবে পরিণাম তো একই।

'শালা জোভান্নি!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠলাম আমি। ঘামে চোখ কড় কড় করছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে আমি ধাক্কা দেবার জন্যে তৈরি।

ডুবন্ত লোককে বাঁচাতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে আটকে পড়া আনাড়ী সাঁতারু সম্ভবত এই রকমই ভাবে।

কিন্তু বুড়ো! কী বুড়ো আমাদের!.. শালা শেষ পর্যন্ত এল যা হোক! মুমূর্ষু ইতালিয়ানটাকে সে এসে ধরলে তার বাঁ বগলের কাছে, কানে কানে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কী যেন বলতে লাগল, সমান হয়ে এল স্লেজের ডাণ্ডা দুটো। এখন একটু হাঁপ ছাড়া যায়, ডুবন্তের মাথার ওপর এক ছিটে আকাশের মতো মিনিট খানেক আগে যে জঘন্য চিন্তাটা মনে ঝলক দিয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে অভিশাপ দিই নিজেকে।

আমার পদপাত সমান হয়ে এল। কিন্তু যা ঘটল তার আর চারা নেই। লোকের সাহায্য পাওয়া মাত্র জোভান্নির যেটুকু ইচ্ছাশক্তি বাকি ছিল, হঠাৎ তা নিঃশেষ হয়ে গেল।

'কুয়োরে!' বুক চেপে ককিয়ে উঠে হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ল সে।

সেভাস্তিয়ানিচ ভয় পেয়ে আরো কিছুটা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, ছেঁচড়ে ঠেলতে লাগল রাস্তায়।

এক কদম, আরো এক কদম সামনে... এবার থামা দরকার, এখনো জিরিয়ে উঠতে পারবে মানুষ, এখনো যে বাঁচতে হবে মানুষকে!

ভলোদকা ফিরে তাকাল।

কিন্তু কী করতে পারে সে? কী করতে পারি আমি?

তুষারসঙ্কুল পথের ওপর থপ থপ করছে ভলোদকার কানা ওলটানো রুক্ষ হাই বুট। ডান বুটের ছেঁড়া টিকিটার কাছে মুহূর্তের জন্যে চোখে পড়ল তার ছুরির তামাটে বাঁটটা...

লগিটা ভলোদকা ছুঁড়ে দিলে বোঝার ওপর, তারপর হঠাৎ দুই লাফে এগিয়ে গেল, এগিয়ে গেল তার স্লেজের সামনে। দশ পা সামনেই এস্কর্ট। কী মতলব ওর, ওই ক্ষ্যাপাটার?!

বিশেষ কিছুই নয়। হঠাৎ রাস্তার ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে ব'সে পড়ল সে। ধীরেসুস্থে প্যাণ্টের পকেটে কী যেন হাতড়াতে লাগল।

'বিড়ি খেয়েই ব্যাপারটা সারা যাক, কী বলো ভাই?'

আমাদের দিকে চেয়ে আছে ভলোদকা, চোখ তার একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই শান্ত, কিন্তু দৃঢ়তা আর স্পর্ধায় তা এখন স্থির।

সারিটা থেমে গেল। পেছনে গুলি ছোড়ার শব্দ আসছে। গুলি ছুঁড়ছে ওপর দিকে, কারণ কী জানার জন্যে। সামনের এস্কর্টরা রাইফেল বাগিয়ে ধ'রে ছুটে এল ভলোদকার দিকে।

'আউফ্!'

লোকটা কিন্তু নিরুদ্বেগে সিগারেটের বিড়ি বানাচ্ছে। পকেট থেকে সযত্নে সে বার করছে মাখোরকার ছিটে-ফোঁটা আর নানা রকমের আবর্জনা। বোঝা যায়, পকেটে ওর তামাক নেই, তাহলেও বিড়ি বানিয়েই চলল সে।

'আউফস্টেইন!'

জার্মানগুলো কেন জানি গুলি করলে না ওকে। তার চকমকি, তার 'কাতিউশা' বার ক'রে ভলোদকা আগুন জ্বালাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠল, ধীরে ধীরে পোড়া গন্ধ ছাড়ল। ভলোদকা বসে বসে সিগারেট টানছে। হেঙ্কে এগিয়ে

এসে সঙীন খোঁচার ভয় দেখাল। কিন্তু মাটির ওপর থেবড়ে বসে থাকা একটা লোক দেখে তার কুকুরটা কেন জানি ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মনে হয় এস্কর্টের মধ্যেও তেমন একটা ভয় না ছিল নয়।

নিচু থেকে ওপর দিকে হেঙ্কের চোখে চোখে গোমড়ার মতো তাকালে ভলোদকা:

'শালা, তোর মাকে...'

জার্মানরা কিন্তু গুলি করলে না।

সেভাস্তিয়ানিচ তাড়াতাড়ি ক'রে জোভান্নির জোয়াল খসিয়ে তাকে স্লেজের পাশে দাঁড় করালে, 'কাঠটা ধ'রে থাকিস!' নিজে ফাঁসটা তুলে নিলে। কষ্টে নিঃশ্বাস পড়ছে জোভান্নির, বুকটা ধ'রে আছে সে, নোংরা বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল ঝরছে তার চোখ দিয়ে। সে জল সে মুছেও নিচ্ছে না, কেঁপে কেঁপে উঠছে চাপা ফোঁপানিতে।

শুধু কাগজের ধোঁয়া টানছে ভলোদকা, একই ভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এস্কর্টের দিকে।

'ষ্টেইন আউফ্, কানালেন!'

'ধুর শালা পোড়ার মুখো, শোল মাছ কোথাকার!' সরোষে চ্যাঁচালে ভলোদকা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত গলায় বিড়বিড় করলে, 'নাও, খানিক কথা-বার্তা হল, এবার যাওয়া যাক...'

এই পাঁচ মিনিটেই ভলোদকা ভয়ানক কাহিল হয়ে উঠেছিল। সেটা আমি টের পাচ্ছিলাম ওর জড়িয়ে আসা পা, নোয়ানো মাথা আর কুঁজো কাঁধ দেখে।

মাল বোঝাই দেবার পর ব্যারাকে আমরা ফিরলাম একেবারে অবসন্নের মতো। লোকের আর শক্তি নেই, অথচ খাবার গেলার জন্যে এখনো এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে রান্নাঘরে।

মাচার ওপর শুয়ে ছিলাম আমি। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে প্রতিবেশীর দিকে ফিরলাম:

'কী ক'রে ভায়া এত জোর পেলি বল তো? ঝাড়ফুঁক জানিস নাকি? নাকি ধড়ে তোর দুটো মাথা?'

'শালারা কিন্তু মারলে না!' তীব্র জ্বালায় ফিসফিস করলে ভলোদকা, 'তোরা এই শালার জার্মান চিজগুলোকে কিছুই বুঝিস নি। ওরা যে জানে এক হপ্তা পরে আমায় গুলি করে মারা হবে। কানুন মতো। তাই আমি এখন যাই করি, কিছুতেই আমায় মারবে না। এখনো এক হপ্তা আমার মজুদ আছে, বুঝলি?'

কর্তা এল তল্লাসী দল নিয়ে, ভলোদকার 'কাতিউশাটিকে' তারা নিয়ে গেল।

তল্লাসীর পর উধাও হয়ে গেল ভলোদকা।

ফিরল বেশ দেরি ক'রে। এবার কিন্তু ও গোপনে পাঁউরুটি এনেছিল আধখানা। কিন্তু খেলে না। মাচায় বসে ছোটো ছোটো টুকরোয় রুটিটা কেটে পোষাকের এখানে ওখানে লুকিয়ে রাখল।

মনে হয় ওর এই অদ্ভুত আয়োজনটা শুধু আমিই দেখেছিলাম। এবং এবারে ক্ষুধা সহ্য করতে আমার অসুবিধা হল না। ওর ওপর রাগ করার কোনো কারণই ছিল না আমার।

পালাবার মতো শক্তি ওর এখনো আছে। সুইডিশ সীমান্ত পর্যন্ত সম্ভবত পাড়ি দিতে ও পারবে। রুটি তাই ওর দরকার, আমার নয়...

আচমকা বদলে গেল আবহাওয়া।

প্রচণ্ড শীত পড়ল, এক রাতের মধ্যেই সবকিছু ডুবে গেল একটা বাষ্পের শাদা দুধে। ঠাণ্ডায় কট কট ক'রে উঠছিল বুড়ো পাইনগুলো, খোলা ঝিলগুলোর বরফ ফেটে ফেটে গেল।

ব্লকের শীতে জমা দুয়োরগুলোর ওপর ফুটে উঠল ঝিনুকের মতো শাদা-চিকচিকে তুষার নকশা।

চারিপাশের একশ ভার্স্টের মধ্যে জীবন্ত কোনো কিছুর চিহ্ন রইল না।

অথচ আমাদের পাঠানো হল কাজে। মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে পৃথিবী।

মাচার ওপর কম্বল তোয়ালে যা কিছু ছিল সবই আমরা গায়ে জড়িয়েছি, যত ন্যাতাকানি পেয়েছি, পায়ে বেঁধেছি। দেখাচ্ছে প্রেতের মতো।

ব্যারাক থেকে শাদা কুজ্ঝটির মধ্যে বেরুতেই মনে হল যেন জুতোর মধ্যে, আস্তিনের মধ্যে, বুকের মধ্যে বরফ জল ঢালা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে অসাড় হয়ে এল মুখ, সূতি কাপড়ের দস্তানার মধ্যে হাত দুটো হয়ে উঠল গাছের ছালের মতো, তারপর কাঠের মতো, তারপর একেবারে পাথর।

বিশীর্ণ, নীল হয়ে আসা লোকগুলো দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ছুটে চলল কাজে — না ছুটলে ওই পথেই জমে যেতে হবে। নিঃশ্বাস থেকে প্রতিটি মাথার চারপাশে কুয়াশার মধ্যে গড়ে উঠছে একটা গোলাপী জ্যোতির্মণ্ডল: শহীদ আর পুণ্যবানদের দেহ ছেড়ে যেন বিদায় নিচ্ছে আত্মা।

শব্দগুলো অদ্ভুত রকমের তীক্ষ্ম। হাত থেকে কার যেন স্লেজের ডাণ্ডাটা পড়ে গিয়েছিল। শব্দ উঠল ঠিক যেন বরফের ওপর কুঁদোর বাড়ি পড়েছে।

মাঝে মাঝে অল্প একটু ক'রে জিরিয়ে পাঁচ কিলোমিটার অসমান দৌড়ের পর আমাদের শেষ শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নেওয়া উচিত কেবল নাক দিয়ে, নইলে ফুসফুসের নিউমোনিয়া অনিবার্য — তার মানেই কবর নেওয়া।

ওদিকে নাক একেবারে বরফ হয়ে উঠেছে, না কামানো মুখগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠছে মৃতের পাণ্ডুরতায়।

আমাদের পাহারা দিচ্ছে দুজন এস্কর্ট। খোদ হেঙ্কে আজ নেই। তার মানে দুপুরে ওরা ছাড়া পাবে, তার জায়গায় অন্য দুজন আসবে। কিন্তু এ নরক থেকে আমাদের ছাড়া দেবে কে?

কাজের জায়গাটায় গোমড়া একটা স্তব্ধতা। তারপর স্লেজের ডাণ্ডাগুলো পড়তে লাগল দামামার শব্দ তুলে। তাড়াতাড়ি ক'রে জোয়াল নামিয়ে জমে যাওয়া হাত মুখ ঘসতে লাগল লোকে।

কিন্তু এই ঠাণ্ডায় বরফ ভাঙা যাবে কী ক'রে, পাথর হয়ে যাওয়া হাতগুলোয় কুড়ুল আর করাতই বা তোলা যাবে কী ভাবে?

আগুন পোয়াতে হবে!

'ফয়ের!' চ্যাঁচাল তরুণ একজন জার্মান, সাময়িক ভাবে আজ সে এস্কর্টের কর্তা।

ওদের তত কষ্ট নেই। আসবার আগে নিশ্চয়ই শ্ন্যাপ্‌স টেনে এসেছে ওরা। চর্বির টুকরোয় জলযোগও হয়েছে। তাহলেও গরম দরকার ওদেরই আগে।

উঁচু যে গুঁড়িটার ওপর হেঙ্কে সাধারণত তার লাইটার রাখত, অভ্যেস মতো সেই দিকেই এগুল সেভাস্তিয়ানিচ, কিন্তু হালকা হিমের গুড়োয় আচ্ছন্ন গুঁড়িটা আজ একেবারে পরিষ্কার, কিছুই নেই সেখানে।

'ফয়ের! ফয়ের!' এবার এস্কর্টের উদ্দেশে চেঁচাবার পালা সেভাস্তিয়ানিচের।

ভলোদকা এ সময় পুরনো অগ্নিকুণ্ডটার কাছে হাজির হয়েছে, মাটিটা এখানে নগ্ন, বরফে ঢাকা নয়, পুরনো অঙ্গার

আর কাঠকয়লাগুলোকে সে ঠিক ক'রে সাজাচ্ছিল, যাতে একটা ফুলকিতেই তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলে ওঠে।

'শালার দেরি হচ্ছে কেন হে!' তোয়ালে বাঁধা মাথাটা সে তুললে, 'কই, আগুন দাও!'

জার্মানটা দোষীর মতো পকেট চাপড়ালে; সিগারেট লাইটার নেই ওর কাছে, সিগারেট খায় না, স্বাস্থ্য রক্ষা করছে।

প্লটটার অপর প্রান্তে গেল সেভাস্তিয়ানিচ। কিন্তু এ এস্কর্টটিও সাহায্যে অক্ষম, যদিও শীতে জড়সড় হয়ে মাথা গুটিয়ে রেখেছে ঘাড়ের মধ্যে। রাইফেল ধ'রে আছে কনুইয়ের কাছে, হাত একেবারে অবশ। যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে, সবাই স্বাস্থ্য রক্ষা করতে ব্যস্ত।

'কুত্তার দল সব!' নিষ্ঠুর মুখখিস্তি শুরু করল ভলোদকা, 'ওহে, তা 'কাতিউশা'ই নয় দাও একটা, এক্ষুণি আগুন জ্বালিয়ে দেব!'

ভয়ংকর ব্যাপার। ভাগ্যের এ এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপ। দেখা গেল যারা ধূমপান করে তাদের সকলেরই চকমকি নিয়ে গেছে রাত্রে।

কী ঘটেছে সেটা তখনো অনেকের মাথায় ঢোকে নি। কিন্তু জোভান্নি দুই হাতে মাথা চেপে ধ'রে মাটির ওপর ব'সে পড়ল, শান্ত হয়ে এল। সকলের চোখের সামনেই ও 'পটল তুলছে', কিন্তু সাহায্য করার উপায় নেই কারো। দরকার তাপ, যেটা লোকেদের কারো কাছে নেই।

না, শীত নয়, সত্যিকারের বিহ্বলতায় আড়ষ্ট হয়ে গেলাম আমি। দেখছি কী ভাবে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, মুখগুলো তীক্ষ্ন হয়ে উঠছে, এগিয়ে পড়ছে গতি, চোখের দৃষ্টি। আর সকলের ওপর সোচ্চার হয়ে উঠছে ভলোদকার ভয়ংকর গালাগালি।

'শালার ব্যাটা শালা! হারামজাদা, জানোয়ার! সব গুটিয়ে বাটিয়ে নিয়ে গেছে। বিড়ি খাবারও উপায় নেই! ইস কী হাঁদা মাথা!'

নিজের মাথা কুটতে লাগল ভলোদকা।

আমাদের কাজ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সে অধিকার জার্মানটার নেই।

এই শেষ!

সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ যদি টিকেও থাকে, তাহলেও একেবারে হিমে জমে যাবে সে। কপালে তার ক্রিমেটোরিয়াম নয়ত এই নরওয়ের কবর। পরস্পর গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে এল লোকে, লক্ষ্যহীনের মতো ছটফট করছে একই জায়গায়, অজানা কী একটার প্রতীক্ষা করছে। কালচে ভিড়টার ওপর ভাপ ভেসে আছে। আমার মনে হল সে ভাপ যেন ক্রমাগত গলে যাচ্ছে, স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। নিঃসৃত হয়ে যাচ্ছে তাপ। সেটায় আর এক ঘণ্টা কুলোবে, দুই ঘণ্টা, তার বেশি নয়।

কেউ কেউ জোভান্নির অনুসরণে যন্ত্রের মতো উবু হয়ে ব'সে ঘাড় গুঁজলে হাঁটুর মধ্যে।

'এ যে হতে পারে না!' ভেতরটা চিৎকার করছে, কিন্তু জানি না কী করা দরকার। অজান্তে আমিও ভিড়ের মাঝখানের দিকে ঘেঁসে আসছি, বাতুলের মতো ভাবছি বোধ হয় ওখানে কিছুটা বেশি গরম। মাঝখানটার জন্যে একটা নীরব লড়াই চলেছে, কাঁধ দিয়ে ঠেলছে লোকে, চাপ দিচ্ছে পরস্পরকে।

লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে আমি এস্কর্টগুলোর দিকে চেয়ে দেখলাম। ঠিক যেন সব টিনের সেপাই, ঠাণ্ডা অগ্নিকুণ্ডটার পাশে ঘাড় কুঁকড়ে লাফাচ্ছে তারা। না, আমাদের কাজ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো উদ্যোগই ওদের নেই।

শক্ত একটা হাত আমার কনুই চেপে ধ'রে ভিড় থেকে সরিয়ে আনল। লোকটা ভলোদকা। আমার দিকে না তাকিয়ে ও স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল হিমে আড়ষ্ট এস্কর্টদের দিকে।

'কেটে পড়বি?' সশঙ্কে ফিসফিস করল ভলোদকার ঠোঁট দুটো।

আমার আত্মাটা পর্যন্ত জমে যাচ্ছিল।

'আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এ ব্যাটাদেরও হয়ে আসবে,' প্রায় অলক্ষ্যে মাথা নেড়ে জার্মান দুটোর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে ভলোদকা, 'কেটে পড়া যাক, কী বলিস? এমনিতেও তো টেঁসে যেতে হবে!'

প্রায় বরফ হয়ে ওঠা চোখের পাতা নিচু করলাম আমি, নিজের কাঠের জুতো জোড়ার দিকে তাকালাম। পায়ে আর ঠাণ্ডার কোনো সাড় নেই! যাবার কোনো উপায় নেই আমার। ভলোদকার দিকে তাকালাম ঈর্ষায় নয়, সভয়ে।

কাছেই উবু হয়ে কুঁজো হয়ে বসে আছে জোভান্নি। একেবারে নিশ্চল। কয়েক মুহূর্ত আমরা দুজনেই চেয়ে দেখলাম ওর দিকে। ভলোদকা আমার কনুইটা ছেড়ে দিলে।

'ওর জোর বেশি,' মাথার ভেতরে আমার উদাসীন জ্বালাহীন একটা আক্ষেপ বাজতে লাগল, 'ও পালাতে পারে। আমার উপায় নেই।'

ফের ভিড়ের দিকে ঘেঁসে এলাম আমি, অনীহায় গা ছেড়ে দিচ্ছি।

নিজের জীবনটা বাঁচাবার জন্যে কেনই বা অত চেষ্টা করেছিলাম আগে? এমনি বোকার মতোই যদি টেঁসে যেতে হয় তাহলে বেলায়া গ্লিনা-র কাছে ভয়ানক জখম হয়ে কেনই বা তখন দাঁত দিয়ে নিজের কুর্তা ছিঁড়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা

করেছিলাম? স্ট্রেচ বাহকদের বদলে যখন ফ্যাশিস্টরা এসে হাজির হয় আমার কাছে, তখন শেষ গুলিটা কেন নিজের বুকেই চালাই নি?

কেন?

কিন্তু এখনো তো আমি এস্কর্টটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, এতটুকু দ্বিধা না ক'রে ও আমায় গুলি করবে। কেন ঝাঁপিয়ে পড়ছি না, শুধু ভিড়ের মাঝখানটার দিকে সেঁধোচ্ছি।

নিজের পা আমি আর টের পাচ্ছি না, শুধু তির তির ক'রে পায়ের ডিমটা কাঁপছে কুকুরের মতো। মনে হল যেন মতিভ্রম আমার কানে আশ্রয় করেছে...

শুনছি যেন একেবারে কাছেই কে যেন গাছ কাটছে। কুড়ুলের প্রচণ্ড ঘায়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল ফার গাছের গুঁড়ি। হ্যাঁ, এমন শুকনো ঝঙকার তুলে ভেঙে পড়ে শুধু ফার। সুরেলা ফার...

কিন্তু শ্রুতিভ্রমটা সবাইকেই আচ্ছন্ন করেছিল। গোটা ভিড়টা এক সঙ্গেই কেবল একই দিকে মুখ ফেরালে। কালো অগ্নিকুণ্ডটার কাছে বেপরোয়া ঘায়ে কেটে ফেলা গুঁড়ির কাছে কুড়ুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভলোদকা।

তার মানে ও তাহলে শেষ পর্যন্ত পালাল না? থেকে গেল?

আমাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ও কেন জানি গলায় জড়ানো নোংরা তোয়ালেটা নীরবে খুলে মাথার টুপিটা ছুঁড়ে ফেললে মাটিতে।

পদদলিত জমাট বাঁধা বরফের ওপর কুড়ুলের নিখুঁত নিপুণ তিনটি আঘাতে লম্বাটে একটা খাতের মতো বানাল সে। তারপর লাথি মেরে আধখানা কুঁদোকে চিত ক'রে বসিয়ে দিলে সেখানে।

কিছুই বুঝে পেলাম না আমি, ধারণাই করতে পারলাম না কী ভাবে পাথর হয়ে আসা আঙুলে ও বরফ হয়ে যাওয়া কুড়ুলটাকে আদৌ চেপে ধরতে পারল।

গায়ের বালাপোষের কুর্তাটা খুলে ফেললে ভলোদকা, কুড়ুলের ডগা দিয়ে ফেড়ে ফেললে ভেতরের আস্তর। তারপর দস্তানা ছুঁড়ে ফেলে — এ যে একেবারে অসম্ভব কাণ্ড! — টেনে বার করলে মস্ত এক থাবা তুলো।

তুলোর প্যাঁজাটা তার প্যাঁচালো আঙুলে পরিণত হল একটা মোটা পিণ্ডে।

মনে হল শীত যেন আরো জেঁকে বসছে।

আমাদের দিকে না তাকিয়ে ভলোদকা তাড়াতাড়ি ফের দস্তানাটা পরলে, কুঁদোটার কাছে এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় কাঠটা চেপে ধরল। তুলোর পিণ্ডটা রইল দুই কাঠের মাঝখানে।

কাঁধের গোলালো পেশীর প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের কুঁদোটাকে ঘসতে লাগল সে। খেপার মতো কাঠ দিয়ে তুলোটা ডলতে লাগল সে, ডলা খেয়ে খেয়ে তা পাকিয়ে উঠছে সরু সলতেয়, অবিরাম কাঠ ঘ'সে চলেছে ও। ছোটো ছোটো ক'রে ছাঁটা ভলোদকার চুলগুলো মনে হল যেন খাড়া হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড মুখখিস্তি ক'রে চলেছে ও, আর ঘ'সে চলছে, কেবলি ঘ'সে চলছে...

না, নেকড়ের মতো কিছুই নেই ওর মধ্যে। এই মুহূর্তে কাঠগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে বসা ওর মূর্তিটাকে দেখে মনে হয় যেন এক বাজ পাখি, কোথা থেকে যেন উড়ে এসে পড়েছে, নিষ্ঠুরের মতো ছিঁড়ে খাচ্ছে তার শিকার।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ফল নেই। আছে শুধু দুখণ্ড কাঠ, তুলোর সলতে আর গালাগালির স্রোত।

আদিম মানুষ আগুন আহরণের আশায় ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা ক'রে নিশ্চয় এ মন্ত্র উচ্চারণ করে নি।

সত্যি, শূন্যের নিচে চল্লিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে কি আর ওই ভাবে আগুন জ্বলে?

তির তির করছে খোঁচা খোঁচা মাথা, শব্দ উঠছে কাঠ দুটোয়, ঝলক দিচ্ছে ভলোদকার বাহু।

স্তব্ধতা ছিন্ন হয়ে গেল আশার একটা চিৎকারে:

'হয়েছে! হয়েছে!'

যেন সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম মেনে ভলোদকা ওপরকার কাঠটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাঝখানকার কালচে হয়ে আসা তুলোটা তুলে নিলে।

পোড়া গন্ধটা আরো ঝাঁঝালো হয়ে উঠল। কিন্তু আগুন নেই। তুলোর পিষ্ট প্রান্তটা শুধু অল্প একটু কালো হয়ে আছে।

লালচে মুখটা ফেরাল ভলোদকা, চোখে তার ক্ষিপ্ত একটা ক্রোধ। এই মুহূর্তে মানুষ খুন ক'রে বসতে পারে ও।

'চ্যাঁচাল কে?' বুকের মধ্য থেকে হাঁপ ধরা উন্মাদ একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল।

কেউ উত্তর দিলে না।

উন্মাদ চোখ দিয়ে প্রতিটি লোককে, প্রতিটি মুখকে নজর ক'রে দেখল সে!

তারপর নীরবে উবু হয়ে ব'সে ফের নতুন ক'রে তুলো ডলতে লাগল। ফের দস্তানা খুলে ফেলল সে। সলতের দুপাশের পোড়া তুলোটা পাকিয়ে দিলে মাঝখানটায়।

চারিপাশে তার গড়ে উঠল কালো একটা দেয়াল। সামনের লোকেরা ঝুঁকে আছে ভলোদকার দিকে, লুব্ধের মতো তাকিয়ে দেখছে তার দুরন্ত দেহভঙ্গি। শঙ্কিতের মতো জার্মান দুটো দাঁড়িয়ে আছে দূরে।

এবার ভলোদকা কাঠ ঘসতে লাগল খালি হাতে।

ঘসে চলেছে অবিরাম, দেখতে পাচ্ছি কী রকম নীল হয়ে উঠেছে ওর নখ আর আঙুলের ডগা। কপালে ঘাম দেখা দিল, নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু কাঁপছে।

হঠাৎ মিট মিট ক'রে উঠল ধিকিধিকি জ্বলা শলতের দুই প্রান্ত। ভলোদকা উঠল না। ক্লান্ত হাতে একটি শলতে এগিয়ে দিল আমার দিকে।

ক্ষেপার মতো আর্তনাদ ক'রে টেনে নিলাম সেটা, ফুঁ দিতে লাগলাম। শলতেটা পুড়ছে, আগুন জ্বলছে, চোখে মুখে আমার ঝাপট মারছে ঝাঁঝালো ধোঁয়া, ফুলকি-তোলা তপ্ত এই অলৌকিককে ফুঁ দিয়েই চলেছি আমি।

দ্বিতীয় প্রান্তটা দিয়ে সেভাস্তিয়ানিচ ইতিমধ্যেই একটা পুরনো অঙ্গার জ্বালিয়ে তুলেছে, সন্তর্পণে তার ওপর বার্চ গাছের কোঁকড়া ছালগুলো গুঁজছে কুঁজো হয়ে।

শত কণ্ঠে একটা উন্মাদ চিৎকার উঠল বনে।

বার্চের ছালগুলো জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ ক'রে!

নিজের তৈরি অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়ে আছে ভলোদকা, পীড়িতের মতো মুখ কোঁচকাচ্ছে, শীতে জমা আঙুলগুলোয় বরফ ঘসছে।

পাশেই ছলছল চোখে বসে আছে জোভান্নি, নিঃশ্বাসও যেন পড়ছে না। এখনো বাঁচবে সে, কেননা তাপ এসেছে এই দুর্ভাগা দেশে ...

প্রচণ্ড শব্দে আগুন ধরছে কাঠগুলোয়। বড়ো বড়ো লাল অঙ্গার ঝরে পড়ছে ফুসন্ত, ফুটন্ত, ছুটন্ত শিখার মধ্যে। গোটা চিতাটায় যেন শুরু হয়েছে একটা আগুনের ঝড়, বিপুল বিপুল লেলিহান ডানা মেলে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

...শিফ্‌ট শেষ হতে আরো ঘণ্টা দুই বাকি ছিল, এমন সময় কুকুর সমেত হাজির হল এক জার্মান। কুকুরটা মালিকের গা ঘেঁসে এসেছে, পালা ক'রে ক্রমাগত সামনের থাবা দুটো তুলছে, তাকাচ্ছে মনিবের মুখের দিকে। এত শীত সইতে পারছিল না কুকুরটা।

জার্মানটা এস্কর্টের সঙ্গে কী কথা বললে, তারপর অগ্নিকুণ্ডটার কাছে এল:

'ইভানফ্‌ কে আছে এখানে?'

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, নতুন ক'রে যেন পরিচয় হচ্ছে আমাদের। ইভানভ আমাদের মধ্যে কেউ নেই।

'ইভানফ্‌ কে?'

কালো একটা ঝোপের পেছন থেকে বেরিয়ে এল ভলোদকা:

'আমি ইভানভ।'

বুকের ওপর তার ৩১৯ নং মার্কাটায় চোখ বুলাল এস্কর্ট।

'কোম্‌! সামনে চলো!'

কুকুরটা টান দিচ্ছিল চেনে। স্থির দৃষ্টিতে ভলোদকা তাকিয়ে দেখল প্লটটার দিকে, সেভাস্তিয়ানিচ আর আমার দিকে বিদায়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লে, তারপর ঘাড় গুঁজে এগিয়ে গেল পথে।

ভলোদকাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমরা জানতাম।

ঝড়ে ভাঙা গাছপালার পেছনে তার মাথার জার্মান টুপিটা যখন শেষ বারের মতো ঝলক দিলে, তখন কাঁপা কাঁপা হাতে জোভান্নি তার ঘাড়ের ন্যাতাটাকে একেবারে গলার কাছে গুটিয়ে ইতালীয় উচ্চারণে বললে:

'প্রমেতেও...'

বুড়ো ফেদোসভ আমার আস্তিন টেনে ইতালিয়ানটার দিকে ইশারা করলে:

'কী বলছে ও?'

জোভান্নি স্থির দৃষ্টিতে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে ছিল প্লটের প্রান্তটায় যেখানে রাইফেল হাতে আমাদের পাহারা দিচ্ছিল হেঙ্কে, তারপর দৃষ্টি ফেরাল ভলোদকার অনাথ অগ্নিকুণ্ডটার দিকে।

'প্রমেতেও...' চেঁচিয়ে পুনরুক্তি করলে সে, তারপর যেন মনের সমস্ত ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ ক'রে এগিয়ে গেল দুর্বার হাতছানি দেওয়া আগুনটার দিকে...

নিকোলাই চুকোভস্কি

প্রাণ-বালিকা

১

এখনো ভালোই বোধ করছি আমি, শুধু চোখে মাঝে মাঝে কেমন ধাঁধা লাগে। আগুনের প্রকাণ্ড একটা দাঁতালো চাকা দেখি, লালচে-হলুদ জ্যামিতিক কয়েকটা ছবি, সেগুলো পাক খায়, কাঁপে, দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তারপর ফিকে হয়ে যায় চাকাটা, জ্যামিতিক ছবিগুলো ঝাপসা হয়ে আসে, ফের আগের মতোই দৃষ্টি ফিরে আসে। আরেকটা লক্ষণও ছিল: চেতনা লোপ। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পাই হয়ত সিঁড়ির চাতালে, কিছুতেই মনে পড়ে না কেমন ক'রে ওখানে এলাম, কোথায় যাচ্ছি। কেউ কেউ ভাবে খিদে জিনিসটা বুঝি কেবলি খাই-খাই ইচ্ছে। কিন্তু আসলে তা ঘটে কেবল প্রথম দিকটায়, পরে থাকে কেবল পেটের ভেতরে একটানা, কুরে কুরে খাওয়া একটা শূন্যতার অনুভূতি। ভেতরকার এই শূন্যতা বোধটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু এই সব চাকা আর ক্ষণিক মূর্ছার কথাটা ওদের জানতে দেওয়া চলবে না।

শেলটারেও আমি গেলাম শুধু ওদেরই কথা ভেবে। আমি নিজে না গেলে ওদের কাউকেও নড়ানো যেত না। ওরা ভাবত, বোমা যদি পড়ে তা ঘরের ছাদেই থাকি, কি ভেতরেই থাকি কি তলে আশ্রয় নিই, সবই সমান কথা। আমিও তাই ভাবতাম। কিন্তু সাইরেন বাজলে শেলটারে না যাওয়া মানে নিয়ম ভাঙা। বেনিয়ম হতে দেওয়া আমার চলে না।

শেলটারটা গরম, স্যাঁৎসেঁতে। আজ দুই দিন হল ইলেকট্রিসিটি বন্ধ। তলকুঠরিটা বিনা চিমনির হলদে কেরোসিন

আলোয় উদ্ভাসিত। মুখের ওপর ধীরে ধীরে বাতির কালি জমছে, প্রতিটি চোখে আলোর হলদে প্রতিফলন। কোথাও বোমা পড়লে বাতিতে এবং চোখে সে শিখাটা চমকে ওঠে। টিনের রেডিও-ডিস্কটায় টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে, তার মানে, বিপদ সঙ্কেত এখনো চলছে। আঙ্গেলিনা ইভানোভনা না থাকলে আমি ওই টিক টিক শুনতে শুনতেই স্যাঁৎসেঁতে পেছল মাচার ওপর ঘুমিয়েই পড়তাম। অবিরাম কেবল একটা কথাই বলে চলেছেন ইনি: কত রোগা হয়ে গেছেন। সত্যিই, দু' মাস আগে যখন ওঁকে এই তলকুঠরিতে প্রথম দেখি, তখন তিনি রীতিমতো পুরুষ্টু, শণচুলো মহিলা, আর এখন মনে হয় যেন দেহটা তাঁর খালি বস্তা দিয়ে তৈরি। কেবলি তিনি বলছিলেন যে তাঁর সবই ঝরে পড়ছে, পেড়াপীড়ির ফলে তাঁর গা টিপে দেখতে হচ্ছিল মেয়েদের। বলছিলেন, শীগগিরই মরবেন, কপালের ওপর শণরঙের কুণ্ডলীগুলো কাঁপছিল।

তারপর শোনাতে লাগলেন কী ভাবে আমাদের বাড়ির ঝাড়ুদার মারা গেছে। ঘটনাটা সবাই জানে, আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি, গৃহব্যবস্থাপনার দপ্তরে কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে আছে সে, মরা। একেবারে নতুন, বড়ো বড়ো পশমের হাই বুট পরা পা দুটো তার লোহার একটা উনুনের দিকে বাড়ানো। আগের রাতে সে এখানে এসেছিল আগুন পোয়াতে। ঘুমিয়ে পড়ে, সে ঘুম আর ভাঙে নি।

শেলটারে জন পঞ্চাশেক লোক, আর এক আঙ্গেলিনা ইভানোভনা ছাড়া সবাই চুপ ক'রে আছে। তাঁর হড়বড় ক'রে বলা কাঁদুনী শুনতে সকলেরই অসহ্য লাগছিল, কিন্তু আমার মতোই সকলেই নিরুপায়। অপেক্ষা করছিলাম কখন উনি ক্লান্ত হয়ে অন্তত মিনিট খানেকের জন্যেও থামবেন। এবং সে মিনিট

যখন এল, আঙ্গেলিনা ইভানোভনা থামলেন, তখন একটা অল্প বয়সী মেয়ের ঝঙ্কৃত গলা শোনা গেল।

'বোমা ফেলছে এখানে তো নয়, নেভার ওপারে। কী হবে ব'সে থেকে, চলো ছাতে যাই!'

চোখ তুলে দেখলাম বন্ধ লোহার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে পশমের শাদা রুমাল বাঁধা একটি মেয়ে। সত্যি বলতে আমি শুধু অন্ধকারে তার রুমালের ধবধবানিটুকুই দেখেছিলাম। কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট। লাফিয়ে উঠলাম আমি।

২

চেতনা আমার মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে যেত ব'লে আমার দিন কাটত একেবারেই ছেঁড়া ছেঁড়া একটা দুনিয়ায়, তার মধ্যে আগাগোড়া কোনো সংযোগ ছিল না। আর সে দুনিয়ায় ভয়ানক শাদা রোঁয়া-রোঁয়া রুমাল বাঁধা এই মেয়েটির উদয় হয়েছে বেশ কয়েক দিন। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার কেবলি আধো-অন্ধকারে, এবং সর্বদাই অকস্মাৎ। হঠাৎ আঙিনায় বা সিঁড়িতে আমায় পেছনে ফেলে এগিয়ে যেত সে, দেখতাম কেবল মাথা আর কাঁধ ঢাকা রুমালটা, অন্ধকারের মধ্যে লঘুছন্দে যেন ভেসে যেত তা। প্রত্যেক বারই ইচ্ছে হত এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গ ধরি, মুখখানা একবার দেখি, কিন্তু ভাবতে না ভাবতেই রুমাল হঠাৎ কোনো একটা বাঁকে অদৃশ্য হত, নয়ত স্রেফ মিলিয়ে যেত আঁধারে। এখন শেলটারে ওকে দেখে আমি লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু ততক্ষণে দুয়োরের মধ্যে দিয়ে গলে গেছে সে।

ব্যস্ত হয়ে একবার তাকিয়ে দেখলাম। কম্পোজিটর সুমারোকভ মাচার ওপর ঘুমুচ্ছে, পরনে নাবিকের প্যাণ্ট, পা

দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে। একটা পা ওর খোঁড়া, হাঁটু মোড়ে না। ছাপাখানার মেসিন চালায় স্ভেৎকভ। সেও ঘুমুচ্ছে। শেলটার থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

পেছনে লোহার দরজা বন্ধ হতে না হতেই কানে এল এণ্টি এয়ারক্র্যাফট কামানের তুমুল আওয়াজ। আঙিনাকে ঘিরে আছে কালো কালো জানলাওয়ালা চারটে ছয়তলা দেয়াল। জায়গাটা অন্ধকার, শুধু অনেক উঁচুতে গোলার দপদপে আভায় আলো হয়ে উঠছে চৌকো এক টুকরো আকাশ। অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে চোখ সইয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম কোথায় গেছে মেয়েটি। আঙিনা থেকে সিঁড়ির দরজা আছে বেশ কয়েকটা... কোনোক্রমে নজরে পড়ল কোন দরজাটার কাছে শাদা রুমাল ঝলক দিয়েই অদৃশ্য হল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ছুটছিলাম আমরা, মেয়েটি আমার চেয়ে বেশ এক ছুট আগে। বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজের মধ্য দিয়ে কানে আসছিল সিঁড়িতে মেয়েটির জুতোর হিলের শব্দ। রুমালটা ওর চোখে পড়ল মুহূর্তের জন্যে, সিঁড়ির বাঁকে। চাতালের কাছে জানলাটা ঝলসে উঠল বিস্ফোরণের আলোয়, আর সে আগুনের পটে ফুটে উঠল ওর কালো শীর্ণ সিল্যুয়েটটা। আজকেও দিনের বেলাতেই আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছিল, কোনোক্রমে কয়েক ধাপ উঠতে পারতাম আমি। কিন্তু এখন ওর পাল্লা ধরবার জন্যে এক এক ধাপ টপকেই উঠতে লাগলাম, কিন্তু কোনোই অসুবিধা বোধ করলাম না। কেমন হালকা লাগছিল নিজেকে, যেন দেহটা নেই। এত জোরে ছুটছিলাম যে তিন কি চার তলায় ওকে ধ'রে ফেললাম।

ছুটতে ছুটতেই ও বললে, 'আমি জানি কে আপনি, আপনি সম্পাদক।'

বললাম, 'ঠিক কথা, আমি সম্পাদক, কিন্তু আপনি কে?'

'নেহাৎ একটা মেয়ে।'

ওর গলা শুনে, গতির ছেলেমানুষী লঘুতায় আমি নিজেও টের পেলাম বয়স ওর বছর পনেরোর বেশি নয়।

'নাম কী?'

'আলেক্সান্দ্রা।'

'তার মানে ডাক নাম সাশা?'

'উহুঁ, আস্যা।'

'কী চমৎকার!'

'চমৎকার কিসে?'

'আস্যা ডাক নামটি চমৎকার!'

চুপ ক'রে রইল ও, সিঁড়ি ভাঙা কিন্তু থামল না। আরো এক পশলা সিঁড়ি সামনে। মুখ ফিরিয়ে ও জিজ্ঞেস করলে:

'আপনাদের ওখানে ওই নাবিকের প্যাণ্ট পরা খোঁড়া ছেলেটা কাজ করে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, ওর উপাধি সুমারোকভ। অবস্থা ওর খুব খারাপ।'

'খারাপ?'

'হ্যাঁ, শীগগিরই মারা যাবে।'

মেয়েটি বললে, 'না, মারা যাবে না। আমি ওর সঙ্গে কথা কইব।'

আমি হাসলাম।

'মরতে মানা ক'রে দেবে?'

'মানা করে দেব,' ও বললে না হেসে, 'আচ্ছা, আপনাদের ছাপাখানায় যাওয়া যায়?'

'নিশ্চয়ই।'

'আঙ্গেলিনা ইভানোভনা আপনাদের ওখানে যান?'

'যান।'

'খামোকা ওকে যেতে দেন। সবকিছু উনি পণ্ড ক'রে বেড়ান...'

হঠাৎ চোখের সামনে দাঁতালো আগুনের চাকাটা ভেসে উঠল, জলপ্রপাতের শব্দের মতো তীব্র হয়ে উঠল কানের ভেতর রক্তের আওয়াজটা।

৩

যখন সম্বিৎ ফিরল, দেখি অন্ধকারে সিঁড়ির চাতালে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছি।

পাশেই একটা গলা শুনলাম, 'এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।'

আগুনের চাকা, সোনালী শিখা আর ফুলকিগুলো ফিকে হয়ে এল, প্রায় আর চোখেই পড়ছিল না। কানের আওয়াজটাও থেমে গেল।

বললাম, 'ও কিছু নয়।'

মেয়েটি আরো কাছে এসে আমার হাতটা ধরলে। ঝাপসা ধবধব করছিল রুমালটা। কানে আসছিল ওর নিঃশ্বাসের শব্দ। হাতটা ওর ছোটো, উষ্ণ।

'টর্চ আছে আপনার কাছে?' জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি।

টর্চ আমার কাছে ছিল, কিন্তু সেটা ব্যবহার করতাম কদাচিৎ। ব্যাটারি বাঁচানো দরকার।

'দিন তো।'

টর্চটা ওর হাতে গুঁজে দিলাম। আলোটা সিঁড়িতে ফেলার বদলে ফেললে আমার ওপর। আলোয় চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। ও মন দিয়ে আমায় আপাদমস্তক দেখলে।

শেষে বললে, 'আপনার বালাপোষের কুর্তাটা খোলা।'

সত্যিই আমার কুর্তাটার বোতাম বন্ধ করি নি, কারণ একটা বোতামও তাতে নেই। তিন মাস আগে, আগস্টের শেষে যে শহরটায় জেলা পত্রিকার সম্পাদনা করতাম, সেটা জার্মানদের দখলে গেলে আমি পায়ে হেঁটে আসি লেনিনগ্রাদে। আবহাওয়াটা তখনো গরম ছিল, আমি যে পোষাকে ছিলাম সেই পোষাকেই চলে আসি। ওভারকোট ছিল না। লেনিনগ্রাদে আমায় এই বালাপোষের কুর্তাটা দেয়, কিন্তু বোতাম ছিল না তাতে।

টর্চ নিভিয়ে ও সেটা আমার পকেটে গুঁজলে।

বললে, 'আমার কাছে সেফটি পিন আছে।'

'দরকার নেই।'

'না, দরকার আছে। শান্ত হয়ে দাঁড়ান,' মুখ না খুলে যোগ করলে ও। বুঝলাম একটা পিন ও ইতিমধ্যেই দাঁতে চেপে ধরেছে।

হাত ওর এগিয়ে এল আমার গলার কাছে, কণ্ঠার কাছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল বোমা ফাটার প্রচণ্ড গর্জন। কেঁপে উঠল বাড়িটা।

আমার ভয় হয়েছিল ও আমার ঘাড়ে পিন ফুটিয়ে বসবে। কিন্তু আঙুল ওর কাঁপল না।

'এটা নেভার ওপারে,' এণ্টি এয়ারক্রাফ্ট কামানের শব্দ ছাপিয়ে ও বললে চেঁচিয়ে। তারপর সেফটি পিন এ'টে দিলে।

দ্বিতীয় সেফটি পিনটা ও আঁটলে আমার পেটের কাছে।

'এসে গেছি আমরা,' এই ব'লে নিচু দুয়ারটা খুললে সে।

তার পেছু পেছু এগিয়ে গেলাম আমি। মাথার ওপর খোলা আকাশ।

৪

হেমন্তের তারা-ভরা শান্ত শীতল নিথর আকাশের মতো উদাত্ত আর কিছু নেই। কিন্তু এ আকাশ তেমন নয়। তার উদাত্ত সুষমা চূর্ণ হয়ে গেছে। নোংরা, দগ্ধ বিস্ফোরণাভায় সে আকাশ কাঁপছে, চমকাচ্ছে, ছটফট করছে।

এই সব দপদপে আগুনের মাঝখানে ছাদটা দুলছে ঠিক জাহাজের মতো। ঝনঝনে ঢালু চালের ওপর দিয়ে এগুতে এগুতে আমি মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠা দপদপে আভায় যতটা পারা যায় চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করলাম। বিস্ফোরণের আলোগুলো যেন পরস্পর আলাপ চালাচ্ছে, গোটা আকাশ পেরিয়ে সাড়া দিচ্ছে এ ওকে। বিস্ফোরণের ঝলক আর আগুনের আভাগুলো নিভে গেল, নিভে গেল তারারা, অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠল অবরুদ্ধ নগরীর ছাদ, চুড়ো, সাঁকো আর স্কোয়ারের গহ্বর। নিভে গেল বিস্ফোরণ আর সবই আবার ডুবে গেল অন্ধকারে, রইল শুধু মিটমিটে দাগ ধরা একটা কালো আকাশ।

শহরের চারিধারে আগুনের বেষ্টনী পড়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি জ্বলছে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, মনে হয় যেন একটা সোনার নদী বইছে সেখানে। জ্বলছে লিগোভো, জ্বলছে স্ত্রেল্‌না। এটা সেই ফাঁস যা আমাদের পিষে মারছে। দিনের বেলায় এ ফাঁস দেখা যায় না, যদিও প্রতি মুহূর্তেই তা জানান দেয়। কিন্তু রাতে তা চাক্ষুষ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে চেপে বসা এই মরণ চক্রটাকে পুরোপুরি এত পরিষ্কার ক'রে দেখলাম এই প্রথম, চেয়ে রইলাম ঘৃণায় শিটিয়ে উঠে।

আস্যা দাঁড়িয়ে ছিল আমার পেছনে, চালের ওপর দিকে। ওর কথা মনে পড়তেই ফিরে দাঁড়ালাম। মাথায় টেনে বাঁধা

রুমাল, সিধে হয়ে ও আমার মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে সামনে। আর ছত্রভঙ্গ আকাশের সমস্ত দপদপে আলো কাঁপছিল তার চোখে।

বললে, 'আমাদের কী মরণ-কামনাই না ওরা করছে! কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে আমাদের, বেঁচে থাকতেই হবে, থাকতেই হবে!...'

৫

সকালে ছাপাখানায় যখন গেলাম, সুমারোকভ তার টুল থেকে উঠে দাঁড়াল না।

আমি এলে আমার আপিসের লোকেরা সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়াবে এ দাবি আমি কখনো করি নি। কিন্তু তাহলেও সাধারণত ওরা উঠে দাঁড়াত।

টুলের ওপর বসেই রইল সুমারোকভ, নাবিকের প্যাণ্ট পরা পা দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে লোহার উনুনের দিকে, কাগজের ছাঁটগুলো জ্বলছে সেখানে। একটা পা ওর খোঁড়া, সেই কারণে লড়াইয়ের কাজে তাকে নেওয়া হয় নি। কিছু কাল আগেও তা নিয়ে সে আফসোস করত; বয়স ওর ঊনিশ, নাবিকদের শহরে সে বড়ো হয়েছে, কল্পনা করত নৌবহরে কাজ করবে। কিন্তু সে স্বপ্ন এখন সে ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল, চুপচাপ থাকে, নড়েচড়ে কম, শীর্ণ নোংরা মুখখানায় — বহুকাল থেকেই ও আর হাত মুখ ধোয় না — অবিরাম কষ্টের একটা ছাপ ছাড়া আর কিছুই ফোটে না।

প্রিণ্টিং প্রেসে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্ভেৎকভ, আমায় নমস্কার জানাল। স্ভেৎকভ মাঝবয়সী লোক, প্রিণ্টার, সৈন্যদলে নেওয়া হয় নি, কেননা তার হাঁপানি রোগ আছে। গত সপ্তাহে ওর বৌ মারা গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হাল?'

'কারেণ্ট নেই,' বললে স্ভেৎকভ।

চারটে টাইপ সেটিং কেস আর একটা ফ্ল্যাট প্রেস নিয়ে আমাদের ছাপাখানা। প্রেসটা চলত বিদ্যুতে। আজ তিন দিন হল বিদ্যুত নেই, কাল গোটা দিনটা কেটেছে তার বৃথা আশায়। সে বিদ্যুত যে আর আদৌ আসবে না, সেটা এতক্ষণে বুঝলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করা যায়?'

সুমারোকভ কিছুই বললে না। স্ভেৎকভ বললে:

'জানি না।'

'ম্যাটারের তারিখটা বদলে দাও,' বললাম সুমারোকভকে।

নির্দিষ্ট সংখ্যার কম্পোজিং আমাদের সবই তৈরি হয়েছিল তিন দিন আগেই, মেসিনে চাপানো সারা। সুমারোকভের ওপর কাজটা চাপালাম ইচ্ছে করেই, দেখতে চাইছিলাম টুল ছেড়ে ও ওঠে কিনা। ভয় ছিল বোধ হয় আর উঠবেই না। কিন্তু উঠল ও, খুঁড়িয়ে গেল মেসিনের কাছে। চলতে গিয়ে টলছিল। সেটা যে আমার চোখে পড়েছে তাতে মনে হয় যেন কেমন একটু তৃপ্তিই পেল।

ম্যাটারের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে।

'কেউ এসেছিল এখানে?' জিজ্ঞেস করলাম স্ভেৎকভকে।

বললে, 'প্রতিবেশিনী।'

'কোন প্রতিবেশিনী?'

'আঙ্গেলিনা।'

'সত্যি কে আগে মরবে, আমি না উনি?' বললে সুমারোকভ।

বুঝলাম আঙ্গেলিনা ইভানোভনার সঙ্গে ওদের কী আলাপ হয়েছে।

অনেকক্ষণ নেতিয়ে পড়ে কাজটা করছিল সুমারোকভ. যদিও বদলানোর ব্যাপার শুধু একটা: কালকের তারিখের জায়গায় আজকের তারিখ।

'কী হল?'

'এই যে, এক্ষুণি।'

ধৈর্য হারাল আমার।

বললাম, 'সরে যা, আমি নিজেই করছি।'

সাগ্রহেই সরে গেল ও, ফের টুলে এসে বসলে। টাইপ বদলে আমি জিনিসটা ঠিক ক'রে দিলাম। ওরা দুজনেই চেয়ে দেখতে লাগল কী এবার করব। বিদ্যুত তো নেই।

মনে হল, আমার এই বিপদে ওরা যেন নির্বিকার, সংখ্যাটা বেরবে কিনা তাতে কিছুই ওদের এসে যায় না, রাগ হল আমার। অল্প কিছু দিন আগেও ওরা উৎসাহ নিয়ে খেটেছে, মিলেমিশে কাজ চালিয়েছি আমরা। হুইলের কাছে গিয়ে তার বেল্টটা খুলতে লাগলাম আমি। সুমারোকভের মুখে কোনোই ভাবান্তর হল না, কিন্তু স্ভেৎকভের মুখ দেখে বুঝলাম: ও টের পেয়েছি কী আমি করতে চাইছি: হাত দিয়েই হুইল ঘোরাব।

'শুরু করা যাক,' বললাম স্ভেৎকভকে।

মেসিনের কাছে এল ও, একটা কাগজ টেনে এনে বেড়ে রাখল।

ডাকলাম, 'সুমারোকভ।'

ধীরে ধীরে টুল থেকে উঠল সুমারোকভ।

'হুইলটা খানিকটা ঘোরা।'

অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে ও, কিন্তু আপত্তি করলে না। দাঁড়িয়ে রইল খানিক, তারপর তেমনি অবাক মুখ নিয়েই হুইলটার কাছে এল, দুই হাতে হাতল ধ'রে শরীরের ভর দিলে।

ভর দিলে গোটা শরীরের, কিন্তু হুইল নড়ল না। মনে হল ও ভান করছে।

'লাগা, জোর দিয়ে লাগা!' চ্যাঁচালাম আমি।

হঠাৎ ওর লাল হয়ে ওঠা ঘাড় দেখে টের পেলাম গায়ের সমস্ত জোর দিয়েই ও ঠেলছে। মায়া হল ওর ওপর। সত্যি বলতে কি, অনেক আগে থেকেই কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে, ওর ওপর যে রাগ করছি সেটা শুধু আমার নিরুপায়তার চেতনায়।

'যা বস গে,' ব'লে আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম।

ফ্ল্যাট মেসিনের চাকা আমায় আগেও ঘুরাতে হয়েছে, মোটের ওপর চাকাটা ঘোরে বেশ সহজেই এটা মনে আছে। হাতলে চাপ দিলাম আমি, কিন্তু অবাক লাগল এই দেখে যে চাকা ঘুরছে না। তখন গোটা শরীরের ভর দিলাম চাকার ওপর। ধীরে ধীরে নড়তে লাগল হাতল, আমার মুখের পাশ দিয়ে স্পোকের পর স্পোক সরতে লাগল।

পুরো এক পাক দিয়ে থামল হুইল। একটা ছাপা ফর্মা বেরল যন্ত্র থেকে। কপালে আমার ঘাম ফুটে উঠেছিল, তৃষিতের মতো হাওয়া টানছিলাম মুখ দিয়ে। আপ্রাণ শক্তিতে ফের ভর দিলাম হাতলে, ফের হুইল ঘুরল। দ্বিতীয় বার ঘোরার পর চোখে আগুনে ফুলকি দেখতে শুরু করলাম। দম নেবার জন্যে দাঁড়ালাম সিধে হয়ে। ফুলকিগুলো নিভে গেল: চোখাচোখি হল স্ভেৎকভের সঙ্গে।

চোখে ওর করুণা। আমায় কেউ করুণা করবে এটা আমার পছন্দ নয়। ফের ভর দিলাম হাতলের ওপর।

আরো এক পাক দিল হুইল।

আগুনে ফুলকি আর দাঁতওয়ালা চাকা ছাড়া চোখে আর কিছুই দেখছি না, কিন্তু হুইল ছাড়লাম না আমি। আরো এক

পাক ঘুরল, আরো এক পাক... গোটা দেহটা দিয়ে কাজ চালালাম আমি, অসুবিধা হচ্ছিল শুধু এই জন্যে যে দম পাচ্ছিলাম না, হঠাৎ কানে সেই আওয়াজটা শুরু হল, প্রতি মুহূর্তে বেড়ে উঠছিল সেটা। আগুনে ফুলকিগুলো ছাড়া কিছুই আর চোখে পড়ছে না, কানের আওয়াজটা ছাড়া কিছুই আর শুনছি না। টের পাচ্ছিলাম আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে স্ভেৎকভ, চেঁচিয়ে কী যেন বলছে আমায়, কিন্তু কথাগুলো কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। কেবল ও যখন আমায় হুইল থেকে টেনে এনে নিজেই হাতলটা ধরলে, তখনই শুধু বুঝতে পারলাম যে ও আমার বদলী হতে চাইছে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি বাতাস গিলতে লাগলাম। গোটা ঘরখানা যেন ঘুরছিল, ভয় হচ্ছিল, আগে যা কয়েকবার হয়েছে, চেতনা লোপ পাবে। তার চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। সকলের কাছেই তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে যে হুইল ঘোরানো চলবে না। জোর ক'রে গিয়ে দাঁড়ালাম স্ভেৎকভের জায়গায়, কাগজ নিয়ে বেড়ে চাপালাম।

সঙ্গে সঙ্গেই হুইল ঘুরল স্ভেৎকভের হাতে। ছাপা ফর্মা বেরিয়ে এল। আরো এক ফর্মা, আরো একটা...

স্ভেৎকভের উঁচু ক'রে তোলা, না-কামানো মুখটা আমার মনে হল বড়ো বেশি শাদাটে। বেরিয়ে আসা চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চাকা ঘোরাচ্ছিল ও ধীরে ধীরে, একটার পর একটা স্পোক ঘুরে যাচ্ছে, আর প্রতিটি পাকের সঙ্গে সঙ্গে মুখ ওর আরো শাদা হয়ে উঠছে। আরো এক পাক, আরো একটা, আরো...

হাতল ছেড়ে দিয়ে ও পাশকে হয়ে টলে পড়তে লাগল। হাতে শাদা কাগজ নিয়ে ওর পতন দেখতে লাগলাম।

হাতল থেকে পিছলে গিয়ে মুখখানা কাত ক'রে ও একেবারে ধরাশায়ী হল মেজের ওপর। ওই ভাবেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল সে, নিঃশ্বাসে ওঠা নামা করতে লাগল পিঠটা।

ছাপা ফর্মাগুলো আমি গুণে দেখলাম। বাইশটি ফর্মা। আমি আর স্ভেৎকভ মিলে বাইশ বার হুইল ঘুরিয়েছি। ছাপা দরকার অন্তত পাঁচ শ' কপি। প্রতিটি ফর্মার দুটি পিঠ। প্রতিটি কপির জন্যে দুবার চাকা ঘুরাতে হবে। হাজারটা পাক!

হাজার!

এক কোণে ছিল স্ভেৎকভের খাটিয়াটা। গিয়ে শুয়ে পড়লাম তাতে।

৬

অবরোধের শুরু থেকেই স্ভেৎকভ আর সুমারোকভকে রাখা হয় 'ব্যারাক স্ট্যাটাসে' অর্থাৎ তারা শুধু ছাপাখানায় কাজই করত না, থাকতও সেখানে। স্ভেৎকভ ঘুমোত প্রেসের পাশেই, আর সুমারোকভ তার খাটিয়া পেতেছিল পাশের ঘরে, ঘরটা ছোটো, গুমটি ঘরের মতো। কিছু কাল আগেও ঘরটা ছিল ছিমছাম, পরিষ্কার। কিন্তু অক্টোবর থেকে, খাদ্যাভাব যখন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তখন থেকেই এখানে ধুলো, ঝুলকালি আর আবর্জনা জমছে।

'এটা আপনার ফোটো?' দরজার ওপাশ থেকে একটা সরু গলা শোনা গেল।

'আমারই,' জবাব দিল সুমারোকভের গলা।

'কবে তুলেছিলেন?'

'জুলাই মাসে।'

'দেখুন দিকি, কী রকম ছিলেন আপনি!'

'তা মন্দ ছিলাম না,' স্মারোকভের কথায় খানিকটা আত্মতৃপ্তি না ছিল এমন নয়, 'কেন, রোগা হয়ে গেছি? রোগা তো হতেই হবে...'

'রোগা হয়েছেন, তবে খুব বেশি নয়। শুধু মুখখানা কালচে হয়ে গেছে।'

'এটা উনুনের জন্যে,' বীরস স্বরে বললে স্মারোকভ।

স্ভেৎকভের খাটে শুয়ে শুয়ে আন্দাজ করছিলাম কার সঙ্গে কথা কইছে স্মারোকভ। হঠাৎ চিনতে পারলাম। এটি সেই মেয়েটি, যার সঙ্গে চালে উঠেছিলাম।

'এটা কী জাহাজ?' জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি।

টের পেলাম স্মারোকভের খাতা দেখছে ওরা — স্মারোকভের এক মূল্যবান সম্পদ এটি। যখন আমরা এখানে আমাদের পত্রিকা ছাপতে শুরু করি, তখন প্রতি সন্ধ্যায় অবসরের সময় চমৎকার বাঁধাই করা এই খাতাটি নিয়ে তন্ময় হয়ে বসত সে। নানা রকম ফোটোগ্রাফ আঁটা ছিল এতে — সর্বাগ্রে নানা মূর্তিতে স্মারোকভ নিজে, এবং তারপর যুদ্ধ জাহাজের ফোটো। প্রতিটি জাহাজ সম্পর্কে স্মারোকভের তথ্যের অভাব ছিল না, ঈশ্বর জানেন কোত্থেকে সে তা সংগ্রহ করেছে। নানা সিনেমার অনেক ছবিও সে এ'টে রাখত তাতে, টুকে রাখত নানা কবিতা, লেখাগুলো অদ্ভুত, প্রতিটি অক্ষর সে লিখত ভয়ানক পে'চিয়ে পে'চিয়ে, কেননা তার আসল টানটা কবিতার দিকে তত নয়, যতটা ওই প্যাঁচগুলোয়।

আজ মাস খানেকেরও বেশি স্মারোকভের হাতে ওই খাতাটি আমি আর দেখি নি। মনে হয়েছিল যেন খাতাটার কথা সে একেবারেই ভুলে গেছে। তাই কী ভাবে পাতা ওলটাচ্ছে ও, ছবিগুলো দেখাচ্ছে — এটা কানে আসতে ভারি অবাক লাগল। জাহাজের ফটো দেখছে মেয়েটি আর প্রতিটি জাহাজ

সম্পর্কে ও তথ্য পেশ করছে। এক একটা প্রশ্ন করছে মেয়েটি আর বিশদভাবে তার জবাব দিচ্ছে সে, বোঝা যায় মেয়েটির মনোযোগে তৃপ্তি পাচ্ছে সে, উৎসাহিত হচ্ছে।

এর পর ছাপাখানার ভেতরে এল মেয়েটি। এই প্রথম ওকে দেখলাম আমি, অন্ধকারে নয়, নৈশ আগুনের স্বচ্ছ ঝলকে নয়। সত্যিই কি এ সেই মেয়ে, যার রহস্যময় এক শাদা রুমালের পেছু পেছু কাল ছুটে গিয়েছিলাম সিঁড়ি বেয়ে, অন্ধকার থেকে আলোয় আর আলো থেকে অন্ধকারে ধেয়ে গিয়েছিলাম চোখ ধাঁধানো চকিত বিস্ফোরণগুলোর মধ্যে? এখন এতটুকু রহস্যময়তা নেই ওর মধ্যে, রুমালটাও যেন অত শাদা দেখাচ্ছে না। বয়সের আন্দাজে একটু দীর্ঘাঙ্গী, ঋজু দেহ। মুখখানা প্রায় শিশুর মতো, কিন্তু প্রতিটি নারীর মুখে খাদ্যাভাব যে ক্লেশ এঁকে দিয়েছে তার ছাপ থেকে সেও বাদ যায় নি।

কাজের সময় দিন দুপুরে আমি খাটিয়ায় শুয়ে আছি ব'লে কেমন সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক করলাম উঠব না। কী হবে ভান ক'রে, যতই করো কাগজ তো আর বেরবে না!

আমার উদ্দেশে মাথা দোলালে সে, তারপর আমাদের নিশ্চল মেসিনটার কাছে গিয়ে কৌতূহলে চেয়ে দেখলে। সদ্য ছাপা ফর্মাগুলো চোখে পড়তেই একটা পাতা তুলে নিলে।

'জঙ্গী জলযান,' চেঁচিয়ে পড়লে ও।

ওটা আমাদের পত্রিকার নাম।

'এটা কি মাঝি মাল্লাদের কাগজ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'জাহাজের দ্রুত মেরামতিই হল বিজয়ের গ্যারাণ্টি।'

সম্পাদকীয়র শিরোনামাটা পড়লে সে। আমার লেখা।

'নিজেদের জাহাজ ওরা এখনো মেরামত করছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, মেরামত করতেই হবে।'

'আর ওরা তা করছে?'

'যত আশ্চর্যই হোক, মেরামতি ওরা চালাচ্ছে।'

'আশ্চর্যের কেন?'

'কারণ কাগজ বার করার চেয়েও জাহাজ মেরামত করা বেশি কঠিন।'

স্ভেৎকভ যোগ করলে, 'বিদ্যুত নেই, আর হাতল ধ'রে যে ঘোরাব তার শক্তি নেই।'

সুমারোকভ এল ছাপাখানায়। এমন চেহারায় ওকে আমি মাস খানেক দেখি নি। সদ্য মুখ ধুয়েছে, চুল আঁচড়ানো, চকচক করছে। জুতো জোড়া পরিষ্কার, বালাপোষের কোর্তাটার বুক খোলা, ভেতরে নাবিকের ফতুয়া দেখা যাচ্ছে। এমন কি প্রায় খোঁড়াল না পর্যন্ত।

'কী ভাবে কাগজ ছাপা হয় কখনো দেখি নি,' বললে আস্যা, 'ভারি দেখতে ইচ্ছে করে।'

হুইলের হাতলটা ধরল সে।

বহু কষ্টে ঘুরতে শুরু করল হুইল, জোর দিতে গিয়ে মুখের চামড়া লাল হয়ে উঠল ওর। স্পোকগুলো সরতে লাগল ধীরে ধীরে, অতি ধীরে।

'কঠিন খুব,' বললে সুমারোকভ, 'দাঁড়াও আমি তোমার সঙ্গে হাত লাগাই।'

সেও মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে হাতলে হাত লাগালে। দুজনে চাকা ঘোরাতে লাগল। হাসল তৃপ্তিতে, মেহনতে।

'কিন্তু কাগজ কই?' জিজ্ঞেস করলে আস্যা, 'ছাপা হয় কী ক'রে?'

স্ভেৎকভ গিয়ে দাঁড়াল তার নিজের জায়গায়, কাগজ দিতে লাগল, বেরিয়ে এল ছাপা ফর্মা।

হেসে উঠল মেয়েটি।

আরো এক ফর্মা, আরো একটা…

'তুমি হাঁপিয়ে গেছ,' সুমারোকভ এমন ভাব ক'রে বললে যেন সে নিজে কখনো হাঁপাবে না, 'ছেড়ে দাও, আমি একাই চালাব।'

মাথা নাড়লে মেয়েটি।

বললে, 'দুজনে মিলে অনেক সহজ। যত জোরে পাক খাবে, ততই সহজে ঘুরবে। এসো, পুরো দমে চালাই।'

ক্রমেই দ্রুত সরতে লাগল স্পোকগুলো। আর স্ভেৎকভের শাদা কাগজ জোগানোর ছন্দও ততই দ্রুত হয়ে উঠল। কথাটা সত্যি। চাকা যত জোরে ঘুরবে, জোর খাটাতে হবে ততই কম।

এ এক অসাধারণ গুরুতর আবিষ্কার।

'আমি নিজেই চালাব,' দৃঢ় কণ্ঠে বললে সুমারোকভ, জোর ক'রে হাতল থেকে সরিয়ে দিলে ওকে।

দু পা পেছিয়ে এল মেয়েটি, আর সুমারোকভ নিবিষ্ট মনে, গম্ভীর মুখে হাতল ঘোরাতে লাগল — টের পাচ্ছিল মেয়েটি তাকে লক্ষ করছে। এবার ওকে আর প্রায় শরীরের ভর দিতে হচ্ছিল না, হাতলটা ঘুরে আসতেই শুধু ঠেলা দিচ্ছিল অল্প করে।

তখন খাটিয়া ছেড়ে উঠলাম আমি।

স্ভেৎকভকে জিজ্ঞাসা করলাম:

'কতগুলো হল?'

'এই একশ উনিশ চলছে,' বললে স্ভেৎকভ, 'এই একশ কুড়ি, একশ একুশ।'

'দে আমায়, দে এবার!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, হুইলের গতি কমতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালাম ওর জায়গায়।

হাতের চেটোর হালকা, ক্ষিপ্র এক একটা আঘাতে হুইল ঘুরে চলল। ঝিক ঝিক আওয়াজ উঠল মেসিনে। বেরিয়ে আসতে লাগল ছাপা ফর্মা।

‘সত্যিকারের খাওয়া জুটলে হুইল ঘুরত অন্য চালে,’ আমার পেছন থেকে বললে সুমারোকভ, ‘দেখতে দেখতে কোন দিন ম’রে যাব।’

‘যতদিন কাগজ বেরুচ্ছে ততদিন কেউ মরবে না,’ বললে আস্যা।

৭

কিন্তু শীগগিরই কাগজ বেরুনো বন্ধ হল। সুমারোকভ মারা গেল। মারা গেল আরো অনেক অনেক লোক। আর আমাদের ছয় তলা ঠান্ডা বাড়িটার প্রতি ফ্ল্যাটেই মড়া জমে রইল, তাদের কবর দেবার মতো কেউ ছিল না।

কী একটা সামরিক ছাপাখানার জন্যে স্ভেৎকভকে নেওয়া হল আমার কাছ থেকে। সেদিন তুষার-ঝড় চলছিল, ছোট্ট সুটকেসটা নিয়ে সে চলে গেল, এর পর আর কখনো ওকে দেখি নি। ছাপাখানায় রইলাম শুধু আমি একা। প্রেসটা, হরফগুলো, কাগজ — এ সব তো ফেলে দেওয়া যায় না। বলাই বাহুল্য আমারও ওপরওয়ালা ছিল, তাদের কাছ থেকে নির্দেশের অপেক্ষা করছিলাম : কী করব। কিন্তু ওপরওয়ালাদের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ কিছুতেই করা গেল না : শহরে টেলিফোন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া কীই বা দরকার। ছাপাখানার কী হাল, আমারই বা কী হাল সেটা ওপরওয়ালারা বেশ জানে। কিছুটা অপেক্ষা করা দরকার...

আমি এখন থাকি সুমারোকভের ঘরখানায়, শুই তার খাটিয়ায়। জানলার শার্সিগুলো এখানে এখনো অক্ষুণ্ণ,

এখানেও লোহার উনুন ছিল, আমাদের পত্রিকার পুরনো সংখ্যা আর আলমারির তক্তা দিয়ে তা জ্বালানো চলত। কিন্তু এত প্রচণ্ড শীত পড়ল যে উনুনটা দিয়ে বিশেষ সাহায্য হল না। দিন রাত আমি শুয়ে থাকতাম খাটিয়ায়, বালাপোষের কোর্তাটা গায়েই থাকত, তার ওপর দুটো লেপ চাপাতাম, একটা আমার, আরেকটা সুমারোকভের। বড়ো একটা পুরু কাগজ দিয়ে জানলা ঢাকা হত যাতে আলো না দেখা যায়। সকালে সেটা খুলে সন্ধ্যায় নতুন ক'রে বসাবার কথা। প্রথম প্রথম খুলতাম, বসাতাম, কিন্তু পরে কাজটা বিরক্তিকর ও কঠিন হয়ে উঠল। সকালে কাগজ খোলা ছেড়ে দিলাম। দিনের বেলাতেও আমার ঘরটা হয়ে উঠল রাতের মতো অন্ধকার।

বেরুতাম শুধু দু'দিনে একবার। রুটির দোকানে যেতাম। রাস্তায় তুষারের ঝলকে চোখে ধাঁধা লাগত, তুহিন বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া হয়ে উঠত অসম্ভব। বিরাট বিরাট তুষার স্তূপগুলো থেকে বাতাসে কণা উড়ত। তার মাঝখান দিয়ে পদদলিত হাঁটা-পথটা ধ'রে আমি যেতাম প্রায় কিছু না দেখে, নিঃশ্বাস না নিয়ে। রুটির দোকানে পাওয়া যেত এক টুকরো রুটি — আমার দু'দিনের বরাদ্দ। অনেকেই রুটি পাওয়া মাত্র ওখানেই দোকানেই তা খেতে শুরু করত। আমি তা করতাম না। কুর্তার তলে প্রায় গা ঘেঁষে লুকিয়ে রাখতাম রুটিটা, ফেরার পথে মাথা ঘুরতে থাকত, ঝাপসা হয়ে আসত সবকিছু। কিন্তু সে অনুভূতিটা খুব খারাপ লাগত না। বরং বরফের ওপরেই শুয়ে পড়ে আর কোথাও না যাবার প্রলোভনটা ছিল ভারি মধুর। প্রতিবারই রাস্তায় মড়া চোখে পড়ত, বরফে প্রায় ঢাকা, তাতে ভয়ঙ্কর লাগত না। 'না, যতই হোক আগে নিজের রুটিটা খেতে হবে,' বলতাম নিজের মনে, হাঁটা চালিয়ে যেতাম।

ঘরে ফিরে শুয়ে পড়তাম খাটিয়ায়, দুটি লেপ টেনে মাথা ঢাকতাম, আর ওই অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে রুটির ছোটো ছোটো টুকরো ছিঁড়ে মুখে পুরতাম। প্রতিটি টুকরো না গিলে মুখে রাখতাম বহুক্ষণ। তারপর ঘুমিয়ে পড়তাম।

তবে ঘুমুতাম কিনা ঠিক জানি না। আমার চারিপাশের ঐ স্তব্ধতার মধ্যে বোঝা কঠিন হত ঘুমুচ্ছি কি না। সমুদ্রের তলদেশের মতো এক নিষ্প্রাণ স্তব্ধতায় সারা শহর নিঝুম। রাস্তায় ট্রাম নেই, মোটর গাড়ি নেই, মানুষের কণ্ঠস্বর নেই। শীত পড়তেই বিমান আক্রমণ বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের বিমানধ্বংসী কামানগুলোও নীরব। চারিদিক থেকে শহরটাকে ঘেরাও ক'রে জার্মানরা মনে হয় আর কোনো শক্তি ব্যয় করতে চাইছিল না, স্রেফ দিন গুনছিল কবে শহরটা মরে যাবে, জমে যাবে। একটা শব্দও আমার ও ঘরে এসে পেঁছিত না, আর এই শ্মশান স্তব্ধতায় আমার কেবলি ধন্ধ লাগত যেন আমার খাটিয়া সমেত কোথায় বুঝি পড়ে যাচ্ছি কেবলি নিচে, নিচে। সারা দুনিয়া যেন তার আলো, তার লোকজন তাপ নিয়ে থেকে গেছে কোন সুদূরে, কোন উঁচুতে, আর আমি কেবলি তলিয়ে যাচ্ছি, নিচে নামছি আর সে নামার আর শেষ নেই, কেননা নিচে কোনো তল নেই।

মাঝে মাঝে চেতনা স্বচ্ছ হয়ে উঠত, টের পেতাম মরছি। তখন ভাবতাম উঠে দাঁড়ানো দরকার, কাঠকুট খোঁজ ক'রে চুল্লিটা জ্বালাই, জল নিয়ে আসি। কিন্তু নড়াচড়া করার কথা ভাবতেই এত ভয় লাগত যে মরণের কথায় কোনোই ত্রাস জাগত না, মরণের অপেক্ষাই করতাম, আর তলিয়ে যেতাম কেবলি নিচে।

৮

হঠাৎ এই তলহীন, দ্বারহীন গভীরের মধ্যে ওপর থেকে একটা জোরালো, ঝঙ্কৃত গলা ভেসে এল:

'আপনি তো বেঁচে আছেন! বেঁচে আছেন! জেগে উঠুন!'

নিচে নামা বন্ধ হল আমার। এবার কেবলি যেন ওপর দিকে উঠছি। টের পেলাম মুখের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, চারিদিকে আলো। জানলার নীল কাগজটা খসানো, হিমে শার্সিতে তুষারের নকশা ফুটে উঠেছে, তার মধ্য দিয়ে ঝকঝক করছে দিন। আস্যা দাঁড়িয়ে আছে আমার ওপর ঝুঁকে, গলায় ওর উল্লাসের সুর:

'দেখুন দেখি, আপনি বেঁচে আছেন! অথচ আঙ্গেলিনা ইভানোভনা বলছিলেন যে ছাপাখানায় কেউ নেই, আপনি নাকি মরে পড়ে আছেন। আমি এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেঁচে আছেন! এক্ষুণি!.. এক্ষুণি সবকিছু ব্যবস্থা করছি...'

আমি তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে, টের পেলাম যে হাসছি। বটেই তো, বেঁচে আছি আমি! আমায় বাঁচা দেখে এতই ওর বিজয় গর্ব, এত আনন্দ যে মরে থাকা আমার পক্ষে একেবারে লজ্জার ব্যাপার হত। আমি তাকিয়ে দেখলাম ওর দিকে, হাসলাম, আমারও আনন্দ লাগল এই দেখে যে মেয়েটিও বাঁচা। চেহারা বদলে গেছে ওর, অনশন-ক্লেশের সেই ভয়ঙ্কর চিহ্নগুলো আরো তীব্র হয়ে উঠেছে ওর ছেলেমানুষী মুখে। কিন্তু নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে সে, খুশি হচ্ছে। দুজনেই আমরা বেঁচে!

'এক্ষুণি, এই হয়ে এল!' বার বার বলছিল মেয়েটি, আমার চুল্লিটাকে জ্বালালে।

আমার ধারণা ছিল টাইপের কেসগুলো ছাড়া ছাপাখানায় জ্বালাবার মতো আর কিছু নেই। মেয়েটি কিন্তু কোণা কোণাচ

তল্লাস করে এক ভাঁড়ার আবিষ্কার করলে, সুমারোকভ আর স্ভেৎকভ এখানে নানা ধরনের তক্তা চাঁচুনি, কাঠকয়লা সব জমিয়েছিল। শোঁ শোঁ করে উঠল চুল্লি, কয়েক মিনিট বাদেই কালো নলটার উপর লালচে ছোপ ফুটে উঠল।

'জল আনা দরকার,' বললে মেয়েটি, তারপর বেরিয়ে গেল মস্ত তামার কেটলিটা নিয়ে।

ও বেরিয়ে যেতেই ভয়ানক ভয় হতে লাগল আমার, আর বোধ হয় ও ফিরবে না। পায়ে ওর ছিল হাঁটু অবধি পা ঢাকা ফেল্টের মোটা হাই বুট, হাঁটলে শব্দ হত না। পেছনে দরজা বন্ধ হতেই ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। 'ফিরে আয় রে প্রাণ-বালিকা,' মনে মনে ব'লে উঠলাম আমি, 'প্রাণ-বালিকা ফিরে আয়।' জানতাম যে গোটা বাড়িটায় একটি কল দিয়ে এখনো টিপি টিপি জল পড়ে। সেটা আছে মাটির নিচের তলকুঠরিতে, শেলটারে। কল্পনা করলাম কেটলি হাতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামছে ও, আঙিনা পেরিয়ে ঢুকছে তলকুঠরিতে, অন্ধকারে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কলের কাছে। অত বড়ো কেটলিটাকে বিন্দু বিন্দু জলে ভরে তুলতে অনেক সময় লাগবে বৈকি... তাহলেও এখনো আসছে না কেন? কিছু বিপদে পড়ে নি তো? 'ফিরে আয় রে প্রাণ-বালিকা!'

যখন প্রায় অপেক্ষা করা ছেড়ে দিয়েছি তখন এসে দাঁড়াল সে।

৯

জল ভরা কেটলিটা যে কত ভারি, কী ভাবে ওর হাতে টান পড়ছে দেখে বিব্রত লাগল। লজ্জা হল শুয়ে থাকতে। রুটি আমি যতটা পাই, মেয়েটিও ঠিক ততটাই পায়, আমার চেয়ে কষ্ট ওর এতটুকু কম নয়। দুটো লেপই ঝেড়ে ফেলে মেজেয় পা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

‘এই দেখুন, বলেছিলাম! আপনি তো দাঁড়াতেও পারেন!’

‘দাঁড়াতে পারি বৈকি,’ ফুর্তি ক’রে বললাম আমি। এখনো যে আমি কত শক্ত সেটা দেখাবার জন্যে ছুরি দিয়ে তক্তাগুলো চেঁছে চেঁছে চাঁচুনিগুলো চুল্লিতে দিতে লাগলাম।

হাতের দস্তানা খুলে ফেলে কেটলির ওপর হাত গরম করতে লাগল মেয়েটি। হাত দুটি ওর ভারি ছোটো, কিন্তু আঙুলগুলো ফোলা ফোলা, ফাটা ফাটা, বাঁকে না, নখের কাছে পুঁজ। জিনিসটা কী আমি জানি, আমার আঙুলগুলোও ফাটা ফাটা, পুঁজ ঝরছে। জানলার তাকে হঠাৎ তার চোখে পড়ল ফোটোগ্রাফ আঁটা খাতাখানা, সুমারোকভ যেটা থেকে ছবি দেখিয়েছিল ওকে। কী অসম্ভব আগের কথা সেটা, যেন অন্য এক জগৎ। সুমারোকভ তখন বেঁচে ছিল। তখনো আমরা মেসিনের হুইল ঘুরাতে পারতাম... খাতা খুলে পাতা ওলটাতে লাগল মেয়েটি।

‘আমি নিয়ে যাব এটা?’

‘নিশ্চয়।’

বেশ গরম হয়ে উঠল ঘরের ভেতরটা, সেফটি পিন খসিয়ে আমার বালাপোষের কোর্তাটা আলগা করে দিলাম আমি। শনশনিয়ে উঠল কেটলি, ধোঁয়া বেরতে লাগল নল দিয়ে। ঢাকনিটা লাফাতে লাগল। দুই মগে ফুটন্ত জলটা ঢাললে আস্যা, খাটিয়ার ওপর পা গুটিয়ে ব’সে খেতে শুরু করলাম আমরা। গরম ভাপ উঠছিল, ঘাম দেখা দিল মুখে, জিভ পুড়িয়ে আমরা ছোটো ছোটো চুমুক দিতে লাগলাম, আনন্দে সৌহার্দ্যে আমরা তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। আশ্চর্য একটা অন্তরঙ্গতা জেগে উঠল আমাদের মধ্যে, জীবিতের প্রতি জীবিতের অন্তরঙ্গতা। নিজের গরম মগটার পেছন থেকে ওর চাউনিটায়

কেমন একটা ছেলেমানুষী দুষ্টুমিই যেন ফুটে উঠেছিল: খাসা লোক আমরা, সেয়ানা লোক, বেঁচে আছি আমরা!

মেয়েটি বলছিল সৈন্যদলে যোগ দিতে চেয়েছিল সে, স্নাইপার হবে ঠিক করেছিল, কেননা চোখ ওর খুব ভালো। পাইনগাছের কোন এক ডগায় বসে থাকবে, ঝোপের মধ্যে নড়ছে একটা জার্মান। মেয়েটি অমনি দুম! ব্যাস্, জার্মান খতম। হেমন্তে একজন পরিচিত সার্জেণ্ট ওকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল নির্ঘাৎ স্নাইপার ক'রে নেবে ওকে।

'গেলে না কেন তাহলে?'

'মা'র জন্যে।'

বুঝলাম, মায়ের সঙ্গে থাকে ও, মাকে ফেলে যাবে কী ক'রে?

'শয্যাশায়ী?'

'আজ তিন মাস। গা ফুলে যাচ্ছে। কী যে চেহারা হয়েছে।'

আমি জানতাম অনশনে লোকে শুধু রোগাই হয় না, ফুলতেও থাকে। তাই আর কিছু প্রশ্ন করলাম না।

'কিন্তু আপনি সৈন্যদলে যান নি যে?'

বললাম, 'স্বাস্থ্যের খুঁত আছে। অপারেশন করার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ভেস্তে যায়।'

'কী অসুখ আপনার?'

'বারো নম্বর নাড়ীতে আলসার।'

'ও নাড়িটা সবচেয়ে জরুরী, আমি জানি।'

'সবচেয়ে জরুরী হয়ত নয়, তবে সবচেয়ে লম্বা।'

'সেইজন্যেই প্রথম যখন আপনাকে দেখি, তখন অত রোগা আর হলদেটে দেখাচ্ছিল আপনাকে।'

'প্রথম আমায় দেখেছিলে কবে?'

'সেপ্টেম্বরে, ছাপাখানাটা যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে

উঠে আসে, প্রায়ই সিঁড়িতে দেখতাম আপনাকে। আমায় আপনি খেয়াল করেন নি?'

'না, তখন খেয়াল করি নি।'

'কাগজ কী ভাবে ছাপে দেখতে ভারি ইচ্ছে হত। ভাবতাম, যদি অন্তত একটু ফোকর দিয়েও দেখা যায়। ছাপাখানায় সবারই মুখ চিনতাম আমি, ওই খোঁড়া ছেলেটাকে, আপনাকে। আপনি ছিলেন রোগাটে, হলদে। অন্য লোকে তখনো মোটাই ছিল। আপনার আলসারটা এখনো আছে?'

'থাকা না থাকা এখন সবই সমান।'

বললাম আমায় যখন সৈন্যদলে পাঠাবার বদলে পত্রিকা সম্পাদনার জন্যে পাঠানো হয় তখন কী রকম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল।

'কী করবেন তাহলে?'

বললাম, 'ওপরওয়ালাদের নির্দেশের অপেক্ষা করছি।'

'অনেক দিন থেকে?'

মনে করবার চেষ্টা করলাম কবে স্ভেৎকভ গেছে। খাটিয়াটায় একা একা আমার কতদিন কাটল। প্রথমে মনে হয়েছিল দিন ছয়েক, কিন্তু পরে হিসেব করতে গিয়ে দেখলাম বেশি...

'হুকুম আর আসবে না,' বললে মেয়েটি।

কিছুদিন থেকে আমি নিজেও তাই ভাবছি, কিন্তু মেয়েটির অমন নিশ্চয়তা দেখে অবাক লাগল।

'কেন?'

'আপনার ওপরওয়ালারাও যে শুয়ে আছেন। ওঁরাও তো ওই টুকুনি রুটিই পান...'

কথাটা সত্যি। বুভুক্ষার সামনে সবাই সমান।

বললাম, 'যদি অন্তত একবার টেলিফোন করতেও পারতাম... কিন্তু টেলিফোন অচল...'

‘আপনি নিজে যান না কেন?’

এতে হেসে উঠলাম আমি।

‘কোথায় আমায় যেতে হবে তা জানো? বন্দরে!’

‘অনেক দূর!’

‘যেতে যেতেই পড়ে গিয়ে জমে যাব।’

‘তা খুবই সম্ভব,’ শান্ত গলায় গুরুত্ব দিয়ে বললে মেয়েটি। ‘তবে সেটা আপনার ওপর নির্ভর করছে।’

‘মোটেই আমার ওপর নির্ভর করছে না,’ আপত্তি করলাম আমি। ‘এটা আমার একেবারে জানা কথা যে শক্তি কুলবে না।’

মগের পেছন থেকে মন দিয়ে আমায় দেখলে সে, চুপ ক'রে গেল। আমিও চুপ ক'রে রইলাম। ঠোঁট পোড়ানো পানীয়, ঘরের উষ্ণতা, মেয়েটির সাহচর্য — এ সবে এতই ভালো লাগছিল যে তর্ক করার, উত্তেজিত হবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। আমায় আরো এক মগ জল ঢেলে ও হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে:

‘অনেক দিন গা ধোন নি, না?’

বিব্রতভাবে মনে করার চেষ্টা করলাম, কবে শেষ গা ধুয়েছি। বহুদিন আগে। হেমন্ত থেকে শহরের একটা স্নানাগারও কাজ করে নি, আর ঠাণ্ডা ছাপাখানায় খালি-গা হওয়া খুবই কষ্টকর, বিশ্রী। বহু সপ্তাহ গা থেকে এই বালাপোষের কোর্তাটা খুলি নি।

ও বললে, ‘কেটলিটায় প্রায় ভর্তি গরম জল। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, গা হাতমুখ ধুয়ে নিন, ঘরটা গরম থাকতে থাকতে ধুয়ে নিন...’

উঠল মেয়েটি, সুমারোকভের খাতাখানা গায়ের সঙ্গে চেপে ধরলে।

‘যেতেই হবে তোমায়, না?’

'মা রয়েছে যে,' মৃদু স্বরে বললে ও, টের পাচ্ছিল ওকে ছাড়া আমার ভয় করবে, একঘেয়ে লাগবে। নিজের আত্মিক প্রাধান্য সম্পর্কে মেয়েটি পুরোপুরি সচেতন ছিল, এমন ভাব করছিল যেন আমি একটা শিশু, যদিও বয়সে আমি ওর দুগুণ বড়ো। 'নিন, গা ধুয়ে নিন, ঘুমিয়ে পড়ুন, কাল সকালে বন্দরে যাবেন।'

চোখে আমার অনিশ্চয়তা দেখে যোগ করলে:

'ঠিক গিয়ে পেঁছিতে পারবেন। মানুষ যা ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি সে রাখে।'

'কোত্থেকে সেটা জানলে? নিজেকে দিয়ে নাকি?'

'নিজেকে দেখে, অন্যকে দেখে। গিয়ে পেঁছিনো দরকার, আপনিও পেঁছে যাবেন।'

১০

গিয়ে পেঁছেছিলাম।

ফটক ছেড়ে বেরুতে না বেরুতেই তুহিন বাতাসে তুষার কণার যে ঝাপট খেলাম তাতে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছবার কোনো আশাই নেই। পায়ের ওপর খাড়া থাকতে পারছিলাম না, টলছিলাম ঝোড়ো শাখার মতো। ইচ্ছে হচ্ছিল, যা হয় হোক, বরফের ওপর শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে থাকি। মোড়টা পর্যন্ত যাব, গিয়েই শুয়ে পড়ব। কিন্তু মোড় পর্যন্ত গিয়েও শুলাম না, এগুতে থাকলাম পরের মোড়টা পর্যন্ত। যে মোড়ের কাছে গিয়েই শুই না কেন, সবই তো সমান কথা। এই ভাবেই পেঁছলাম সাঁকো পর্যন্ত। নেভা পেরুলাম, বড়ো রাস্তায় ঢুকে এগুতে থাকলাম সামনে, কেবলি সামনে, বোমাবিধ্বস্ত বাড়ি, পোড়া বাড়ি, তুহিন বাড়িগুলোর

পাশ দিয়ে। পায়ে হাঁটা যে পথ দিয়ে এগুচ্ছি তার দুপাশে তুষারের স্তূপ, আমার আগে যারা এখান দিয়ে হেঁটেছিল তাদের তুষারাবৃত মৃতদেহ সেখানে। জানতাম যে কিছুক্ষণ বাদে আমিও ঠিক অমনি ভাবেই বরফ ঢাকা হয়ে পড়ে থাকব, কালচে-বাদামী মুঠোটা শিটিয়ে থাকবে বরফ স্তূপের ওপর, কিন্তু তাতে মোটেই ভয় লাগছিল না। ভাবছিলাম যদি আরো পাঁচ পা এগুতে পারি, তাহলে আগে সেই পাঁচ পা এগিয়ে নিই। অন্ধকারের মুখে লম্বা রাস্তাটা পুরোপুরি পাড়ি দিয়ে গিয়ে পেঁছিলাম। যা ভেবেছিলাম, দেখছি শক্তি আমার তার চেয়ে বেশি।

আমায় দেখে কেউ চিনতে পারলে না, আর যখন চিনতে পারলে তখন অবাক হল: এখানে সবাই ভেবেছিল আমি মারা গেছি। বরফে গেঁথে বসা একটা গাধা বোটে আমায় বসানো হল, মজুরদের সঙ্গে, জাহাজ মেরামত করছিল তারা। জায়গাটা গরম। এমন কি নিজেদের ছোট্টো একটা ডাইনামো থেকে ম্যাড়মেড়ে বিদ্যুত বাতিও জ্বলছিল। এক মাস আগেও এই গাধা বোটের কাঠের খোলের মধ্যে, তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁজরগুলোর মাঝে মাঝে দিন কাটাত শতাধিক লোক। কিন্তু এই এক মাসে তাদের অনেকেই মারা গেছে, তাই আমার জন্যে ফাঁকা খাট জোগাড় করা কঠিন হল না।

এইখানেই পাশের কামরায় ছিল ক্যান্টিন। টেবলগুলোর ওপর লাল সালুর কাপড়ে স্লোগান লেখা আছে: 'প্রধান কথা মজুরদের খাওয়ানো'। এ স্লোগান রচনা ক'রে ঝোলানো হয়েছিল শরতে, যখন সবার ধারণা ছিল খাদ্য দ্রব্যের খরচার ওপর কড়া নজর রাখলে প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব হবে না। ল্যাবরেটরি থেকে ইঞ্জিনিয়ররা নিয়ে আসে অসাধারণ সূক্ষ্ম ওজনের যন্ত্র, সেটা রাখা হয় কাউন্টারের ওপর। সে যন্ত্রে

প্রত্যেকেই যাচাই ক'রে নিতে পারত যে তাকে ঠিক ৩ গ্রাম চিনিই দেওয়া হয়েছে, ২·৯৯ গ্রাম নয়। জানি না তাতে কোনো কাজ হয়েছিল কিনা, কিন্তু গাধা বোটের বাসিন্দারা ঠিক অন্যান্য বাসিন্দাদের মতোই মারা গেছে। আমার সামনে কাজে নামল চল্লিশ জন লোক; বাকিরা খাটিয়াতেই শুয়ে রইল, ওঠার শক্তি ছিল না।

একদিন পর আমিও কাজে নামলাম। পায়ে খাড়া থাকতে পারছিলাম না, কিন্তু ইতিমধ্যে এ কথাটা জেনেছি যে শক্তি আমার যা ভাবি তার চেয়ে বেশি। বন্দর পর্যন্ত যখন এসে পেঁছাতে পেরেছি, তখন আমি কাজ করতেও পারি। একেবারে তরুণ বয়সে একবার আমি রেল কারখানায় ফিটারের জোগাড়ে হিসাবে কাজ করেছিলাম। সে সময় সাংবাদিক হব, এ স্বপ্ন সবে দেখছি। ফিটার হিসাবে নৈপুণ্য বেশি ছিল না। কিন্তু এখানে আমার দক্ষতাই যথেষ্ট। একটা মাল জাহাজ মেরামত করছিলাম আমরা, শরৎকালে বিমানের বোমায় এটি বিধ্বস্ত হয়। বরফের মধ্যে দেবে গিয়ে জাহাজের খোলটা ঠিক আমাদের গাধা বোটটার পাশেই উঁচু হয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড দেয়ালের মতো। মই বেয়ে সেই খোলটায় ওঠাই ছিল সবচেয়ে কঠিন। আমায় যে ব্রিগেডটায় নেওয়া হল, তার কাজ ছিল রিভেট মারার জন্যে লোহার পাতে ছ্যাঁদা করা, চিমনি ওয়েলডিং করা। বাঁ পাশে কাত হয়ে বসা জাহাজের ভেতরটায় আমরা যাতায়াত করতাম ছায়ার মতো। সব কাজই চলত যেন স্লো স্পীডের এক ফিল্ম। যদি কিছু একটা তুলতে বা ঠেলতে হত, তাহলে আমরা হাত লাগাতাম জন দশেক মিলে, তারপর আধো মূর্ছায় বসে থাকতাম বহুক্ষণ।

আর যতবার গিয়ে বসতাম, প্রতিবারই মনে হত আর কখনো উঠে দাঁড়ানো হবে না। কিন্তু সেটা আর বিশ্বাস করতাম

না আমি। মনে মনে আওড়াতাম, যতদিন মেরামতি চালাচ্ছি, ততদিন বেঁচেই থাকব আমরা। বলতাম, ফ্যাশিস্টরা চাইছে যেন আমরা মরি, তাই কিছুতেই মরা চলবে না আমাদের। আর জানতাম যে আওড়াচ্ছি অন্যের কথা, মনে পড়ে যেত কার কাছ থেকে সে কথা শুনেছি। আর সত্যিই উঠে দাঁড়াতাম আমরা।

গাধা বোটে আসার কিছুকাল পর মনে হয় সত্যিই খানিকটা শক্ত হয়ে উঠেছিলাম। জানি না তার কারণ কী। শীতের শেষার্ধে রুটির পরিমাণ কিছুটা বেড়েছিল, কিন্তু সে বাড়তিটুকু এতই সামান্য যে লোকে ঠিক আগের মতোই মারা যাচ্ছিল। হয়ত বা তার কারণ এই যে ক্যান্টিনে দিনে দুবার ক'রে সুপ দেওয়া হত আমাদের — গরম জল, কোনো রকম ক্বাথের ছোঁয়াচ প্রায় চোখেই পড়ত না। নাকি তার কারণ এই যে আমাদের ভিটামিন-ভক্ত ডাক্তার ফার গাছের কাঁটা থেকে আরক তৈরি করে দিত আমাদের জন্যে। ঠিক জানি না, তবে সবচেয়ে বড়ো কথা বোধ হয় এই যে আমি দিন কাটাচ্ছি লোকজনের মধ্যে এবং কাজে বাঁধা পড়েছি। কাজের মধ্যে থাকলে কষ্ট কম। হাঁটা চলার শক্তি বাড়ল আমার, শুয়ে থাকতাম কম, মই ভেঙে ওঠার সময় অমন হেদিয়ে যেতাম না। সবচেয়ে আশ্চর্য, যখন আমার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ তখন কেন জানি ওই দাঁতওয়ালা আগুনে চাকাটা আমায় একেবারে রেহাই দিয়েছিল, এখন সেটা থেকে থেকে আবার ঘোরা শুরু করলে। আরো একটা আধোবিস্মৃত বৈশিষ্ট্য আমার ফিরে এসেছিল: ভয়ানক খিদে পেত আমার।

প্রথম যে দিনগুলোয় সবে অনশন সইতে শুরু করেছিলাম, তখনকার মতোই মর্মান্তিক অস্থিরতায় খেতে চাইতাম আমি। সুপ খাওয়ার পর এখন আমি জিভ দিয়ে প্লেটের তল পর্যন্ত

চাটতে রাজী। আগের মতো কম্বলের তলে ছোটো ছোটো টুকরো ভেঙে রুটি চিবুতাম না আর, দু' কামড়েই তা শেষ হয়ে যেত। কাগজ, পলেস্তারা, ইঁট সবই মনে হতে লাগল খাওয়া চলে। এই নতুন ক'রে জেগে ওঠা তীব্র ক্ষিদের তাড়নায় আমি একটা অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি।

মজুরেরা জাহাজের মধ্যে কী একটা তরল তেল ভরা গোটা দশেক বড়ো বড়ো টিনের কৌটো পায়। তবে এ তেলের কথাটা আগেও জানা ছিল: একটা কেমিকেল তেল, কী একটা রঙ গলার জন্যে কাজে লাগে। সবাই জানত ওটা খাবার জিনিস নয়, কেউ ওটা ছোঁয় নি। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কৃত হল তেলটার রঙ আর স্বচ্ছতা যেন সূর্যমুখী বিচির তেলের মতো। অতর্কিত একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল আমাদের মধ্যে, এমন কি সবচেয়ে বিচক্ষণেরাও বাদ গেল না। জোর বাড়ল গলার স্বরে, ব্যস্ত হয়ে উঠল ভাবভঙ্গি, ঝকঝক করতে লাগল চোখ, হাত আর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। লোলুপতায় আর নির্ভয়তায় পাল্লা দিয়ে আমরা তেল গিলতে থাকি। এর পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে এ চেতনা আমাদের ছিল, কিন্তু মন থেকে সেটা তাড়িয়ে পাল্লা দিয়ে বেপরোয়ার মতো মেতে উঠি আমরা। খেতে খেতে মাতাল হয়ে উঠি: চেঁচাই, হল্লা বাধাই, নিজেরা খেয়ে বাকি টিনগুলো নিয়ে যাই গাধা বোটে, যেসব কমরেড শুয়ে ছিল তাদের খাওয়াই।

প্রথম রাতেই মারা গেল নয় জন। মারা গেল প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগল, ছটফট করতে লাগল। আতঙ্কে চেয়ে দেখলাম আমরা — প্রত্যেকেই ভাবছিলাম এই বুঝি নিজেরও ওই যন্ত্রণা শুরু হয়। শোনা গেল, ও তেলে নাকি নাড়ি এঁটে গেছে। পরের দু'দিনে মারা গেল আরো ছ'জন। আর এ কয়দিন আতঙ্কে অনুশোচনায় জ্বলছিলাম আমি,

কেননা ভোজনোৎসবে সকলের সঙ্গে সমানে আমিও যোগ দিই, খেয়েছি কারো চেয়ে কম নয়। আমার পীড়িত ক্ষুদ্রান্ত্রে এক সময় রুটিন বাঁধা পথ্যের এতটুকু নড়চড় হলে সহ্য হত না, এ তেলে কিন্তু কিছুই হল না। কেন এটা ঘটল জানি না। একটা মানসিক ঝাঁকুনি ছাড়া তেলটায় আমার অপকার কিছু ঘটে নি। এবার কাজে যাবার লোকের সংখ্যা দাঁড়াল পঁচিশ জন, আমিও রইলাম তার ভেতরে।

১১

গাধা বোটটায় থাকতাম, কাজ করতাম, কিন্তু আস্যার কথা ভুলতে পারি নি। চোখ বন্ধ করলেই তাকে সামনে দেখতাম। আমার কোর্তায় সেফটি পিন এ'টে দিত সে... জল এনে দিত আমায়... আমায় সে খাড়া ক'রে তোলে যখন মনে হয়েছিল কখনো আর উঠব না, আমায় বাঁচিয়ে রাখে যখন মরতে আমি তৈরি ছিলাম... প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এই লম্বা পথটা পাড়ি দিয়ে ওর খবর করতে যাওয়ার কথাই ওঠে না। কিন্তু যত দিন কাটতে লাগল, ততই একটা অপরাধ-বোধ আমায় খোঁচাতে লাগল। আমি আছি গরমে, বিজলী আলোয়, আর ও পড়ে আছে সেই তুহিন অন্ধকার বাড়িখানায়... বে'চে আছে কি এখনো? যদি বে'চে থাকে, তাহলে হে'টে চলতে পারে কি? দোকান থেকে ওর রুটি এনে দেয় কে, কল থেকে জল? কে ওর চুল্লি ধরায়? গিয়ে আমায় দেখা করতেই হবে। বাধা হচ্ছিল শুধু একটা ব্যাপারে: খালি হাতে যেতে চাই না আমি। ওকে যদি খাওয়াতেই না পারি তাহলে কী লাভ আমার গিয়ে?..

প্রথমে ভেবেছিলাম আমার রুটি থেকে কিছু কিছু টুকরো জমিয়ে রাখব, সেগুলো নিয়ে যাব শুকিয়ে। কিন্তু শীগগিরই

ওটা ছেড়ে দিলাম। শ'তিনেক গ্রাম রুটি জমাতে পুরো সপ্তাহ লেগে যাবে। আর এখনো যদি বা সে বেঁচে থাকে, তাহলে সামনের সপ্তাহেই মারা যাবে। তাছাড়া পুরো এক সপ্তাহ যদি আমি কম খেয়ে কাটাই, তাহলে নিজেও এমন দুর্বল হয়ে পড়ব যে যেতে পারব না।

এই সময় কপাল খুলে গেল: এক এক প্যাকেট ঘনীভূত মণ্ড দেওয়া হল আমাদের — 'বাকহুইট মণ্ড'। এমন এক প্যাকেট থেকে পুরো এক প্লেট অন্ন হতে পারে। ঠিক করলাম আর দেরি না ক'রে চলে যাই। অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না: ছাপাখানাটার ভার এখনো আমার ওপরেই, সেটার দেখা শোনা করা আমার কর্তব্য। নিজের দ্বিপ্রাহরিক সুপের প্লেট শেষ ক'রে পকেটে প্যাকেটটা নিয়ে রওনা দিলাম।

সেবারকার শেষহীন শীতটা তখনো চলেছে। কিন্তু দিন ইতিমধ্যেই লম্বা হতে শুরু করেছে। তাহলেও সাঁকো পেরিয়ে প্রথমে একটা মোড়, তারপর দ্বিতীয় মোড়টা নেবার পর ফের যখন সেই বাড়িখানা, সেই ফটকটা চোখে পড়ল, ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে একটু একটু।

রাতের হাওয়ায় ঢাকা পড়া হাঁটা পথের তুষারের ওপর তাজা পায়ের ছাপ নেই একটিও। বহু জানলা থেকেই চুল্লির কালো চিমনি বেরিয়ে আছে, কিন্তু তাদের একটাতেও ধোঁয়া বেরুতে দেখলাম না। গেটের খিলানটার কাছে পরিচিতের মতো ছুটে এল শুধু হাওয়ার ঝাপট। ঢুকলাম আঙিনায়। কেউ নেই। প্রায় প্রথম তলার জানলা পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠা তুষার স্তূপগুলোর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথগুলোয় একটা পায়ের দাগও নেই। তলকুঠরিতে অন্তত একজনও আজ জল নিতে যায় নি, একি হতে পারে? নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ছাপাখানার ভেতরে ঢুকলাম। সবই অক্ষুণ্ণ আছে। কিছুই

বদলায় নি। কেবল শার্সির একটা ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রচুর তুষার কণা এসে পড়েছে, কোণগুলোয় জমে আছে আলগোছে। প্রেসের ধাতুময় অংশগুলোয় ঝিক ঝিক করছে তুষার স্ফটিক। সুমারোকভের ঘরখানায় উঁকি দিলাম। এখানেও সবই আগের মতোই, আমার না-গোটানো বিছানাটা যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনিই আছে।

এখানে আমার করবার আর কিছু ছিল না, বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করলাম। আস্যা কোথায় থাকে জানলে এবার তার কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু কখনো ওর ফ্ল্যাটে যাই নি আমি। কেমন একটা ঝাপসা ধারণা হয়েছিল যে সে ওপরের কোনো তলায় থাকে, কেননা সিঁড়ি বেয়ে ছাপাখানার সামনে দিয়ে প্রায়ই সে ছুটে যেত ওপরের দিকে। কিন্তু ওপরে কতগুলো তলা, কতগুলো ফ্ল্যাট?

কিছুই স্থির করতে না পেরে আমি আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম, ভাবলাম কারো দেখা পেলে জিজ্ঞেস ক'রে দেখব, যদি অবশ্য বাড়িখানায় অন্তত একটা জীবন্ত লোকও বাকি থাকে। কিন্তু এবারে ভাগ্যটা ভালো: উঁচু একটা তুষার স্তূপের পেছন থেকে বেরিয়ে এল একজন শীর্ণ, কুঁজো বুড়ি, মাথায় অজস্র রুমাল জড়ানো। বেশ চটপট ক'রেই সে এগিয়ে এল সোজা আমার দিকে।

বললে, 'নমস্কার। আপনি তাহলে এখনো বেঁচে আছেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি ডিসেম্বর মাসেই মারা গেছেন।'

'না, বেঁচে আছি। নমস্কার।'

'চিনতে পারছেন না? রোগা হয়ে গেছি, না?'

এই কথাগুলো শুনেই চিনতে পারলাম কে। আঙ্গেলিনা ইভানোভনা! কথা না বললে কিছুতেই চিনতে পারতাম না ওঁকে। শরতে ওঁকে দেখেছি যুবতী নারী, পুরুষ্টু চেহারা,

টোপ্যা টোবা গাল, চেঁচিয়ে কথা বলেন। যখন রোগা হতে শুরু করেন, তখন তাঁর সমস্ত স্থূলতা ধীরে ধীরে একটা শূন্য বস্তার মতো রূপ নেয়। কিন্তু এখন সে ফাঁকা বস্তাও আর নেই। শরীরের দৈর্ঘ্যটা পর্যন্ত অনেক কমে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল এই রুমালের বোঝার নিচে হাড় আর আকুঞ্চিত চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, যে মেয়েটি মাথায় শাদা রুমাল বেঁধে ছুটে বেড়াত, সেই আস্যা এখনো বেঁচে আছে কি। উনি বললেন, 'সবাই মারা গেছে, কেউ বেঁচে নেই! কোনো ফ্ল্যাটেই কেউ আর বেঁচে নেই। সব্বাই!'

সবাই যে মারা গেছে, তাতে মনে হল যেন তাঁর একটা গর্বই প্রকাশ পাচ্ছে, কেননা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। 'আমি এখনো টিকে আছি, কিন্তু আর বেশি দিন নয়... আস্যা? আস্যা তো তখন আমার কথায় কান দেয় নি। কেবলি ছুটে বেড়াত, বাড়ি বাড়ি জল এনে দিত, লোককে জোর ক'রে ওঠাত, হাঁটাত, কিন্তু খণ্ডাবে কী ক'রে? প্রথমে মারা গেল ওর মা, তারপর নিজে...'

এবার বন্দরে আমার সেই গাধা বোটটায় ফেরাই এখন বাকি। কিন্তু ইতস্তত করছিলাম আমি। আঙ্গেলিনা ইভানোভনার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আস্যাকেও তো একবার উনি বলেছিলেন যে আমি মারা গেছি... স্থির নিশ্চিত না হয়ে তো আমি ফিরতে পারি না।

আমার অবিশ্বাস দেখে আহত বোধ করলেন উনি। বললেন, 'ওদের ফ্ল্যাটের নম্বর ঊনচল্লিশ, পাঁচ তলায়। পাঁচ তলায় ওঠার ক্ষমতা যদি এখনো থাকে তাহলে উঠে গিয়ে দেখুন...'

পাঁচ তলাতেই আমি উঠলাম।

১২

'আপনি?'

'আমি, আমি!'

'সত্যি আপনি?'

'আমিই!'

'আশ্চর্য।'

'কেন?'

কথা সে বলছিল যেন প্রায় শব্দই হচ্ছে না, আমার মনে হচ্ছিল যেন সবটা শুনতে পাচ্ছি না।

'আশ্চর্য!'

ওদের ফ্ল্যাটটা অনেক কটি পরিবারের বহু ঘরের এক প্রকাণ্ড যৌথ ফ্ল্যাট। ওকে পেলাম একেবারে শেষ ঘরখানায়। ঢোকবার সময় ভেবেছিলাম দরজায় ধাক্কা দেব। কিন্তু দেখি দরজাটা বন্ধ নয়। নিজেই খুলে ঢুকলাম। বহু ফ্ল্যাটেই দরজা বন্ধ করা হত না: সে শীতে উঠে খোলাখুলি করতে যাওয়া ছিল খুবই কষ্টসাধ্য।

সিঁড়ির চেয়ে এতটুকু বেশি গরম নয় ঘরের ভেতরটা। জানলাগুলো এ'টে ঢাকা। চারিদিকে অন্ধকার। বার কয়েক আমি হাঁক দিলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। টর্চ বার করলাম আমি, ব্যাটারি প্রায় খরচ হয়ে এসেছে, আলোর যে বৃত্তটা পড়ল তা ঘোলা-ঘোলা, ক্ষীণ। একটার পর একটা দুয়োর খুললাম আমি, ঘোলা আলোটা পড়ল দেয়ালে। আসবাব যা ছিল সব চুল্লি জ্বালাতে গেছে, চুল্লির ঠাণ্ডা কালো চিমনিতে ঘরগুলো বিভক্ত। লোহার খাট পড়ে আছে, তোষকগুলো গেছে আগুন জ্বালাতে। মেঝের ওপর ঠাণ্ডায় পাথর হয়ে যাওয়া মৃতদেহে হোঁচট খাচ্ছিলাম আমি। প্রতিটি মুখে আলো ফেলে

দেখলাম, বুড়ি, শিশু... কিন্তু ও নয়। কোথায় গেল সে, কোথায়?.. মনে হল কোণের দিকে কে যেন নীরবে নড়ছে। টর্চ ফেললাম, আয়নায় আমার নিজের ছায়াটাই নড়ছিল...

একেবারে মেঝের কাছে সরু এক ফালি দিনের আলো। চুইয়ে এসেছে দরজার তল দিয়ে। ধাক্কা দিলাম দুয়োরে।

জানলাটায় পর্দা আঁটা নেই, তার ভেতর দিয়ে শীতের ঝাপসা বৈকালিক আলো ঢুকছে ঘরে। একটা ঘড়ি আছে দেয়ালে, পেণ্ডুলাম দুলছে, আর এই মৃত স্তব্ধতার মধ্যে তার টিক টিক শব্দটা শোনাচ্ছিল অসম্ভব জোরালো। ঘড়ি চলছে, তার মানে মাঝে মাঝে কেউ তার চেন ধ'রে টান দেয়। দেয়াল বরাবর দুটো খাট, একটা ফাঁকা, দ্বিতীয়টিতে এক গাদা ন্যাতাকানি। তার প্রান্তটা একটু সরিয়ে দেখি আস্যার মুখ।

আবছা অন্ধকারে ঝাপসা ধবধব করছে তার মুখ। হাঁটু গেড়ে ব'সে আমি কান নিয়ে গেলাম তার ঠোঁটের কাছে। নিঃশ্বাস পড়ছে। ঘুমুচ্ছে আস্যা।

ওকে জাগাবার ইচ্ছে হল না। ঠিক করলাম প্রথমে চুল্লি জ্বালাব, রাঁধব। কাঠ জল সবই পাওয়া গেল। আশ্চর্য লাগল, আয়োজন সবই আছে। তাহলে চুল্লি ধরায় না কেন সে, এত ঠাণ্ডা কেন ঘরখানা? বালতিতে যে জল আছে তা দু'আঙুল পুরু বরফের আস্তরে ঢাকা। চুল্লি ধরিয়ে জল গরম করতে করতে বেশ অন্ধকার হয়ে এল। খোলা দরজার সামনে উঁচু হয়ে ব'সে ছিলাম আমি, হঠাৎ টের পেলাম আমার দিকে সে তাকিয়ে আছে।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, ও চিনতে পারলে, কেবলি বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য!' অনেকক্ষণ বুঝতে পারলাম না ঠিক কোন জিনিসটা ওর কাছে আশ্চর্য লাগছে।

'সত্যি কী আশ্চর্য, তাই না? কী আশ্চর্য যে ফের জেগে উঠলাম আমি। আর আপনিও এখানে, কী আশ্চর্য। বন্দর পর্যন্ত পেঁাছিয়েছিলেন তাহলে! আমি জানতাম যে পেঁাছবেন, কিন্তু আবার দেখা হবে তা কখনো ভাবি নি... সবকিছুই কী আশ্চর্য... কী আশ্চর্য, মারা যাচ্ছি আমি...'

ভারি আস্তে কথা কইছিল সে, তাহলেও প্রতিটি কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

বললাম, 'না, তুমি মরবে না।'

'আমিও তাই বলতাম, কিন্তু সবাই তো মরল।'

'তুমি তো আমাকেও তাই বলেছিলে। দ্যাখো আমি মরি নি।'

'আমি জানতাম যে আপনি মরবেন না। আমার ভুল হয়েছিল কেবল গোড়ার দিকে। আপনাকে যখন ছাপাখানায় একা দেখলাম, তখন আর ভুল হয় নি। সে দিন থেকে কত লোকই তো মারা গেল, কী ভাবে মরেছে সব দেখেছি। যা আমার জ্ঞান তা সবই মরণ নিয়ে, জীবনের কথা কিছুই জানি না। আশ্চর্য, তাই না?'

'এক্ষুণি গরম হয়ে উঠবে,' চুল্লিতে কাঠ গুঁজে বললাম। 'এখনো তো বেশ গরম। টের পাচ্ছ না?'

ও বললে, 'না, টের পাচ্ছি না। ঠাণ্ডা গরম কিছুই আর এখন টের পাই না। আপনার গরম লাগছে, সেই আমার আনন্দ। কিছুই আর টের পাই না আমি, হাত না, পা না, যেন কিছুই নেই। আর মাথার ভেতরটা কেমন যেন সব ফরসা। কখনো আঁধার হয় না। কবে যে আঁধার হয়ে উঠবে তারই দিন গুনি।'

চুপ ক'রে রইলাম আমি, বাষ্পটাকে লক্ষ করছিলাম, পাত্রটা থেকে ইতিমধ্যেই বাষ্প উঠছে। জল যখন ফুটে উঠবে, তখন

পকেট থেকে প্যাকেটটা বার ক'রে গুলব। জাউ তৈরি হবে। যখন দেখবে আমি ওর জন্যে জাউ তৈরি করেছি তখন আর মরণের কথা বলবে না।

ও বললে, 'মা যতদিন বেঁচেছিল, ততদিন সবই পারতাম। রুটির দোকানে যেতাম, জল আনতাম, চুল্লি জ্বালাতাম। শুধু আমার জন্যেই নয়, সবার জন্যেই। গোটা বাড়ির সব চুল্লি আমার চেনা। কিছুতেই সইতে পারতাম না লোকে মরবে। চাইতাম বাঁচুক, বাঁচুক, বাঁচুক... মরার আগে মা চেঁচালে, কাঁদলে। কোনো জ্ঞান ছিল না। আমায় চিনতে পারছিল না, তাহলেও কষ্ট তো হচ্ছিল। আচ্ছা, কোনো জ্ঞান যদি না থাকে তাহলেও কষ্ট হয়? সত্যি, কোনোই চেতনা নেই, অথচ কষ্ট হচ্ছে, কী আশ্চর্য... আমার যেমন কোনোই কষ্ট হয় না... মা যখন চেঁচানি থামিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আমি তাকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেয় শুইয়ে দিই। তারপরই পড়ে যাই। পায়ের ওপর আর কিছুতেই দাঁড়াতে পারলাম না। সেখান থেকে বুক ঘষটে ঘষটে আসি। পুরো এক ঘণ্টা লেগেছিল আসতে...'

'এটা কবেকার ব্যাপার!'

'জানি না, অনেক দিন হবে।'

'গত কাল?'

'না, কাল নয়। অনেক আগে। এক সপ্তাহ হল। উহুঁ, দিন তিন কি চার। এক সপ্তাহ কেটে গেলে ঘড়িটা থেমে যেত নিশ্চয়...'

আমি ঘড়িটার দিকে চাইলাম। একটা ওয়েট প্রায় ওপরে উঠে অন্যটা নেমে এসেছে প্রায় মেঝে পর্যন্ত। নিচে নেমে আসা ওয়েটটাকে টেনে তুলে দিলাম।

'এবার আমি মরব, কিন্তু ঘড়িটা চলতে থাকবে। কী আশ্চর্য!'

'তুমি মরবে না,' থামিয়ে দিলাম ওকে, 'দেখো না, কী এনেছি তোমার জন্যে!'

পাত্রে জল টগবগ করছিল, আমি প্যাকেটটা বার ক'রে দেখালাম আস্যাকে।

'কী এটা?'

'জাউ!' বিজয় গর্বে ব'লে উঠলাম আমি।

'ও,' উদাসীন ভাবে বললে সে।

'জাউ! জাউ!' পাত্রে জিনিসটা ঢালতে ঢালতে পুনরুক্তি করলাম, 'এক্ষুণি তৈরি হয়ে যাবে। অনেকখানি জাউ।'

ও চুপ ক'রে রইল। আমার মনে হল ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকছে না অথবা বিশ্বাস করতে পারছে না।

বললে, 'আপনি নিজে না খেয়ে আমার জন্যে এনেছেন, অথচ আমার লাগবে না। আপনি খান আমি চেয়ে চেয়ে দেখব।'

'খাবে না তুমি!'

'খেতে পারি না। এই তো, দেখুন-না।'

কী আমায় ও দেখাতে চাইছে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ঠাহর হল না, কেননা অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ওকে যেটুকু দেখছিলাম সেটা খুবই ঝাপসা ভাবে।

ও বললে, 'এই যে, এইখানে হাত বাড়ান, এই তো বালিশের তলে।'

ওর বালিশের তলে হাত গুঁজে একটার পর একটা রুটির টুকরো বার ক'রে আনলাম কিছু।

'সে কী, তোমার রুটি আছে!'

'আপনি খান,' অনুরোধ করলে ও।

'আর তুমি? তুমি খাচ্ছ না কেন?'

‘পারি না। গিলতে পারি না। গিলতে যাই, সবই বেরিয়ে আসে। তার মানে কী সে আমি জানি।’

চুপ ক’রে গেলাম। আমিও জানতাম তার মানে কী।

আস্তে ক’রে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কবে থেকে শুরু হয়েছে এটা, অনেক দিন?’

‘অনেক দিন, মা তখনো বেঁচে ছিল।’

‘সেই থেকে তুমি কিছুই খাও নি?’

‘কিছু না। তাতেই বরং আমার কষ্ট নেই। এ লক্ষণ তো আমি এর মধ্যে অনেক দেখেছি। আমার আর খাওয়া চলবে না।’

আমিও এটা অনেক বার দেখেছি। জানি, লোকের পেটে যদি পাচক রস আর না থাকে, তাহলে সে আর কখনো খেতে পারবে না। তাহলেও জেদ করতে লাগলাম আমি।

বললাম, ‘কিন্তু এ যে জাউ! শুকনো রুটি তো আর নয়, নরম, গরম-গরম জাউ!..’

‘না, না, খেতে বলবেন না,’ মিনতির সুরে বললে ও।

চুপ ক’রে গেলাম আমি।

একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, শুধু চুল্লিটা থেকে লালচে আভা পড়ছিল মেঝের ওপর, দেয়ালে। নীরব হয়ে গেল আস্যা, বসে বসে আমি চেয়ে দেখছিলাম ওর দিকে. আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলাম চোখ ওর বন্ধ না খোলা। চুল্লির শোঁ শোঁ আর ঘড়ির টিকটিকের মধ্যে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ ঠাহর হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল বুঝি নিঃশ্বাস ওর বন্ধ হয়ে গেছে... হঠাৎ কী যেন বললে ও।

আমি ঠিক ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম কী বলছে।

ফের কী একটা বললে ও, কিন্তু এবারেও ধরতে পারলাম

না। বসলাম ওর বিছানার ধারে গিয়ে, মাথা ঝোঁকালাম ওর দিকে।

প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় ও বললে, 'ফোঁটা হয়ে পড়ছিল। আজ শার্সিতে রোদ এসে পড়েছিল, দেখছিলাম বরফ গলে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে আসছে ওপর থেকে নিচে। রোদে গলতে শুরু করেছে।'

বললাম, 'সামান্য। ঠিকমতো বরফ গলতে এখনো অনেক বাকি।'

'বসন্ত আসবে, কিন্তু আমি আর দেখব না... কী আশ্চর্য! আমি যখন মরে যাব, তখন তো আমার কিছুই এসে যাবে না, তাই না? যে আর নেই, তার আর কী এসে যাবে, তাই না?'

বললাম, 'তা বটে।'

'সবচেয়ে এইটেই আশ্চর্য। কিছুই এসে যাচ্ছে না, এ আমার কখনো হয় নি, কিছুতেই ভেবে পাই না, কী ক'রে আমার ঠিক তাই ঘটবে।'

বললাম, 'হ্যাঁ, তোমার কিছুই এসে যাবে না তা ঠিক। কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে, তাদের কিছু এসে যাবে না, তা নয়। শহর ঘিরে বরফের মধ্যে যে হাঁদাগুলো আমাদের টহল দিচ্ছে, তাদের সকলকে...'

'কাদের কথা বলছেন?'

'ওদের কথা বলছি।'

এই অবরুদ্ধ নগরীতে আমরা জার্মানদের কখনো জার্মান বলতাম না। বলতাম 'ওরা'।

ও মিনতি করলে, 'না না, ওদের কথা তুলবেন না, এই মুহূর্তে ওদের কথা ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

চুপ করলাম আমি। বুঝলাম, ঘৃণা নিয়ে মরতে বসা কত কষ্টের।

'ভাবতে চাই আপনার কথা, শেষ লোক যাকে দেখছি, সে তো আপনি,' স্বর ওর একেবারে ক্ষীণ, শোনবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম ওর মুখের ওপর।

'আপনি এসেছেন আমার কাছে, আমি তো আর একলা নই। ভাবতাম, সত্যিই কি কেউ আমার কাছে আসবে না? সেটা ভারি অন্যায় হবে। দেখুন, আপনি চলে এলেন। আচ্ছা বলুন, আপনি কখনো ভালোবেসেছিলেন কাউকে? আপনাকে কেউ ভালোবেসেছিল। কী সুন্দরই না হয় যদি কেউ কাউকে ভালোবাসে, ভালোবাসা পায়। বলুন না...'

কিন্তু কিছুই ওকে বললাম না। তিরিশ বছর আমার বয়স, আমিও ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি একাধিক বার।

কিন্তু কিছুই বললাম না তাকে। ভারি একটা গোলমেলে যন্ত্রণার কাহিনী। আমার দিক থেকে অপরাধ আছে তাতে, যাদের ভালোবেসেছি তাদেরও। কিন্তু ও যে এখনো কারো প্রেমেই পড়ে নি, ওকে সে সব কথা বোঝানো যে অসম্ভব।

ও বললে, 'একদিন আমি একটা ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম, আঙিনার দোলনায় ওর সঙ্গে দুলতাম। এমন জোর দুলতাম আমরা যে প্রায় তিন তলার জানলার কাছে গিয়ে পেঁছিতাম। দোলনাটা ওপর দিকে উঠতেই ও ঘেঁসে আসত আমার দিকে, টের পেতাম আমায় চুমু খেতে চাইছে... আর কখনো দোলনায় দোলা হবে না আমার। কী আশ্চর্য!'

চুপ ক'রে গেল ও। পরে কানে এল:

'ওর হয়ে আমায় একবারটি চুমু খান না।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সন্তর্পণে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকালাম আমি।

'আহ্!' ও বললে।

১৩

সকালে আমি ফিরে এলাম বন্দরে। একদিন পর গেলাম মেডিকেল পরীক্ষার জন্যে। এক্স-রে করা হল আমার, কিন্তু আলসারটা পাওয়া গেল না। উপবাসে উপবাসে সেটা সেরে গেছে। সৈন্যদলে যাই আমি। পরের শীতে অবরোধ বেষ্টনীর একটা জায়গা ছিন্ন হয়। আরো দু'বছর পরে বার্লিন অবরোধ করি আমরা, দু' সপ্তাহও সে শহর টেকে নি।

এমানুইল কাজাকেভিচ

দিনের আলোয়

১

সূর্য ওঠার সময় হয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দ্রুত দুর্নিবার হয়ে কোণে কোণে প্রবেশ করছে ভোরের ধূসরতা, সেঁধচ্ছে গেটগুলোর তলায়, মুছে নিচ্ছে দেয়াল আর দোরগোড়াকার ঘন যত ছায়া। চতুষ্কোণ শূন্যদেশ তখনো কেমন একটা অনির্দিষ্ট কুয়াশায় ভরা, তাতে মোটেই সূর্য ওঠার কথা মনে হয় না, কিন্তু শাদা হয়ে উঠতে লাগল সে কুয়াশা, গোলাপী হয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ আচমকা একটু কেঁপে উঠে হলুদ রোদে জ্বলে উঠল ওপরতলাকার শার্সিগুলোয়।

তার পেছু পেছু দেখা দিল এক সার নতুন নতুন দৃশ্য আর শব্দ। অদূরেই একটা ঘরের কাছে ঘর্ঘর করে উঠল এক প্রভাতী-বীর মোটর। দূরের কোন একটা কারখানায় বাঁশি শোনা গেল একটানা। জানলা বন্ধের শব্দ উঠল, খস খস ক'রে উঠল লোকের পায়ের শব্দ। শাদা অ্যাপ্রন পরা জমাদারেরা সশব্দে মধুর হাই তুলে স্বাগত জানালে উদীয়মান সূর্যকে। সারা রাত্রি ডিউটি দেওয়ার পর পাহারাদার তার ছোট্ট আয়নায় মুখটা দেখে নিলে, ঠিক ক'রে নিলে তার কপালের ওপর হালকা বাদামী চুলের গোছা — ভোরের আলোয় দেখা গেল সে আসলে মেয়ে। প্রথম ট্রামের তাড়া খেয়ে লাইনের ওপর মৃদু খড় খড় শব্দ তুলে উড়ে যেতে লাগল বাদামী পাতা।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটা লোক। যে রকম উৎসুক হয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল তাতে বোঝা যায় নতুন এসেছে। গায়ে তার সৈনিকের উর্দি, পিঠে একটা পুরনো থলে, ঘামে বৃষ্টিতে রং তার বাদামী হয়ে উঠেছে। লোকটার গোটা

চেহারা থেকে সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধের কথাই মনে পড়ে যায়, শুধু মাথার টুপিটা, সাধারণ একটা মজদুরী টুপি, একেবারে আনকোরা — শান্তির সময় যে শুরু হয়েছে তার একমাত্র চিহ্ন এইটেই। কেমন যেন খাপ খাচ্ছিল না টুপিটা, আর লোকটার মুখখানা — গাঁট্টাগোঁট্টা মুখ, নীল চোখ, প্রায় ফোলা ফোলা ভালোমানুষী ঠোঁট — এ মুখের ফৌজী আদল অনেকটাই মুছে গেছে ঐ টুপিটার জন্যে।

মন দিয়ে একটু যেন বা অবাক হয়েই লোকটা তাকিয়ে দেখছিল মস্কোর সজীব হয়ে ওঠা রাস্তা। রাস্তা ধোবার মস্ত এক গাড়ি পেরিয়ে গেল তার পাশ দিয়ে, একপশলা জলের কণা ছিটিয়ে দিল তার ওপর। লোকটা হেসে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে হাত নাড়লে ড্রাইভারের দিকে। এতে তার স্বচ্ছন্দ ভাবটাই ফুটে উঠল — সে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শহরবাসীর শৈথিল্যের কোনো মিল নেই — এ বরং হাজার হাজার পথ পাড়ি দেওয়া সৈনিকের স্বাচ্ছন্দ্য।

লোকটা যে ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটছিল না, সোজাসুজি রাস্তা দিয়েই হাঁটছিল, এতেও প্রকাশ পাচ্ছিল তার সৈনিকী ধাত, দল বেঁধে হাঁটার অভ্যেস; সৈনিক যে নিজেকে কখনো একলা ভাবতে পারে না, পঙক্তির এক অংশ সে, তার পক্ষে ফুটপাথ বড়োই সংকীর্ণ পথ।

সন্দেহ ছিল না যে লোকটা এখানকার নয়, রেল কামরার বেঞ্চে যে ঘুমিয়ে এসেছে তার ছাপ রয়েছে তার দলা-মোচড়া উর্দিটায়; খুব সম্ভব মস্কোয় এই ওর প্রথম আসা, তাহলেও কিন্তু কোনো রকম বিব্রত ভাব ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না, অবিরাম জায়গা বদলের সামরিক অভ্যাসে অধিকাংশ প্রাক্তন সৈন্যের মতোই তার ভেতরেও মফস্বলী সংকোচ, গ্রাম্যতা বা গতির আড়ষ্টতা — কিছুই আর নেই। মোড় এলে সে দাঁড়াচ্ছিল,

রাস্তার নামটা দেখে নিয়ে সমান পদক্ষেপে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছিল সামনে। মনে হবে যেন কেউ তাকে যাবার পথটা বলে দিয়েছে খুঁটিয়ে, সেও যেন খেলার ঝোঁকেই রাস্তার মিলিশিয়া বা পদচারী কাউকেই কোনো প্রশ্ন করছে না।

একমাত্র যে লক্ষণটায় ওকে নিঃসন্দেহে গাঁয়ের লোক ব'লে চেনা যায় সেটা ওর অমায়িকতার জন্যে: ইতিমধ্যেই মেরামতের জন্যে যেসব মজুর জুটেছে তাদের ও ভদ্রতা দেখিয়ে ফুর্তি ক'রে নমস্কার জানাচ্ছিল।

এই নমস্কার কথাটায়, এবং বিশেষ ক'রে তার উচ্চারণের ভঙ্গিতে রুশী গ্রাম্যজনের স্বাভাবিক অমায়িকতা এবং মজুরদের মেহনত সম্পর্কে শ্রদ্ধা, দুই-ই ধরা পড়ছিল। এরা তো আর যে কোনো একটা বাড়ি মেরামত করছে না, মেরামত করছে শহরের বাড়ি, মস্কোর বাড়ি — দূরপ্রসারিত রাষ্ট্রের নানা কোণে কোণে লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের কাছে যে শহর একটা গর্ব আর স্বপ্নের বস্তু।

এই ভাবেই গোটা কিরভ রাস্তা ও পাড়ি দিয়ে এসে পেঁছল জের্জিনস্কি চকে। ছোটো বড়ো নানা রাস্তা এসে মিলেছে এইখানটায় — এবার কোন দিকে যেতে হবে সে কথাটা এখানে জিজ্ঞেস করা যেত, কিন্তু লোকটা মিনিট খানেকের জন্যে কী ভেবে সামনের ফুটপাথে উঠে তির্যক ভাবে আরো একটা রাস্তা পেরিয়ে কী সব গলি ঘুঁজির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছল আরো একটা স্কোয়ারে। এইখানে থামল সে, ভাবল কোন দিকে এগুবে, কিন্তু হঠাৎ স্কোয়ারের দৃশ্যটায় এবং স্কোয়ার বরাবর উঁচু লাল পাথরের দেয়ালটায় সুগম্ভীর অতি পরিচিত কী যেন একটা চোখে পড়ল তার। তারপর নজর গেল লেনিন ম্যুজোলিয়মের দিকে, বুঝতে পারল কোথায় এসে পড়েছে। গা শির শির ক'রে উঠল তার, কেননা রেড স্কোয়ার

নামে একটা স্কোয়ার এবং তাতে কী কী জিনিস আছে সব আগেই বিশদে জানা থাকলেও তার এইটেতে চমক লাগল যে সিনেমায় এবং হাজার হাজার ছবি, ফোটোগ্রাফ, কার্ড এবং সংবাদপত্র থেকে যা ধারণা হয়, রেড স্কোয়ারটা আসলেও হুবহু ঠিক তেমনি দেখতে। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তার অবাক লেগেছিল এইজন্যে যে এখানে সে এসে পড়েছে ঠিক যে কোনো একটা স্কোয়ারে আসার মতো ক'রে। মস্কো সম্পর্কে এবং তার পূতঃপবিত্র রেড স্কোয়ার সম্পর্কে তার যে গর্ব, তাতে এখানে ঠিক এমন ভাবে নয়, যেন একটু বিশেষ আয়োজন ক'রে, হয়ত একটা বিশেষ টিকিট কেটে আসতে পারলেই সে খুশি হত।

'দ্যাখ দিকি, কোথায় তুই এসে পৌঁছলি আন্দ্রেই স্লেপৎসভ,' নিজের মনেই ফিসফিস করলে সে, পকেট থেকে ডান হাত বার করলে সেলাম জানাবার জন্যে, কিন্তু বাঁ হাতটা পকেটেই রইল। সৈনিকের পক্ষে এভাবে সেলাম দেওয়া আশ্চর্য — কিন্তু বাঁ হাত ওর ছিল না, ছিল শুধু আস্তিনটা।

রেড স্কোয়ারে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে রইল আন্দ্রেই স্লেপৎসভ তারপর ফিরল ডান দিকে। অখোৎনি রিয়াদের কাছে ও প্রথম পথ জিজ্ঞাসা করলে মিলিশিয়ার লোকটির কাছে, কোন দিকে যেতে হবে সে তাকে দেখিয়ে দিল। আর যেতে ওকে হবে পুশকিন চক পর্যন্ত, সেখানে বুলভারে বাঁক নিয়ে কিছুটা হাঁটার পর তবে মিলবে তার প্রার্থিত গলিটা।

কিন্তু তখনো খুবই সকাল, লোকের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়া চলে না। সেইজন্যেই গলিটায় না ঢুকে বুলভারেই একটা বেঞ্চির ওপর বসল স্লেপৎসভ। শীগগিরই ঘুম এসে গেল তার।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ন'টা। চারদিকের অবস্থা একেবারে বদলে গেছে, চেনা যায় না। ভোরবেলার সূর্যের রোদে চিৎ হয়ে অবাধে পড়ে থাকা ফাঁকা, ফাঁপা রাস্তাগুলো পরিণত হয়েছে এক ধ্বনিত, বিচিত্র মানুষের মৌচাকে। কলরোল, পদধ্বনি, ঘস ঘস খস খস, মানুষের কণ্ঠ আর মোটরের সংক্ষিপ্ত হর্ণে এই বিরাট মেলাটা যেন ভরে উঠেছে একেবারে, ধেয়ে যাচ্ছে তা, নেচে যাচ্ছে, নিজের বিপুলতার ধ্বনি-বহুলতা ও বৈচিত্র্যের পরিতৃপ্তিতে ডাক ছাড়ছে, ঘোঁৎঘোঁতিয়ে উঠছে! ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে স্লেপৎসভের চোখে ধাঁধা লাগল। সারি সারি শিশুদের পেরাম্বুলেটর আর আয়াদের মাঝখান দিয়ে পথ ক'রে আনন্দে দিশাহারার মতো সে বাঁক নিলে গলিতে, তারপর যে বাড়িটি তার দরকার তার আঙিনায়।

মস্ত ইঁটের বাড়ি, চারিদিকে বহুতলা দেয়ালের মাঝখানে আঙিনা, মস্কোয় সাধারণত যা দেখা যায়। তবে এখানেও ঘাস আর ফুলগাছ ভালোবাসে লোকে। আঙিনার মাঝখানে ছোট্ট একটু বাগান, ফুলগাছের কেয়ারি, ফুল সব ইতিমধ্যে ঝ'রে গেলেও সবুজ ঘাস এখনো টিকে আছে। ঘাসগুলোর দিকে চেয়ে চোখ মটকাল স্লেপৎসভ, যেন ইঁট, কাচ আর পিচের মাঝখানে এক চেনা দোসর পেয়েছে সে।

অসংখ্য জানলা আর ঝুলবারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে হঠাৎ অস্থির বোধ করতে লাগল স্লেপৎসভ। উর্দির সমস্ত আংটাগুলো বন্ধ ক'রে সে এগুল বাড়ির নানা দরজার একটার দিকে, মাথায় শাদা রুমাল বেঁধে চশমা চোখে এক বুড়ি সেখানে ব'সে ব'সে মোজা বুনছিল। তার এই সরল গ্রাম্যজনসুলভ বৃত্তিটা দেখে গাঁয়ের কথা মনে পড়ল স্লেপৎসভের, তাই সোজাসুজি বুড়ির কাছেই হাজির হল সে:

'আচ্ছা, নেচায়েভা এখানে কোথায় থাকে, বলো তো দিদিমা?'

চোখ তুললে বুড়ি, কিন্তু চট ক'রে জবাব দিলে না, প্রায় অভদ্র এই প্রশ্নকর্তাকে নজর করতে লাগল কড়া চোখে। মৃদু হেসে স্লেপৎসভ বললে:

'কানে শুনতে পাও তো দিদিমা, নাকি না?'

এমন অশোভন প্রশ্নে দিদিমা ঠিক করেছিল চটে উঠবে, কিন্তু হঠাৎ নজর গেল ওর শূন্য আস্তিনটার দিকে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিষাদের ছায়া ফুটল তার মুখে, নরম হয়ে বললে:

'চলে যাও বাছা ওই সামনের দিকে, ছয় নম্বর গেটে তিন তলায়।'

ধীরে ধীরে সেই দিকে এগিয়ে গেল স্লেপৎসভ, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। দম নিলে তিনতলায় উঠে, উর্দির আংটাগুলো একবার পরখ ক'রে নিয়ে ঘণ্টি দিলে। দরজা খুলে গেল।

২

বছর বারো বয়সের একটি বিবর্ণ ছেলে এসে দাঁড়াল দরজায়। চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইল সে, আগন্তুক কী বলে তারই প্রতীক্ষায়। আগন্তুক কিন্তু নীরবে কেবল চেয়ে দেখতে লাগল ছেলেটিকে। অসহায় কেমন একটা কোমলতা ফুটে উঠল সৈনিকের মুখে।

'মানে আমি হলাম আন্দ্রেই স্লেপৎসভ,' শেষ পর্যন্ত বললে ও, গলার স্বরটা স্পষ্টই কাঁপছিল, 'এই আর কি ব্যাপার।'

স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে ও অপেক্ষা করতে লাগল, মনে হয় ভাবছিল তার নাম আর উপাধি শুনেই

ছেলেটির কিছু একটা মনে পড়ে যাবে। ছেলেটি কিন্তু চুপ ক'রেই আছে, চোখে তার অনাত্মীয় একটা প্রতীক্ষার দৃষ্টি। ঈষৎ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই তখন আচমকা জিজ্ঞেস করলে স্লেপৎসভ:

'তোর নাম তো ইউরা?'

'হ্যাঁ,' অবাক হয়ে বললে ছেলেটি।

'হ্যাঁ রে ইউরা,' এবার একটু ফুর্তিতেই বললে স্লেপৎসভ, 'তোকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি, না চেনার আছে কি... আর দ্যাখ, তুই আমায় চিনতে পারলি না। তা চিনতে পারবি কোথা থেকে, জীবনেও তো আমায় দেখিস নি,' অল্প একটু উদ্বেগের হাসি হাসল সে, 'তা কী রে, এমনি ক'রে তুই অতিথ বরণ করিস নাকি, ঘরে ডেকেও বসাচ্ছিস না? আর আমি ইদিকে তোর প্রায় সাতদিন হল আসছি তো আসছিই, মানে ঢের দূর থেকে রে। সাইবেরিয়া থেকে। ক্রাস্নয়ার্স্ক শহরের নাম শুনেছিস? তা সেই একেবারে ক্রাস্নয়ার্স্কের কাছ থেকেই তোর এখানে অতিথ এলাম রে ইউরি ভিতালিয়েভিচ...'

অনিশ্চিতের মতো বললে ছেলেটি:

'আসুন, আসুন।'

করিডরের ভেতর দিকে পেছিয়ে গিয়ে সে আরেকটা দরজা খুললে। পেছু পেছু স্লেপৎসভ যেখানে গিয়ে উঠল সেটা একটা অনতিবৃহৎ চৌকো মতো ঘর, মনে হয় খাবার ঘর আর ছেলেদের ঘর দু'কাজই তাতে চলে। বাসন কোসনের একটা আলমারি আছে সেখানে, খাবার টেবল আছে, সেই সঙ্গে আছে ছোট্ট একটা খাট, আর বইপত্র স্কুলের খাতা, গ্লোব ইত্যাদি সমেত কতকগুলো তাক। অয়েল ক্লথে ঢাকা টেবলটার ওপর ঠাণ্ডা হচ্ছে এক গেলাশ চা, এক টুকরো রুটি পড়ে আছে, প্লেটে হলদে হচ্ছে খানিকটা মাখন। বোঝা যায়

স্লেপৎসভের ঘণ্টি শুনে প্রাতরাশ ফেলেই উঠে এসেছিল ছেলেটি। টেবলটার দিকে তাকিয়ে স্লেপৎসভ বললে:

'ও, তুই তাহলে খেতে বসেছিলি। তা বোস না, লজ্জার কী আছে। আর মা কোথায়?'

'কাজে গেছে।'

'ওলগা পেত্রভনা তাহলে কাজে গেছেন?' ছেলেটির মাকে সে যে তার নাম পিতৃনাম ধ'রেই ডাকছে তাতে স্পষ্টতই বেশ একটা গর্ব ফুটে উঠেছিল তার কথায়, যেন আরো একবার এতে ক'রে দেখিয়ে দেওয়া হল যে সে যাদের কাছে এসেছে তাদের সব খবরই সে জানে, 'বটে, বটে... তা আর উপায় কী, অপেক্ষা করতেই হয়...' কথাটা বললে সে খানিকটা অর্থপূর্ণ ভাবে, নিজের সম্পর্কে কেমন একটা রহস্যের ভাব ফুটিয়ে, কিন্তু তার খোলা মেলা স্নেহপ্রবণ মুখের সঙ্গে সেটা মোটেই মানাল না। দরজার কাছে তার জিনিসপত্রের থলি এবং থলির ওপর নিজের উর্দি আর টুপিটা খুলে রেখে সে চেয়ারে বসল। তারপর গ্লোব আর বইপত্রে ভরা তাকগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখদুটো ওর একটু কড়া হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলে:

'তা পড়াশুনা কেমন চলছে?'

একটু দায়সারা গোছের জবাব দিলে ছেলেটি:

'এক রকম,' পাতলা মুখখানা ওর মুহূর্তের জন্যে কালো হয়ে উঠল, তারপর নিজের ওপর জোর খাটিয়েই যেন সে যোগ করলে, 'দুটো বিষয়ে মোটামুটি পাশ, অন্য বিষয়গুলোয় প্রথম বিভাগের নম্বর।'

'আচ্ছা,' বললে স্লেপৎসভ। ছেলেটির দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে দেখল সে, তারপর খানিকটা ভেবে নিয়ে ঠিক করলে যে দুটো বিষয়ে ছেলেটা কম নম্বর পেয়েছে তার জন্যে আর

বকুনি দেবে না। শুধু আরেকবার পুনরুক্তি করলে, 'আচ্ছা!' এবং যোগ করলে, 'তোর বাপ ছিল পণ্ডিত লোক, তোকেও পণ্ডিত হতে হবে, বুঝেছিস, বিদ্বান, মানে এক কথায়, সোভিয়েতী লোক।'

সৈনিকের হিতোপদেশে ক্ষীণ হাসি ফুটেছিল ছেলেটির মুখে, সে হাসিতে গ্রাম্য লোকের সাদামাটা চিন্তাধারার প্রতি শহুরে উন্নাসিকতা খানিকটা না ছিল নয়। অন্তত এ হাসিটা স্লেপৎসভের ভালো লাগল না। গোপন চিন্তা ধরতে পারার সূক্ষ্ম পটুতা জাহির ক'রে সে অসন্তুষ্টের মতো সোজাসুজি ছেলেটার চোখের দিকে কড়া ক'রে চাইলে। ইউরা তাতে বিব্রত বোধ ক'রে মন দিলে তার প্রাতরাশে।

আনাড়ীর মতো ব'সে আস্তে আস্তে চা আর রুটিটা নিজের দিকে টেনে আনছিল ছেলেটা, স্লেপৎসভ ততক্ষণে কোণের দিকে একটা গদি আঁটা আরামকেদারায় ব'সে — জায়গাটা বেশ পরিপাটী ও আধা-অন্ধকার — মন দিয়ে লক্ষ করছিল ইউরাকে, তার প্রতিটি ভাবভঙ্গিই যেন সে খুঁটিয়ে দেখছিল; তার মাথা ঘোরাবার ঢঙে, তার ঠোঁট আর থুতনির রেখায় এবং তার সমস্ত হাবভাবে কী যেন একটা চেনা জিনিস খুঁজছিল সে। এবং সবকিছুতেই, বিশেষ ক'রে তার আনমনা বিষণ্ণ দৃষ্টির মধ্যে সেটা আবিষ্কার ক'রে স্লেপৎসভ পরিতৃপ্তের মতো মাথা নাড়লে। শুধু ছেলেটির বসার ভঙ্গিতে এবং সমস্ত আচরণের মধ্যে একটা উদ্বেগ লক্ষ ক'রে অবাক লাগছিল তার। বলাই বাহুল্য সেই মুহূর্তে ইউরা যে ঠিক কী ভাবছিল সেটা তার জানার কথা নয়। ইউরা ভাবছিল, দূর থেকে এসেছে লোকটা, খেতে ডাকতে হয়, অথচ টেবলে সবই বাড়ন্ত, চিনি নেই, আছে শুধু ছোট একটা লজেন্স, এক গেলাশ চায়ের জন্যেও তাতে কুলাবে না — র‍্যাশন কার্ডে যেটুকু

মেলে, সবই সেই তিলার্ধ মাত্রায়। লোককে খেতে ডাকতে পারছে না ব'লে লজ্জা হচ্ছিল তার, সেই সঙ্গে নিজের কাঙালে প্রাতরাশটুকু ভাগাভাগি করতেও কষ্ট হচ্ছিল, ভারি খিদে পেয়েছিল তার, তাই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ব'সে ব'সে সে ভাবছিল কী করা যায়। শেষ পর্যন্ত আস্তে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রুটি আর মাখনটুকুর দিকে বহুক্ষণ বিদায়ের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর সে স্লেপৎসভের দিকে গম্ভীর চোখ তুলে বললে:

'আপনিও এসে বসুন। একসঙ্গেই খাই।'

সিদ্ধান্তটা বিনা অন্তর্দ্বন্দ্বে আসে নি, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ইউরা স্পষ্টই উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল তার। আর ওর মধ্যে এই বদলটা লক্ষ ক'রে স্লেপৎসভও চাঙ্গা হয়ে উঠল, কেদারা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে:

'আমার অবিশ্যি খুব খিদে নেই, তা তুই যখন ডাকছিস তখন আপত্তি করব না। তবে রাগ করিস না কিন্তু, তোর সঙ্গে আমার নিজের দু'মুঠোও যোগ করব।'

থলিটার কাছে গেল স্লেপৎসভ তারপর একখান হাত দিয়েই নিপুণ ভাবে সেটা খুলে নীরবে একটার পর একটা মোড়ক রাখতে লাগল টেবলে। প্রতিটি মোড়কই যেমন সুস্বাদু, তেমনি শাঁসালো; ধীরে ধীরে সুখাদ্যের একটা স্তূপ জমে উঠল টেবলে, ধূম্রপক্ক মাছ, শুঁটকী মাছ এবং কয়েক চিলতে ভাজা মাংসও ছিল তার মধ্যে।

দেখে ছেলেটার নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্লেপৎসভের পক্ষ থেকে বার তিনেক সাধাসাধির পরই এ ভূরিভোজনে বসা তার পক্ষে সম্ভব হল — কোটা-বহির্ভূত শাঁসালো ঝাঁঝালো খাবার, একটা সুদূর উদ্দাম বন্য অঞ্চলের

গন্ধ লেগে আছে তাতে, লোকে যেখানে দোকান থেকে মাছ কেনে না, নদীতে ধরে, মাংস জোগাড় করে বন্দুক দিয়ে, ছোরা দিয়ে। খেয়ে যেন মাতাল হয়ে উঠল ইউরা, সব মাতালের মতোই বক বক শুরু করলে। প্রাতরাশের টেবলে সে তার সুখ দুঃখের অনেক খবরই জানিয়ে দিতে পারল স্লেপৎসভকে, জানালে ভূগোল শিক্ষিকার সম্পর্কে তার ক্ষোভ, নম্বর দেয় সে অন্যায় ক'রে, জানালে কোন এক বন্ধু ফেদিয়ার সঙ্গে তার ঝগড়ার বিশদ বিবরণ, কত কী সে খুঁজে পেয়েছে, কত কী তার হারিয়ে গেছে তার নানা কাহিনী, একা একা অথবা ঝাঁক বেঁধে রাস্তার প্রতিটি হল্লায় নাক গলিয়ে এবং একতলার প্রতিটি খোলা জানলায় উঁকি দিয়ে মহানগরের সরণি জীবনে অলস দৃষ্টি বুলিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেরিয়ে বেড়াবার কত ইতিহাস।

মন দিয়ে শুনলে স্লেপৎসভ, মাঝে মাঝে মাথা নাড়লে তার মনোযোগের প্রমাণ অথবা অনুমোদনের লক্ষণ হিসাবে। তারপর জিজ্ঞেস করলে:

'জীবনে তুই কী হতে চাস বল তো?' এবং সর্বশক্তিমান যে ব্যক্তির ওপর সবকিছু নির্ভর করছে তার উপযুক্ত সুরে যোগ করলে, 'সংকোচ করিস না কিছু, বল আমায়।'

এমন সুখাদ্যের পাহাড় যে টেবলের ওপর জড়ো করতে পারে তাকে বোধ হয় স্রেফ সর্বশক্তিমান বলেই ইউরার মনে হয়েছিল। সে যাই হোক, ইউরা কিন্তু খোলাখুলিই কবুল করলে সে ফাইটার-পাইলট হতে চায়। তার প্রতি এমন আস্থা দেখালে স্লেপৎসভ যে ইউরা তার সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে অবিচল স্বপ্নের কথাটি প্রায় বলেই বসেছিল: প্রতিটি ছেলেরই, রুগ্ণ, দুর্বলস্বাস্থ্য অথচ (হয়ত সেইজন্যেই) আত্মাভিমানী বহু ছেলেই যে স্বপ্নটিকে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখে, হৃদয়ের

গোপন গহীনে লালিত ক'রে চলে সেই অতি সাধারণ অতি মধুর স্বপ্ন: শক্তিমান হব, দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো পালোয়ানের চেয়েও শক্তিমান। এবং সেটা সম্মান বা যশের জন্যে নয়। এতেও সে সায় দিতে রাজী যে তার গায়ের জোরের কথা নয় ততদিন পর্যন্ত কেউ না জানল, যতদিন না সে প্রথম একটা অন্যায় কাজ দেখছে: বড়োর হাতে ছোটোর নির্যাতন, প্রবলের কাছে দুর্বলের, দুরাত্মার কাছে মহাত্মার, ধনীর হাতে দরিদ্রের, বহুর কাছে একের।

স্লেপৎসভের দিকে চোরা চাউনিতে চাইলে ইউরা, তার দৃষ্টির কোমলতাও সে লক্ষ করলে, তাহলেও নিজের স্বপ্নের কথা এই সাইবেরিয়াবাসীকে জানাবার সাহস হল না তার, মোটের ওপর এটুকু উপলব্ধি তার ছিল যে এই ছেলেমানুষী স্বপ্নটা এতই অপরূপ যে বাস্তব হবার নয়। জীবনে পেটপুরে যে ছেলে খেতে পেয়েছে কদাচিৎ, তার বিষণ্ণ সাংসারিক জ্ঞান নিয়ে সে ভাবলে আজ সকালে সে যেমন খেয়েছে রোজ তেমন খাওয়া জুটলে হয়ত সত্যিই সে পালোয়ান হয়ে উঠতে পারে। এই ভাবনার সূত্র ধ'রে তার হঠাৎ মনে হল অপরের খাবারে সে বোধ হয় বাড়াবাড়ি লোভ দেখিয়েছে, তাই পরবর্তী মাছের টুকরোটার দিকে হাত বাড়াবার বদলে সে এক মুহূর্ত দ্বিধা ক'রে চেয়ারের পিঠে হেলান দিলে।

'সে কী ইশকুলে যাবার সময় হয়ে গেল নাকি?'

'না, আমি যাই দ্বিতীয় শিফটে,' জবাব দিলে ছেলেটি, 'এখন ইশকুলের পড়া তৈরি করব।'

'ঠিক কথা,' সায় দিলে স্লেপৎসভ, 'আমি তোর ব্যাঘাত করব না। তুই পড়া করবি, আমি বসে থাকব এই কোণে।'

তবে সঙ্গে সঙ্গেই সে বসলে না। আস্তে আস্তে গোটা ঘরখানা সে চক্কর দিলে, জিনিসপত্রগুলো দেখলে মন দিয়ে। দেয়ালে

দুটি মহিলার ছবি দেখে জিজ্ঞেস করলে কে তারা। এদের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মারি কুরি এবং অন্যজন বিখ্যাত অভিনেত্রী কমিসারজেভস্কায়া — এই কথা শুনে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে তাদের দিকে। তারপর পাতা ওলটালে দেয়াল ক্যালেন্ডারের, গ্লোবটাকে একটু ঘোরালে এবং শেষ পর্যন্ত বসলে সেই আগের আরামকেদারাটাতেই। এক হাতে নিপুণ ভাবে হাঁটুর ওপর মাখোরকার সিগারেট পাকালে সে, কিন্তু বোধ হয় ভাবল ঘরের মধ্যে নিশ্চয় সিগারেট খাওয়া উচিত নয়; খেতে হলে বাইরে, অন্তত করিডরে যাওয়া উচিত, কিন্তু উঠতে আলস্য লাগছিল। ধীরে ধীরে সযত্নে কী লিখছিল ইউরা। দেয়ালের ঘড়িতে অনেকক্ষণ ধরে শ্রুতিমধুর ঘণ্টা বেজে গেল। ফের ঘুম পেল স্লেপৎসভের। ঘুমের সঙ্গে যুঝলে সে, ভেবেছিল ইউরাকে ইশকুল পর্যন্ত এগিয়ে দেবে, কিন্তু লোকে ঠাসা কামরায় বিনা রিজার্ভ সিটে পাঁচ দিন সফরের ক্লান্তি ওকে আচ্ছন্ন করল, শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল স্লেপৎসভ — সকালের মধ্যে এই দ্বিতীয় বার।

৩

স্লেপৎসভ স্বপ্ন দেখছিল যেন সে বসে আছে খড় বিছানো এক ট্রেঞ্চে, মাখোরকা খাচ্ছে, পাশেই ঝিমুচ্ছে ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন নেচায়েভ। নেচায়েভের ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখের দিকে, তার ভেজা, ফুলে ওঠা উর্দিটার দিকে মন দিয়ে চেয়ে দেখছে স্লেপৎসভ। দীর্ঘ চোখের পাতা তার নামানো, বৃষ্টির জলে ভেজা, মুদে এসেছে আলগোছে। ক্যাপ্টেনকে জাগিয়ে তোলা দরকার, কেননা অতি জরুরী কী একটা খবর জানাতে হবে তাকে। জানাবার দায়িত্বটা তারই, সে কথা ভেবে

ছটফট করছে স্লেপৎসভ, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না কী জানাবে। হঠাৎ পাশেই শিশুর কান্না শুনল সে, অমনি মনে পড়ে গেল কী জানাতে হবে ক্যাপ্টেন নেচায়েভকে। হ্যাঁ, তার অন্তিম আদেশ সে পালন করেছে, মস্কোয় এসেছে সে, তাদের বাড়িতে, যে কথা জানাবার ছিল তা জানাবে। হঠাৎ স্লেপৎসভের খেয়াল হল সে কি, নেচায়েভ তো পাশেই জ্যান্ত বসে আছে, সুতরাং অন্তিম কথা সে কিছু বলতে পারে না। অমনি ভয়ানক আতঙ্ক হল স্লেপৎসভের, ইচ্ছে হচ্ছিল নেচায়েভকে জাগিয়ে দেয়, কিন্তু ভয় হল একবার যখন অমনি ভাবেই সে মারা গিয়েছিল তখন জাগাতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ম'রে যাবে। স্বপ্নের মধ্যে স্লেপৎসভ টের পাচ্ছে যে এসবই একটা বাজে 'ধন্ধ', একটা গোলমাল, মনে হচ্ছে নেচায়েভ হয়ত বা মরে নি, নেহাৎ কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে মরেছে এবং মরবার সময় তাকে তার বাড়িতে যেতে ব'লে গিয়েছে। এমন কি যুদ্ধ যে শেষ হয়ে গেছে সেটাও শুধু এই ট্রেণের মধ্যে স্লেপৎসভের একটা স্বপ্ন মাত্র। ব্যাপারটা কী যে ভীষণ গোলমেলে সেটা টের পাচ্ছে স্লেপৎসভ, কিন্তু কিছুতেই সে গোলমাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিন্তু যেটা সত্যি সত্যিই বাস্তব ব'লে মনে হচ্ছে সেটা ওই শিশুর কান্না। আর স্লেপৎসভের তাতে ভারি অবাক লাগছে: এখানে শিশু এল কোথা থেকে। কাছেই হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে হাঘরে পলাতকেরা। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল স্লেপৎসভ, অল্প কিছু দূরে ছোটো একটা শহর, হলদে আর গোলাপী রঙের বাড়িতে রঙচঙে, বোঝা যায় রুশী শহর নয়, হাঙ্গারির সেই সব শহরেরই একটা নিশ্চয়, যাদের নাম উচ্চারণ করা শক্ত — শত্রুর বিস্ফোরক গুলিতে তার হাত উড়ে যাওয়ার আগে এরকম শহর সে কম দেখে নি।

এই মুহূর্তে চোখের পাতা কেঁপে উঠল নেচায়েভের, বহু কষ্টে চোখ মেলল সে। বড়ো বড়ো চোখ তুলে সে শান্ত, সর্বদ্রষ্টা এবং কেমন যেন স্থির পরিতুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্লেপৎসভের দিকে।

হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে ঘুম ভেঙে গেল স্লেপৎসভের। শিশুর কান্নাটা মনে হল স্বপ্নের চেয়েও জোরে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তখনো স্বপ্নের ঘোর তার কাটে নি, কিছুক্ষণ পরে যখন সে পুরোপুরি সজ্ঞান হয়ে উঠল, টের পেল কোথায় রয়েছে, তখন সুখানুভূতির এমন একটা মোচড়ে হৃদয় তার মুচড়ে উঠল যা আগে কখনো সে অনুভব করে নি।

ইউরা ঘরে নেই। টেবলের ওপর তার খাতাপত্রও দেখা যাচ্ছে না কিছু। সাইবেরিয়ার খাবারগুলো খবরের কাগজের ওপর ভালো ক'রে পেতে আরো একটা কাগজ দিয়ে ঢাকা দিয়ে টেবলের সেই কোণটার দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে যেটা স্লেপৎসভের সবচেয়ে কাছে। শিশুর কান্নাটা আসছিল পাশের ঘর থেকে এবং অচিরেই অপরাধী নিজেই এসে দেখা দিল। যুবতী বয়সের একটি পীনস্তনা মেয়ে, মাথায় খড়-রঙা এলো চুল, বড়ো বড়ো লাল হাতে একটি কচি মেয়ে। একটি হাত মেয়েটির মাথার তলায় এবং আরেকটি তার পাছার নিচে দিয়ে চেটোর ওপর খুকিটিকে আস্তে ক'রে দোলাচ্ছিল সে। বাচ্চাটা ন্যাংটা, গোলগাল, চ্যাঁচাচ্ছে, ফুলের পাপড়ির মতো ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুল সমেত হাতের মুঠোটা চাইছে মুখের মধ্যে পুরতে।

ঈষৎ প্রসারিত হাতের ওপর খুকিকে নাচাতে নাচাতেই মেয়েটি সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করলে:

'দূর থেকে আসছেন বুঝি?'

'অনেক দূর থেকে,' জবাব দিলে স্লেপৎসভ, তারপর নিজেই প্রশ্ন করলে:

'অমন চ্যাঁচাচ্ছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না। কত কী ক'রে দেখলাম...'

'খিদে পেয়েছে হয়ত?'

'উহুঁ... খানিক আগেই খেয়েছে। উগরে পর্যন্ত দিলে। পেট কামড়াচ্ছে হয়ত, কে জানে। বলতে তো আর পারে না।'

স্লেপৎসভ এগিয়ে গেল শিশুটির কাছে। অপরিচিত এই মুখখানা তার বিহ্বল চোখে ধরা পড়তেই মেয়েটি ফোগলা মুখে একগাল হাসলে, অবারিত ক'রে দিলে তার নিখুঁত গোলাপী মাড়ি। এর ঠিক এক মিনিট আগেও যে মেয়েটি অমন পরিত্রাহি চিৎকার করছিল, আমাদের এই অভিশপ্ত মর্ত্যের যত কিছু শোক তাপে ছোট্ট হৃদয়খানা যে ওর একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা এখন বিশ্বাসই হবে না। এ সাফল্যে ঈষৎ গর্বভরে এবং সেই কারণেই মেয়েটির প্রতি স্নেহে আরো উথলে উঠে স্লেপৎসভ তার ঠোঁট দিয়ে চু-চু করলে, জিভ দিয়ে চুমকুড়ি কাটলে, চোখ ঘোরালে গোলগোল ক'রে অর্থাৎ মানব মুখের অল্প যে কটি ভাবভঙ্গি সম্ভব তার কিছুই বাদ দিলে না। বলতে কি সে তখন এইজন্যেও আফসোস করতে রাজী যে তার কানদুটো লটপট ক'রে ঝাপটা মারার মতো বিশেষ বড়ো নয়। শিশুটিও অচেতন প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে হেসেই চলল, যেন জানাই আছে যে এই সব মজা করা হচ্ছে তারই জন্যে; সন্দেহ হল হাসিটা যে সে এতক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে সেটা জোর ক'রেই, এরকম প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেবার জন্যেই।

'আসবি আমার কোলে?' জিজ্ঞেস করলে স্লেপৎসভ, 'কি বলিস আসবি? আয়। আর কাঁদবি না তো?'

তার একমাত্র হাতখানি দিয়ে সে নিপুণ ভাবে তুলে নিলে মেয়েটিকে, মাথাটা রইল তার কাঁধের কাছে। ঠিক যেন দোলনার

মতো হাতের ওপর শুয়ে রইল মেয়েটি, স্লেপৎসভের মুখখানা দেখতে লাগল মন দিয়ে, অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখায় সে মুখটা তার কাছে বোধ হয় বিশেষ মজারই মনে হয়েছিল। মেয়েটির অপ্রত্যাশিত মেজাজ ফেরায় আয়া ইতিমধ্যে ছুটে গিয়ে ন্যাতাকানি কম্বল নিয়ে এসেছিল, মেয়েটিকে তাতে জড়িয়ে ফের তুলে দিলে স্লেপৎসভের হাতে, এবং বেশ অবাক হয়েই অন্তরঙ্গের মতো বললে:

'তুমি বাপু আয়া হলেই পারতে। ইশ, কী হাসছে দ্যাখো!'

'আমার এক যাদু মন্ত্র আছে ছেলেপিলেদের জন্যে,' কেজো লোকের মতো বুঝিয়ে বললে স্লেপৎসভ।

চোখ বড়ো বড়ো ক'রে আয়া বসল চেয়ারে:

'যা, বাজে কথা।'

'দেখাচ্ছি তোমার বাজে কথা। তাকাও তো দেখি আমার চোখের দিকে। দেখতে পাচ্ছ আগুন?'

খানিকটা সসম্মানেই আয়া তাকিয়ে দেখলে স্লেপৎসভের চোখের মণিতে, সেখানে জানলার জ্বলজ্বলে আভাটা দেখে অনিশ্চিতের মতো বললে:

'তা বাপু মনে হচ্ছে যেন দেখছি।'

'এইটেই হল আসল ব্যাপার। এবার তোমায় মন্ত্রটা বলে দিচ্ছি, আউড়ে যাও। মনে ক'রে বলতে পারলে দেখবে ছেলেপিলেরা চিরকাল তোমার কাছে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকবে। নাও শোনো: সেকেশফেখেরভার।'

মুখখানাকে রহস্যময় ক'রে দু'বার সে আওড়ালে কথাটা:

'সেকেশফেখেরভার, সেকেশফেখেরভার।'

ব'লে নিজেই হেসে ফেললে। হাঙ্গারির এক শহরের নাম এটা, তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের পক্ষে এ শহরটা এক অগ্নিপরীক্ষার উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল।

মেয়েটি বুঝলে রগড় করছে, কিন্তু তার ভানকরা গুরুগম্ভীর ভাব আর চোখের পাশে স্নেহময় কুঞ্চনগুলোয় কেমন যেন ভালোই লাগল তার, মন খুশি হয়ে উঠল। এই প্রথম সে তাকে দেখলে এক অদ্ভুত গোছের আগন্তুক হিসেবে নয়, যে এসে উঠেছে কী কারণে কে জানে। দেখলে এক লক্ষণীয় মনোরঞ্জন পুরুষ হিসাবে। 'তুমি' থেকে 'আপনিতে' চ'লে এল সে, কথা বলতে লাগল একটু ন্যাকামি ক'রে, কৃত্রিম ভাবেই হাসতে লাগল খিলখিলিয়ে, তাকাতে লাগল সোজাসুজি নয়, আড়চোখে, আদিম গোছের হলেও সত্যসত্যই মনোহর একটা লীলালাস্যে, যেটা তার গ্রামে প্রচলিত। খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল তার জিজ্ঞেস করে বউ আছে কি না, কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না।

হঠাৎ দু'হাত জড়ো ক'রে হতাশার ভঙ্গি করলে মেয়েটি:

'এই সর্বনাশ! রুটির দোকানে বিক্রি শুরু হয়ে যায় নি তো এতক্ষণে?! আপনি কেবল যত সেশে খেশে শুরু করেছেন, ওদিকে রুটি হয়ত গিয়ে পাব না। আমি এই যাব আর আসব, কিছু ভাববেন না।'

শেষ বারের মতো তার আমন্ত্রণী কটাক্ষপাত ক'রে ছুটল মেয়েটি। দড়াম ক'রে একটা দুয়োর বন্ধ হল, তারপর দ্বিতীয় দুয়োর, ভয়ানক চুপচাপ হয়ে গেল সবকিছু, যেন গাঁয়ের চেয়েও চুপচাপ। গাঁয়ে তবু কুকুর ডাকে, ক্যাঁককেঁকিয়ে ওঠে মুরগী, গরুর হাম্বা শোনা যায়, এখানে একেবারে স্তব্ধ, শান্ত, যেমন শান্ত হওয়া সম্ভব কেবল দিন দুপুরে জনবিরল গলির ফাঁকা ফ্ল্যাটে, যখন ছেলেরা গেছে ইশকুলে, বড়োরা কাজে।

কোলে, বলা ভালো একখানা হাতে মেয়েটিকে নিয়ে ঘরে একা পড়তেই স্লেপৎসভ আরামকেদারাটায় গুছিয়ে বসলে। সিগারেট খাবার ইচ্ছে হয়েছিল তার, কিন্তু ঘুমে ঢুলন্ত খুকিটিকে বিরক্ত না ক'রে সে আপন মনে বকতে লাগল:

'শীগগিরই মা আসবে তোর, লাইন দিয়ে রুটি আনবে তাজা আনকোরা, দুধ দেবে তোকে, তখন আমরা সিগারেট খাব একবার, মানে ঘরের বাইরে, করিডরে গিয়ে, সভ্যভব্য লোকের মতো, ধোঁয়ায় তোকে নিঃশ্বেস নিতে হবে না।'

গুন গুন করে একটা ঘুমপাড়ানী গানও সে গাইলে, কে জানে কোন মানব-দ্বেষী এটি রচনা করেছিল ছেলেপিলেদের ভয় দেখাবার জন্যে:

যাস নে খোকা ঘরের বার
বাইরে বড়ো হুহুংকার,
দেখতে আমি গেলাম যেই
দেখি কোথাও কিছু নেই...
ও-ও-ও, ও-ও-ও...

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল মেয়েটির, পরে আবার জেগে উঠল, কাঁদতে যাচ্ছিল, কিন্তু দৃষ্টিপথে সেই একই মুখখানা দেখতে পেয়ে স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেই দিকে, মনে হল সে দৃষ্টিতে এতই স্বচ্ছ ও গভীর একটা বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে, ভাবনার এমন একটা নিবিষ্টতা যে স্লেপৎসভ অভিভূত ও অবাক হয়ে মুহূর্তের জন্যে না ভেবে পারল না যে মেয়েটি তার কথা সবই জানে, তার অন্তঃস্থল ভেদ ক'রে সে দেখছে। শুধু ফের যখন মেয়েটির মুখে ফোগলা গোলাপী হাসি ফুটল, কেবল তখনই সে মুহূর্তের বিভ্রম থেকে উদ্ধার পেয়ে স্নেহের সুরে বললে:

'ওরে খুকি, ওরে খুকি, ছোট্ট খুকুমণি!'

মনে হল খোকাদের চেয়ে খুকুরা কেমন যেন বেশি মিষ্টি, বেশি নরম। তার নিজেরই ছেলে ছিল দুটি। ইচ্ছে ক'রেই সে

তাদের সঙ্গে কড়া ব্যবহার করত, খামোকা সোহাগ দিয়ে কী হবে। কিন্তু মেয়ে হলে সে নিশ্চয় অনেক বেশি আদর দিত, ভুরু কোঁচকাতে সে পারত না। এই কথাই তার মনে হল এখন।

মা-মণি কিন্তু এখনো ফিরল না। চোখ মেলে শান্ত হয়ে শুয়ে রইল খুকি।

'বড়ো হয়ে কী তুই হবি বল তো?' জিজ্ঞেস করলে স্লেপৎসভ, 'বল দেখি।' চোখ তুলে সে দেয়ালের যশস্বিনী মহিলাদের ছবির দিকে তাকালে, থুতনি উঁচিয়ে মারি কুরির গম্ভীর মুখখানার দিকে ইঙ্গিত ক'রে সে জিজ্ঞেস করলে, 'কী রে, এর মতো হবি?' তারপর দ্বিতীয় ছবিখানার দিকে থুতনির একই ভঙ্গি ক'রে শুধাল, 'নাকি ওর মতো... বল। কথা বলছিস না কেন? নে, নে, লজ্জা কী, ছোট্ট খুকুমণি তুই।'

এই সময় চাবি ঘুরানোর আওয়াজ হল, ঝনাৎ ক'রে উঠল শেকল, ঘটাং করে উঠল দরজা, খুট খুট শব্দ উঠল হাই হিল জুতোর।

'এই তোর মা এসেছে,' ব'লে একগাল হাসি নিয়ে স্লেপৎসভ তাকাল দরজার দিকে।

কিন্তু দুয়োর যখন খুলল তখন মোটেই মা-মণি নয়, দেখা দিল ওলগা পেত্রভনা নেচায়েভা — লম্বাটে গড়ন, সোনালী চুল, একটু মোটা, চটপটে — যেন উড়ে আসছে। ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারের কাছে সর্বদাই গন্ডা গন্ডা যেসব ফোটো থাকত তার দৌলতে স্লেপৎসভ দেখেই চিনতে পারলে ওকে, — ফোটোগুলো এখন তারই বুকপকেটে। ওঠবার কোনো উপায় ছিল না, হাতে খুকি, আরামকেদারাটাও নিচু এবং গভীর, স্লেপৎসভ শুধু তাকিয়ে রইল ওর দিকে, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, কোনো কথা ফুটল না মুখে।

৪

অচেনা একজন লোকের কোলে খুকিকে দেখে ওলগা পেত্রভনা থমকে দাঁড়াল, কিন্তু খুকিটি তার কোলেই আছে (খুকি তখন মুখ দিয়ে বুদ্বুদ ফোটাচ্ছে আর থুতনির কাছে হাত দিয়ে তা ধরবার চেষ্টা করছে) সেটা দেখে খানিকটা শান্ত বোধ করলে সে। চোর হলে কি আর পরের ফ্ল্যাটে এসে কেউ খুকির পরিচর্যা করতে বসে। ওলগা পেত্রভনা স্থির করলে অজানা লোকটা পাশার একগাঁয়ের লোক বা চেনা পরিচিত কেউ হবে। তাহলেও লোকটা অন্তত রাস্তাঘাট মাড়িয়ে এসেছে, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুসারে শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে সেটা একেবারে চলে না। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে এল ওলগা পেত্রভনা, বেশ ঝটকা মেরেই খুকিকে তুলে নিলে এবং অসন্তোষের স্বরে জিজ্ঞেস করলে:

'পাশা কোথায়?'

আরামকেদারা থেকে উঠল স্লেপৎসভ, দাঁড়িয়ে রইল ভয়ানক বিব্রতের মতো, দোষী-দোষী ভাব ক'রে।

'খুকির মা?' জিজ্ঞেস করলে স্লেপৎসভ, 'লাইনে গিয়েছে, রুটি কিনতে... নমস্কার, ওলগা পেত্রভনা। আমি আন্দ্রেই স্লেপৎসভ। আমার উপাধিটা আপনি হয়ত জানেন, হয়ত শুনেছেন... মানে, বলা ভালো, পড়েছেন...'

'পড়েছি মানে? কোথায় পড়লাম?' না বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল ওলগা পেত্রভনা, আর সেই সঙ্গেই খুকিকে চটপট কাঁথা জড়িয়ে ইউরার বালিশের ওপর শোয়ালে। বালিশটি এই উদ্দেশ্যেই ইউরার বিছানা থেকে টেনে বার ক'রে খাটের ওপর চ্যাপ্টা ক'রে থাবড়ে রাখা হয়েছিল।

'আমি আমার কম্যান্ডার ভিতালি নিকোলায়েভিচ

নেচায়েভের হুকুম মতো আসছি... আসছি সাইবেরিয়া থেকে। ওঁকে কথা দিয়েছিলাম। একটু দেরি হয়েছে, তাহলেও এসে পেঁাছলাম। আগে আর কিছুতেই হয়ে উঠল না, মাপ করবেন, জখমটার চিকিৎসা করতে অনেক দিন লাগিয়ে দিলে।'

খুকির ওপর ঝুঁকেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ওলগা পেত্রভনা, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল, ঘুরে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল স্লেপৎসভের কাছে। স্লেপৎসভও এগিয়ে এল এক পা। ওলগা পেত্রভনার দু'চোখে কেমন একটা ভয় দেখা গেল, সম্ভবত সেটা এইজন্যে যে সৈনিকটি তার স্বামীর উল্লেখ করলে এমন ভাবে যেন সে একটা জীবন্ত লোক, কোথায় যেন আছে এখনো। তারপর হঠাৎ কেমন অস্থির হয়ে উঠল — এটা সাধারণত তার অভ্যাস নয়।

বললে, 'বসুন, বসুন, হ্যাঁ, হ্যাঁ... ভালোই হল... আমি এক্ষুণি আসছি... এক মিনিট...'

মনে হল যেন সংসারের কোনো একটা কাজেই সে গেছে। আসলে একা একা দম নিয়ে আত্মস্থ হতে চেয়েছিল সে। তবু এই অতর্কিত বিচলিতি সত্ত্বেও যন্ত্রের মতো সে তার নিত্যকার কাজগুলো করে যেতে থাকল, আর তাতে কেমন যেন খানিকটা সুস্থিরই বোধ করলে সে। মাথা গলিয়ে পরনের গাউনটা খুললে সে, টাঙিয়ে রাখল পোষাকের আলমারিতে, পরলে একটা ছোঁটো ছোটো হাতাওয়ালা রঙচঙে ড্রেসিং গাউন। তারপর রান্নাঘরে গেল সে, স্টোভ জ্বালিয়ে তার ওপর এনামেল-করা কেটলি চাপালে। গ্লেজ করা পটারির একটা কেটলিতে কিছু পুরনো ভেজানো চা ছিল, সেটা বদলালে। নোংরা গেলাশগুলো বেসিনে রাখলে ধোবার জন্যে।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল সে। করিডরে যখন টেলিফোন বেজে উঠল, তখন সে তার স্বাভাবিক দ্রুত, প্রায় উড়ন্ত

ভঙ্গিতেই গেল সেখানে, আত্মবিশ্বাসের একটু অতিরঞ্জনই যেন ফুটে উঠল তাতে, রিসিভারে যখন কথা বললে তখন পুরোপুরিই সামলে নিয়েছে নিজেকে, প্রতিটি কথার শেষে তার সেই অভ্যস্ত মজাদার টানটাও বাদ গেল না, যাতে তার আলাপটায় একটা স্বকীয় আকর্ষণ ফুটত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুকিকে খাওয়াচ্ছি,' ও বললে, 'আমাদের কথাবার্তাটা কালকের জন্যে তুলে রাখা যায় না? আজ আমার বাড়িতে লোক এসেছে, তার মানে আজ ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি না, কেমন? কাল দেখা হবে।'

রিসিভার রেখে সে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে, হতাশ হয়ে সে টের পেলে খাবার ঘরে হাতকাটা সৈনিকটির কাছে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে কী কঠিন। তাহলেও একরোখার মতো থুতনি ঝাঁকিয়ে সে ঢুকল খাবার ঘরে।

ঘরের মাঝখানে ঠিক সেই আগের জায়গাটাতেই স্লেপৎসভকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গলায় একটা আদেশের সুর ফুটিয়ে সে বললে, 'বসুন।' টেবলের ওপর আগের মতোই মাছ আর মাংসগুলো পড়েছিল, সে দিকে নজর পড়ল তার, নিষ্প্রয়োজনেই হাসলে সে, তারপর নেহাৎ জোর ক'রে কথা চালাবার জন্যেই বললে, 'জলখাবার খাওয়া শেষ করেছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, ইউরার সঙ্গে...' বিব্রত ভাবে বললে স্লেপৎসভ, চোখে ওর করুণার একটা আভাস খেলে গেল, যেটা কেন জানি তিরস্কারের মতো বিঁধল ওলগা পেত্রভনাকে।

কাজের কথায় আসার চেষ্টা করলে ওলগা পেত্রভনা:

'তার মানে, আপনি বলছেন ভিতালি নিকোলায়েভিচ...'

স্লেপৎসভের মুখখানা সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল ও গর্বিত হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, আমার কোলেই উনি মারা যান, আমায়

বলেন… আমায় ভার দেন… আমি তাঁকে কথা দিই। তাই এলাম।’

ওলগা পেত্রভনা দ্রুত মাথা নাড়লে। সভয়ে সে টের পাচ্ছিল তার অভ্যাসকে ছাপিয়ে ফের এবার তার মধ্যে একটা অস্থিরতা আর চেতনার বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বিচলিতের মতো সে মেয়েটির দিকে কটাক্ষে তাকালে। সিলিঙের দিকে স্থির তন্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে খুকি। খুকির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দ্রুত সৈনিকের দিকে চাইলে ওলগা পেত্রভনা, সৈনিকও ঠিক খুকির মতোই একাগ্র, তন্ময়। এক দিকে খুকি আর অন্য পাশে সৈনিকটির মাঝখানে ওলগা পেত্রভনা বসেছিল সেই চেয়ারটিতে, যেখানে সকালে বসেছিল ইউরা, সোনালী রঙের রোঁয়ায় ভরা শাদা শাদা পুরুষ্টু দুই হাত টেবলের ওপর আড়াআড়ি রেখে সে বললে:

‘বলুন, আমি শুনছি।’

আস্তে আস্তে বলে গেল স্লেপৎসভ:

‘কমরেড নেচায়েভ মারা যান আমার কোলে, পুরো জ্ঞান ছিল। মেডিকেল ইউনিট পর্যন্ত ওঁকে ব’য়ে নিয়ে যাওয়া যায় নি। চেষ্টা করেছিলাম আমরা, কিন্তু রাস্তাটা ছিল খারাপ, খানাখন্দে ভরা, গাড়ির ঝাঁকুনিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তাই স্ট্রেচারে ক’রে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু জখমটা ছিল মারাত্মক। গোটা ব্যাটালিয়নই একেবারে শোকে কাতর, সৈন্য অফিসার সবাই আমরা ওঁকে ভালোবাসতাম। ডিবিসনের কম্যাণ্ডারও। কোনো একটা জরুরী কাজ এলেই অমনি ডাকো ক্যাপ্‌টেন নেচায়েভকে… মোট কথা, ওঁর মারা যাওয়ার পরে— আর মারা উনি যান, আপনি নিশ্চয় জানেন, উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালের ২রা মে, মে উৎসবের মধ্যে — তা মারা যাবার দিন দুয়ের মধ্যেই অর্ডার এল ওঁকে মেয়র পদ দেওয়া হয়েছে।

তাই আপনার দলিলপত্রে যদি সে কথা না থাকে, তাহলে হেড কোয়ার্টারে লিখে পাঠানো দরকার, আপনার পেনশন বাড়বে... সবাই ভালোবাসতাম ওঁর সততার জন্যে, ওঁর কলজেটার জন্যে, সে আর কী বলব, আপনি ঘরের লোক, আপনি তো জানেনেই... আর লড়াইয়েও কখনো অস্থির হতেন না। হয়ত উনি আজো বেঁচেই থাকতেন যদি অমন সৎ, অমন সাহসী না হতেন। কতবার ওঁর ডাক পড়েছে: কখনো ফৌজের কর্মী দপ্তরে, কখনো কোরের অপারেশন দপ্তরে — শিক্ষিত লোক তো, তার ওপর লড়ুইয়ে কম্যান্ডার। কিন্তু উনি যেতে চান নি, আপত্তি ক'রে দেন। এই তো শেষ লড়াইয়ের এক সপ্তাহ আগেও ডিবিসনের কম্যান্ডার আমার সামনেই ওঁকে তাঁর স্টাফে আসতে বলেন। বলেন, 'তুই লেখাপড়া জানা লোক, বিবেক মেনে চলিস। কেবলি চাস সৈন্যদের কাছে আদর্শ দেখিয়ে যাবি, পাগলার মতো ছুটিস সবার আগে আগে, মারা পড়বি রে। চলে আয় আমার কাছে।' কমরেড নেচায়েভ কিন্তু হেসে বলেন কি: 'লেখাপড়া জানা লোকের এমন প্রশংসা কমই জোটে! শুধু এর জন্যেই এখানেই থাকব।' আর ডিবিসনের কম্যান্ডার বলেন, 'প্রশংসা করলাম কোথায়? তোকে বকুনি দিচ্ছি, আর তুই ভাবছিস প্রশংসা...' দুজনেই ছিলেন ভারি মজার লোক — একসঙ্গে জুটলেই কেবল অমনি ধারা কথা।'

পাশার গোলগাল মুখখানা দেখা দিল দরজায়। গিন্নিকে দেখে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে, অচেনা এক লোকের হাতে খুকিকে ফেলে রেখে সে চলে গেছে এবং রুটি কেনার পরও পড়শী এক আয়ার সঙ্গে গালগল্পে সময় কাটিয়েছে, তার জন্যে গিন্নি আবার তেড়ে না আসেন। গিন্নি কিন্তু কিছুই বললে না, এমন কি দৃকপাতও করলে না। শুধু তাই নয়, পাশা যাতে তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সেই উদ্দেশ্যে

ওলগা পেত্রভনা আরো কাছিয়ে এল সৈনিকটির দিকে এবং বার কয়েক উদগ্রীবের মতো পুনরুক্তি করলে:

'ব'লে যান, ব'লে যান।'

নিঃশব্দে খুকির খাটের কাছে এগিয়ে গেল পাশা, এবং তাকে কোলে ক'রে বেরিয়ে যাবার সময় দরজার কাছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে।

'ব'লে যান,' পুনরাবৃত্তি করলে ওলগা পেত্রভনা, কিন্তু স্লেপৎসভ যখন ফের কথা বলতে শুরু করলে, তখন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে, বললে, 'একটু দাঁড়ান, কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকটা কাজ সেরে আসি।'

৫

ওলগা পেত্রভনা চলে গেল। স্লেপৎসভের চোখের সামনে জীবন্তের মতো ভেসে যাচ্ছে লড়ুইয়ে জীবনের ছবিগুলো। প্রায় সে ভুলেই গেল কোথায় রয়েছে। চারিপাশে তার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল ফ্রণ্ট রাস্তার কুয়াশা, হেড লাইট নিবিয়ে সারি সারি চলেছে লরি, ফার পাইনের ভেজা ভেজা ঝরা কাঁটার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে অগভীর ট্রেঞ্চ, ঘাসের ঢিবির ওপর ঘা মারছে স্যাপারের কোদাল, ছিটিয়ে পড়ছে ঘাসের সরু সরু শিকড়, ঝিরঝিরিয়ে জল পড়ছে ওয়াটারপ্রুফ হুডের ওপর। বৃষ্টি আর রোদ, প্রচণ্ড গরম আর তুহিন শীত, বনের মধ্যে কখনো ফার গাছের শয্যায়, কখনো অভিজাতদের পুরীতে গিল্টি করা কক্ষে রাত্রি যাপন — একের পর এক ভেসে যাচ্ছিল ছবিগুলো। ওলগা পেত্রভনা এসে ফের তার আগের জায়গাটিতেই বসলে। এবার স্লেপৎসভের বিবরণ বেশ অবাধ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল, আর কোনো রকম বিব্রত বোধ করছিল

না সে, যেন কলখোজের চায়ের আড্ডায় তারই মতো পঙ্গু শ্রোতাদের কাছে সে তার অভ্যস্ত গল্প শোনাচ্ছে।

ওলগা পেত্রভনা ইতিমধ্যে তার ড্রেসিং গাউন ছেড়ে একটা কালো গলা-আঁটা পোষাক প'রে এসেছে। কিন্তু সৈনিক সেটা নজর করলে না, চোখে পড়লেও তার কারণটা অন্তত খেয়াল হয় নি।

'ভিতালি নিকোলায়েভিচের সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয়,' কাহিনী শুরু করলে স্লেপৎসভ, 'সেই একচল্লিশ সালেই, গ্রীষ্মে। এসেছিলাম তখন লড়ুইয়ে সৈন্যদের জন্যে নতুন বল হিসেবে। আমাদের লাগানো হল মস্কোর কাছে, প্রতি-আক্রমণে, শীতের সেই বড়ো প্রতি-আক্রমণটা নয়, আরো আগে, জার্মানদের তখন প্রচুর শক্তি, আমরা শুধু মাঝে মধ্যে যা পারছি দু'এক ঘা মারছি। সেই সময় ফ্রন্টের একটা এলাকায় অনেক বল জুটিয়ে আমাদের পাঠানো হল জার্মানদের বিরুদ্ধে... চলছি আমরা, মানে ডিবিসনের হেড কোয়ার্টার থেকে আমাদের রেজিমেণ্টে। তার আগে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, রাস্তা একেবারে কাদায় কাদা, পা আর টানা যায় না, আর মনের মধ্যে দুরু দুরু: প্রায় সবাই আমরা নতুন, কখনো লড়ি নি, পশ্চিমে এমন গোলাগুলি চলছে, এমন তার ডাক যে প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত; রাস্তায় মরা ঘোড়া, গাদা গাদা মরা ঘোড়া, আর বোমার গর্ত। তাহলেও এগোচ্ছি আমরা, আর আমাদের পাশে পাশেই কাদা ভেঙে চলছে একজন অফিসার — সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট। আমাদের রেজিমেণ্টের কেউ নয়, পথচলতি লোক, কেবলি সিগারেট টানছে, গায়ের উর্দি ছেঁড়াখোঁড়া, টারপলিনের হাইবুট।

'কী দিয়ে যে তৈরি এই টারপলিনের বুটগুলো কে জানে, তেমন দেখনসই নয় বটে, তবে বেশ শক্ত, ট্যাকসই, কিন্তু সেলাই

একবার ফাটতে শুরু করলে চট করেই দফা শেষ। তবে এই সিনিয়র লেফটেন্যাণ্টের বুটটি কিন্তু বেশ চলছে... মুখখানা ওর রোগা, কালচে, চোখে চশমা।

'আমরা যাচ্ছি, যাচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল, লোকটা কিছুই খাচ্ছে না, পরে সিগারেট টানাও বন্ধ করলে। আমরা এক একটা হল্ট করি, ও-ও বসে জিরোয়। আমরা খাচ্ছি, ও কিন্তু খায় না। আমাদের কষ্ট লাগল, বিশেষ ক'রে যখন দেখলাম যে লোকটা সিগারেটও খাচ্ছে না, সিগারেট-খোরের কী দশা বোঝাই যাচ্ছে।

'আমাদের মধ্যেকার মুরুব্বী, চেরেপানভ, বয়স্ক লোক, স্বেচ্ছাসেবক, গৃহযুদ্ধের সময় উরালে পার্টিজান ছিল, সেই চেরেপানভ ওর কাছে গিয়ে ভদ্র ভাবে নেমন্তন্ন করলে। বলে, আসুন, আমাদের সঙ্গে খাবেন। সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট এল আমাদের কাছে, খেলে, মাখোরকাও দিলাম। এর পর থেকে আমাদের দলে ভিড়েই চলতে লাগল। কিন্তু রেজিমেণ্টে গিয়ে আর ওকে দেখা গেল না। যখন ব্যাটালিয়নে পেঁছিলাম, দেখি লোকটা আগেই ওখানে এসে হাজির, আর ও-ই নাকি আমাদের ব্যাটালিয়নের কম্যাণ্ডার। পাঠিয়েছে ওকে অন্য এক রেজিমেণ্ট থেকে, সেখানে এক ইউনিটের কম্যাণ্ডার ছিল, এমন চমৎকার লড়াই করে যে ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার হিসাবে প্রমোশন হয়। পরের দিন লাল পতাকা অর্ডার পায় সে।

'আমায় আর চেরেপানভকে দেখে ভারি খুশি হয়ে উঠল, যেন আপন জনদের দেখছে: বলে, 'সবচেয়ে বড়ো কথা মাখোরকার জন্যে ধন্যবাদ।' বলে, 'এ একটা কাজের মতো কাজ।' মাঝে মাঝে ও এই কথাটা বলত, শুনে শুনে আমাদের মধ্যেও ওটা চল হয়ে যায়, ব্যাটালিয়নে কারো ভয়ানক তারিফ করার সময় ঐ কথাটা বলতাম আমরা।

'কমরেড নেচায়েভ আমায় তার টেলিফোনিস্ট ক'রে নিলেন আর চেরেপানভ হল আর্দালী। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, দিন রাত সমান হয়ে উঠল। ছয় কিলোমিটার এগুলাম আমরা, চারটে গ্রাম খালাস করলাম। তিন দিন পরে রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার হয় মারা পড়ে নাকি জখম হয়, আর কমরেড নেচায়েভ মাত্র একজন সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট হলেও রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার হলেন। আমি ছিলাম টেলিফোনে, অর্ডারটা পেয়েই আমি ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডারকে জানাই, কিন্তু কেন কী ব্যাপার এসব খোলসা করতে চাইছিলেন উনি, সেই সময় কানেকশন কেটে গেল। কমরেড নেচায়েভ ব্যাটালিয়নের ভার একজন লেফটেন্যাণ্টের ওপর দিয়ে আমায় আর চেরেপানভকে সঙ্গে নিলেন, রওনা দিলাম রেজিমেণ্ট হেড কোয়ার্টারে।

'রেজিমেণ্টে এলাম, নামলাম ডাগ-আউটের ভেতরে। দেখি এক মেয়র, রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার পড়ে আছে সেখানে, ভয়ানক জখম, চিৎকার ক'রে ভুল বকছে, নানা রকম কী সব হুকুম করছে ভুল বকার মধ্যে, গা একেবারে আগুন, ডাক্তার কি নার্স কেউ নেই, ডাকাডাকি ক'রে কাউকে পাওয়া গেল না। কাউকে পাঠাবার জন্যে টেলিফোন ক'রে ক'রে গলা ভেঙে গেল আমার। কমরেড নেচায়েভ যেমন পারলেন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারকে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। কাছে বসে তার কপালে ভেজা রুমাল চাপালেন আর চেষ্টা করতে লাগলেন রেজিমেণ্টের খবরাখবর জানতে, শক্তি কত, কী তার করার কথা, ওর কিন্তু কিছুই কানে যায় না, চোখে দৃষ্টি নেই, ওদিকে রেজিমেণ্টের স্টাফ তার স্টাফকর্তা দলিলপত্র ম্যাপ নিয়ে ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আত্মরক্ষা করছে তিন কিলোমিটার দূরে কোন এক গাঁয়ে বসে।

'দুটো ব্যাটালিয়নের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ করা গেল, শুধু তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কাছ থেকে কোনোক্রমেই কোনো

সাড়া মিলল না, কমরেড নেচায়েভ হুকুম দিলেন যোগাযোগ করতে। ডাগ-আউট থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে দেখি চারিদিকে সব একেবারে কচু-কাটা এমন কি গাছগুলো পর্যন্ত বাদ যায় নি। হাতে তারের বাণ্ডিল নিয়ে লাইন বরাবর কুঁজো হয়ে ছুটছি সামনের গাছগুলোর দিকে, দেখি, মোটর এসে থামল সেখানে, জেনারেল আর অফিসাররা সব নামছে মোটর থেকে। একজন আমায় জিজ্ঞেস করলে, এখানে রেজিমেণ্টের সন্ধানী ঘাঁটিটা কোথায়, সেখানে তাদের নিয়ে যেতে হবে। যেমন পারলাম সেলাম ঠুকে ওকে নিয়ে এলাম ফের আমাদের সেই ডাগ-আউটে। ভেবেছিলাম জেনারেলকেই নিয়ে আসছি, কিন্তু পরে খেয়াল হল, কলারে তার তারাটা যে প্রকাণ্ড। একেবারে মাথা খারাপ হয় আর কি: এ যে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল! গোটা যুদ্ধে মার্শালের সঙ্গে আমার দেখা সেই প্রথম আর সেই শেষ।

'আমি ছুটে নামছি ডাগ-আউটে, আর আমার পেছু পেছু আসছে মার্শাল, তার সঙ্গে এক জেনারেল, আর ডিবিসনের কম্যাণ্ডার এক কর্নেল। আর আমাদের সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট, কমরেড নেচায়েভ, তখন টেলিফোনে চ্যাঁচাচ্ছেন আর ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখছেন আমাদের লড়াইয়ের হাল। মুখ ঘুরাতেই মার্শাল আর ডিবিসন কম্যাণ্ডারকে দেখলেন — একে উনি আগেও চিনতেন, রিপোর্ট করলেন, তবে তেমন চেঁচিয়ে নয়, যেন মামুলী কাজের রিপোর্ট, ফৌজী কায়দার রিপোর্ট নয়। মনে হল সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোধ হয় ওঁর খেয়ালই হয় নি। আর নিশ্চয়ই মার্শালের সেটা পছন্দ হয় নি, কমরেড নেচায়েভের দিকে সে এমন কটমটিয়ে চাইলে যে সবাই ভয় পেয়ে গেল। ভয়ানক কড়া লোক, সমস্ত কম্যাণ্ডাররা তাকে ভয় পেত। জিজ্ঞেস করে, 'অর্ডার পালন করেন নি কেন? আপনার

রেজিমেণ্টের ফ্রণ্টে শত্রুর সৈন্য কত?’ ‘জানি না,’ বললেন কমরেড নেচায়েভ, বোঝাতে চাইলেন ব্যাপার কী। কোণের দিকে খড়ের ওপর ভয়ানক কোঁকাচ্ছিল রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার, তার দিকে দেখাতে চাইলেন, কিন্তু মার্শাল কোনো কথাই শুনতে চায় না, হঠাৎ লাল হয়ে তর্জন গর্জন শুরু করলে, বলে, ‘গুলি ক’রে মারা হবে,’ ফের জিজ্ঞেস করে, ‘যে জায়গাটা দখল করেছেন ব’লে রিপোর্ট করেছিলেন সেটা জার্মানদের হাতে কেন? ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে শুয়োর কোথাকার?’

‘তখন আমাদের রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট নেচায়েভ বলেন কি, ‘চোটপাট বন্ধ করুন।’

‘আর বললেন কী শান্ত গলায়! বুক আমার হিম হয়ে এসেছিল। আর মার্শাল সে কথা শুনে এমন কাঁপতে লাগল যে সবাই ভাবল সিনিয়র লেফটেন্যাণ্টকে এই বুঝি গুলি ক’রে মারে, আসলে কিন্তু হাতদুটো শুন্যেই আঁকুপাঁকু করতে লাগল যেন কী বুঝি খুঁজছে। কিন্তু সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট এমন শান্ত ভাবে চেয়েছিলেন তার চোখের দিকে, এমন সোজাসাপটা স্থির ভঙ্গি যে মনে হয় চটে গেলেও লোকটা ভয় পায় নি দেখে মার্শাল তাকে সমীহ না ক’রে পারল না। কিন্তু ডিবিসনের কম্যাণ্ডার ওই কর্নেল, লড়াইয়ে কত সাহস, অথচ বড়ো কর্তার সামনে একেবারে কেঁচো, ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে বলার কথা তার, অথচ চুপ ক’রে রইল।

‘তখন আমাদের চেরেপানভ, সেই বুড়ো স্বেচ্ছাসেবক, উরালের পার্টিজান, হঠাৎ চুপচাপের মধ্যে ব’লে দিলে, ‘রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার উনি হয়েছেন তো সবে আধঘণ্টা আগে...’

‘মার্শাল ঘাড় ফেরালে, যখন দেখলে লোকটা সামান্য সৈন্য, তাতে আবার বুড়ো, তখন কিছু না ব’লে তার প্রকাণ্ড মাথাটা

ঝ্‌ুঁকিয়ে ফের নেচায়েভকে বললে, 'শোনো রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার, সামনের এই ৬১·৫ নং ঢিবিটা দেখছ তো? কাল সকালে ওটা দখল করবে। দখল করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি পাবে। না পারলে গ্‌ুলি খেয়ে মরবে।'

'আমাদের কম্যাণ্ডার তাতে জবাব দিলেন, 'বেশ।' ব'লে হাসলেন, দ্যাখো দিকি কাণ্ড!

'ঘ্‌ুরে বেরিয়ে গেল মার্শাল, তার পেছ্‌ু পেছ্‌ু জেনারেল আর ডিবিসন কম্যাণ্ডার।

'আমরা রয়ে গেলাম। আমাদের সিনিয়র লেফটেন্যাণ্টের দিকে তাকিয়ে দেখি কি, তখনো হেসেই যাচ্ছেন। আমি ওদিকে ঘেমে একশা।'

৬

'অনেক পরে রাত্রে, যখন ৩ নং ব্যাটালিয়নে গিয়ে পে'ৗছেছি — আর গোটা সে রাতটা আমরা এক ব্যাটালিয়ন থেকে আরেক ব্যাটালিয়নে, এক ব্যাটারি থেকে আরেক ব্যাটারিতে ছ্‌ুটে বেরিয়েছি — সেই সময় খোলা মাঠের মধ্যে সিগারেট খাবার জন্যে আমরা যখন মাটিতে উপ্‌ুড় হয়ে আছি, তখন ভিতালি নিকোলায়েভিচকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, তখন হাসছিলেন যে?' কী ভেবে যেন বললেন, 'কষ্ট হচ্ছিল ওঁর জন্যে।' 'কার জন্যে?' 'মার্শালের জন্যে।' 'মার্শাল?' 'হ্যাঁ, ওর অবস্থা খারাপ, আমাদের চেয়ে ওর হাল অনেক খারাপ। সমস্ত কিছ্‌ুর দায়িত্ব, গোটা ফ্রণ্টের দায়িত্ব যে ওর। দেখেছিলি চোখগ্‌ুলো কী রকম লাল, ম্‌ুখখানা কেমন তেতো?' তেতো ম্‌ুখ — এই কথাই বলেছিলেন তিনি, বেশ মনে আছে আমার, এই গোটা রাতটা গোটা দিনটা আমার চোখে ভাসছে যেন কালকের ঘটনা। জীবনে এর আগে কখনো কাউকে বলতে

শুনি নি: তেতো মুখ। কথাটা আমার খুব ভালো লেগে গেল, ভারি অদ্ভুত তো... যাক, ভিতালি নিকোলায়েভিচের কাছে কবুল করলাম যে মার্শালের চোখ কি মুখের দিকে আমি চেয়েও দেখি নি, সত্যি বলতে কি মার্শালের চোখ মুখ আছে সেটা একবার মনেও হয় নি, দেখেছিলাম কেবল তার উর্দির কলারে তারাটার দিকে (কাঁধপট্টি তখনো চল হয় নি)। আর ভিতালি নিকোলায়েভিচ — লোকের শুধু ওপরটাই নয়, মনের ভেতরটাও দেখতে পেতেন তিনি... তবে সে কথা আপনাকে আর কী বলব, আপনি তো ভালোই জানেন, মা'র কাছে মাসির গল্প আর কি...

'তা সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল তো চলে গেল, রইলাম আমরা ডাগ-আউটে — কমরেড নেচায়েভ, চেরেপানভ, প্রথম ব্যাটালিয়নের একজন লেফটেন্যাণ্ট (জানতে এসেছিল কী ব্যাপার) আর ইঞ্জিনিয়র। আর মেয়র, রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার, দেখি, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মারা গেছে। কমরেড নেচায়েভ তার কাছ থেকে ম্যাপের কেসটা নিয়ে ম্যাপ দেখতে বসলেন। তারপর চেরেপানভকে নিয়ে কোথায় যেন ছুটলেন, ফিরে এলেন কালো হেলমেট পরা এক ট্যাঙ্ক-চালককে নিয়ে, বোঝা গেল ট্যাঙ্কটা কিছু দূরেই আছে, লেফটেন্যাণ্টকে নেচায়েভ হুকুম দিলেন এক প্লেটুন সৈন্য আনতে। এক প্লেটুন সৈন্য নিয়ে এল লেফটেন্যাণ্ট, ট্যাঙ্ক নিয়ে তাঁরা রওনা দিলেন স্টাফকে উদ্ধার করতে। আমায় হুকুম দিলেন টেলিফোন যোগাযোগ ঠিক করে ফেলতে। আমিও ছুটলাম, ঠিকঠাক করা গেল, যখন ফিরলাম নেচায়েভ তখনো নেই, দূর থেকে হাত-বোমা আর গুলি ছোঁড়ার শব্দ আসছে। পরে ফিরলেন গোটা স্টাফ সঙ্গে ক'রে। স্টাফের লোকেরা এল একেবারে যেন আধ-মরা, সঙ্গে বাক্স প্যাটরা, দলিলপত্র, কভারের মধ্যে রেজিমেণ্টের পতাকা। কমরেড

নেচায়েভ হুকুম দিচ্ছেন কোনো হম্বি তম্বি না ক'রে, কিন্তু মানছে সবাই। সবাই জানে কাল এই ছেঁড়া বুট পরা সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর হবেন নয়ত মরবেন গুলি খেয়ে। সবাই চটপট মেনে নিচ্ছে তাঁকে, তাকাচ্ছে ভারি একটা শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে। সবারই কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে ওঁর জন্যে, নিজেদের কেমন যেন অপরাধী ব'লে মনে হচ্ছে।

'পরে আমায় হুকুম করলেন গা ধোয়ার জন্যে জল আনতে। জল জোগাড় ক'রে আনলাম। ঠাণ্ডা জলেই গা ধুলেন। বললাম খেয়ে নিন, খেলেন না। সবাই আমরা রাতের খাওয়া খেলাম, উনি খেলেন না। স্টাফ অফিসারদের উনি পাঠালেন সব ইউনিট আর ব্যাটালিয়নে, নিজেও চললেন, সঙ্গে নিলেন আমাকে। রাতে আমরা ঘুমোই নি, তাড়াহুড়ো ক'রে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে ছুটে বেড়ালাম। প্লেটুনগুলোকে অদলবদল করলেন তিনি, হাতিয়ারপত্র, ট্রেঞ্চ মর্টার সব জায়গা থেকে জায়গায় সরানো হল। সৈন্যদের কাছে জার্মানদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন, কোন কোন জায়গা থেকে তারা গোলাগুলি ছুঁড়ছে জানতে চাইলেন, বিশেষ ক'রে আলাপ করলেন গোলন্দাজদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে তাদের গোলার পরিমাণ আর রেঞ্জের খবর নিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি নিশ্চয় লড়াইয়ের বিদ্যে খুব ভালো ক'রে শিখেছেন।' উনি হাসলেন; বলেন, 'আরে না, আমি হলাম ইঞ্জিনিয়র, ইঞ্জিনিয়রিঙে সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট। ইউনিটের কম্যাণ্ডার হয়ে বসি নেহাৎ আচমকা, সে সময় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান আর কাউকে তখন মেলে নি আর কি... দেখছিস তো, কী রকম একখান কেরিয়ার বানিয়েছি: এক হপ্তা আগে ইঞ্জিনিয়র সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট, আজ রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার... আর

কাল...' এইখানেই চুপ ক'রে গেলেন, আর চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। আমিও চুপ ক'রে রইলাম বৈকি।

'তৃতীয় ব্যাটালিয়নে পে'ছিনো ভারি অসম্ভব ছিল। নদী, নিচু জায়গা, সারা রাত জার্মানরা সেখানে মেশিনগান থেকে গুলি চালাচ্ছে। মাটিতে উপুড় হয়ে শুলাম আমরা, সিগারেট টানলাম, তারপর বুকে হে'টে এগুতে লাগলাম। এদিকে ফরসা হতে শুরু করেছে, সময় নেই। কী করা যায়। কমরেড নেচায়েভ নদীটা পর্যন্ত এগুলেন, এক বুক জল ভেঙে নলখাগড়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের এগুতে লাগল এক ঘণ্টা, ধীরে ধীরে এগুতে হচ্ছিল, জলের শব্দ যেন জার্মানদের কানে না যায়। ফেরার পথেও তাই।

'ফিরলাম যখন তখন ফরসা হয়ে গেছে। ভাবলাম ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিই, তারপর আক্রমণ করা যাবে। আমি অবিশ্যি সত্যিই খানিকটা ঘুমিয়েছিলাম, কম্যান্ডার কিন্তু ঘুমোন নি, কেবলি এটা ওটা হুকুম করেন, স্টাফ কর্তার সঙ্গে নানা রকম অর্ডার লেখেন। ঘুম ভাঙতেই দেখি, উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি, থলিটা থেকে বাড়তি চশমা জোড়া বার ক'রে নিজের উর্দির পকেটে পুরলেন আর স্টাফ কর্তাকে হুকুম দিলেন, 'বসে থাক এখানে, কম্যান্ড দিবি, কর্তাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলিস, কী হাল জানাবি। আমি চললাম, ঢিবিটা দখল করার জন্যে আমি নিজেই রেজিমেণ্টকে লিড করব।'

'আমায় আর চেরেপানভকে সঙ্গে নিলেন, চললাম আমরা। একটা উ'চু ঢিবির ওপর উঠে সামনে দেখি এক সড়ক, রেল লাইন এম্ব্যাংকমেণ্ট, ছোট্ট গুমটি স্টেশনটা ভেঙে চুর আর রেল লাইনের ওপাশে সেই ৬১·৫ নং উ'চু এলাকাটা, একটা টিলার মতো, দু'একটা বার্চ গাছ আছে; ছোট ছোট দল বে'ধে আস্তে আস্তে সড়কটার দিকে এগুচ্ছে আমাদের লোকেরা, গোলন্দাজরা

তাদের ৪৫ ক্যালিবারের কামান টেনে আনছে, ভিতালি নিকোলায়েভিচ তখন হাঁটা থামালেন, বললেন:

'লড়াইয়ে মরাই বরং ভালো। বৌ ছেলের কোনো লজ্জা থাকবে না।' আর তখন আমি টের পেলাম যে কম্যান্ডারের ভাবনা হচ্ছে টিলা বোধ হয় রেজিমেণ্ট দখল করতে পারবে না।

'বল আমাদের সত্যিই কম ছিল। প্রধান ঘা-টা দিলে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন। এই ব্যাটালিয়নকে সে রাতে অন্য দুটি ব্যাটালিয়ন থেকে সৈন্য জুটিয়ে জোরদার করেন কমরেড নেচায়েভ। এ ব্যাটালিয়ন বলা যেতে পারে আমাদের ঝোড়ো আক্রমণী দল, অন্য দুটোয় লোক কম, তারা শুধু গুলি চালিয়ে ঠেকা দেবে।

'খানিক থেমে এগুতে থাকলেন কমরেড নেচায়েভ, আমরা তার পেছন পেছন। জার্মানরা বোধ হয় কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিল। সারা রাত তো আমাদের বিশেষ চুপচাপ যায় নি, ঘুষি মারার মুঠো পাকাবার জন্যে বদলাবদলি হয়েছে ইউনিটগুলোয় — তাই জোর গুলি চলল ওপক্ষ থেকে। কমরেড নেচায়েভ কিন্তু পুরো খাড়া হয়েই এগিয়ে চললেন। আর আমি তো লড়াইয়ে আনকোরা — পাশেই মাইন ফাটতেই আমি একেবারে মাটির ওপর উপুড়, আঁটুলির মতো আঁকড়ে ধরে আছি তো আছিই। অভিজ্ঞতা তো কিছু ছিল না, বৌ আর ছেলেদুটির কথা মনে পড়ছিল, তাছাড়া মার্শাল তো আর আমায় গুলি করে মারার হুমকি দেয় নি। আর বুড়ো চেরেপানভ — সেও কিন্তু মাটিতে শুচ্ছিল না, মাথা নোয়াচ্ছিল না গোলাগুলির সামনে। দুজনেই অপেক্ষা করলেন কখন আমি উঠি। কিন্তু কোনো বকুনি দিলেন না, চুপ ক'রে রইলেন।

'আমরা যখন দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে এসে পেঁছিলাম, বেলা তখন প্রায় ৯'টা, আক্রমণ শুরুর কথা সেই সময়, তখন কমরেড নেচায়েভ আর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের কম্যাণ্ডার — সেও সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট — এঁদের সঙ্গে আমরা গিয়ে পেঁছিলাম সেই সড়কটায়, সেখানে সড়কের দুই পাশেই খালের মধ্যে আক্রমণের জন্যে ব্যাটালিয়ন তৈরি হচ্ছে, কমরেড নেচায়েভ তখন হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে আমায় আঙুল নেড়ে বললেন, 'এইখানে তুই থাম, এইখানেই তুই থাকবি। রেজিমেণ্টের স্টাফ আর পাশের রেজিমেণ্টের সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ বজায় রাখবি।'

'জোরে আমার হাতে চাপ দিলেন তিনি। বুঝলাম আমার জন্যে মায়া হচ্ছে ওঁর, আক্রমণে আমায় টেনে নিয়ে যেতে চান না, তাই এমনি একটা কাজ ভেবে বার করেছেন, যদিও আগে কথা ছিল আমি ওঁর পেছু পেছু টেলিফোনের ব্যবস্থাটা টেনে নিয়ে যাব। কিন্তু আপত্তি করার ক্ষমতা ছিল না আমার, মানুষের দুর্বলতা তো, মনটা খুশিই হয়ে উঠল, মরতে ভয় হচ্ছিল কিনা, সংসারের কথা মনে পড়ছিল। নিজের মনকে স্তোক দেবার জন্যে ভাবলাম, 'কম্যাণ্ডারই তো ভালো বুঝবেন।' চেরেপানভকেও থেকে যাবার হুকুম দিলেন, চেরেপানভ যখন আপত্তি করতে গেল, তখন এমন ভাব করলেন যেন ভয়ানক রেগে গেছেন, বললেন, 'হুকুম দিয়েছি, মানতে হবে!' পরে জেনেছিলাম, চেরেপানভ কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁর পেছু পেছুই যায়।

'টিলাটা আমরা দখল করেছিলাম। আমি অবশ্য খেয়াল ক'রে দেখি নি, মাটি খুঁড়ে নিজের টেলিফোন ঠেলেই বেড়িয়েছি ছুঁচোর মতো, চারিপাশে কেবলি দুম ধাড়াক্কা, মারা যায় অনেক। টিলাটায় পেঁছিবার পর আমি জানতে পারলাম যে টিলাটা দখল

করা হয়েছে, আর কমরেড নেচায়েভের কাঁধে হাতে গ্নলি লেগেছে। শ্ননলাম সবাই তাঁকে বীর বলে অভিনন্দন জানায়, নেচায়েভ কিন্তু হাত নেড়ে হাসেন। সত্যিই তাই, অভিনন্দনের সময় তখনো হয় নি, আমাদের আক্রমণটা চলে আরো তিন দিন ধ'রে, তারপর টেঁসে যায়, জার্মানদের তখন প্নরো জোর, কী ভাবে ওদের মারতে হবে সেটা আমরা তখন সবে শিখতে শ্নর্ন করেছি। আর এই যে টিলাটা মার্শালের কাছে মনে হয়েছিল সবচেয়ে জর্নরী ব্যাপার, দেখা গেল সেটা কোনোই কাজের নয়, সামনে তখনো এত টিলা যে রেজিমেণ্টের প্রতিটি কম্যাণ্ডারকে গ্নলি ক'রে মারা বা তাদের সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি দেওয়া কোনোটাই সম্ভব নয়, তাতে হয় ফৌজে অফিসারে টান পড়বে নয় তারা তৈরির জন্যে রাজ্যের সোনায় কুলন্বে না...

'চেরেপানভও জখম হয়েছিল আপনার স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু আমি ওঁদের দেখি নি, সৈন্যের পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

৭

সৈনিকের এ কাহিনীর সময় ওলগা পেত্রভনা প্রথম দিকে শ্ননছিল অন্যমনস্কের মতো, কিন্তু পরের দিকে খ্নব একটা মনোযোগ ও উত্তেজনা দেখা গেল তার মধ্যে। স্বামীর কথা মনে পড়ছিল তার, কিন্তু সে স্বামীর মৃত্যুর পর এই দ্নই বৎসরাধিক কাল ধরে যে ভাবে তাকে মনে পড়েছে সে ভাবে নয়, একেবারেই নতুন ভাবে। মনে হল এ সৈন্য যেন দ্ত এসেছে অন্য এক জগত থেকে, সেই জগৎ যেখানে ভিতালি নিকোলায়েভিচ নেচায়েভ দিন কাটিয়েছে তাকে ছাড়া আলাদা

ভাবে, যেখানে মারা গেছে সে এবং মৃত্যুর পর বেঁচে আছে এই সৈনিকটির স্মৃতির মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্যেও তার এই অনুভূতি যাচ্ছিল না যে এই হাতকাটা সৈনিকটি এসেছে জীবন্ত ভিতালি নেচায়েভের কাছ থেকে, সরাসরি সেইখান থেকে, যেখানে এই মুহূর্তে ভিতালি দিন কাটাচ্ছে। সৈনিকের স্মৃতি এতই জীবন্ত এবং তার আগমন মূলত এতই অমোঘ যে ওলগা পেত্রভনা তা না ভেবে পারলে না।

ওলগা পেত্রভনা মোটেই কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী নয়। এই নীল চোখদুটো যেন দু'বছর আগে নয়, সদ্য সদ্য ভিতালিকে দেখে আসছে, এই অনুভূতিটা তার এই থেকে আসছে ব'লে সে স্থির করলে যে, স্লেপৎসভ যে কাহিনী শোনাচ্ছে সেটা তার পক্ষে একেবারেই নতুন। সে কাহিনী যেন ভিতালি নেচায়েভকে নিয়েই, আবার আদৌ যেন তাকে নিয়ে নয় — যে লোকের কথা হচ্ছে সে যেন ভিতালি নেচায়েভের মতোই, আবার আদৌ তার মতো নয়।

একদিক থেকে সৈনিক যা শোনাচ্ছে তাতে তার স্বামী প্রায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে। তার হাসি, প্রায় অসম্ভব মাত্রায় লাজুক আর কোমল তার হাসি, যে কোনো কাজে এমন কি সবচেয়ে তুচ্ছ কাজেও তার আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা, নিজের দিকে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মন দেবার অক্ষমতা, তার সাংসারিক জ্ঞানের অভাব, যা প্রায়ই তাকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছে — এসবই ঠিক তার মতোই। সৈনিকটি যখন তার এই কথাগুলো বলে, 'ওঁর জন্যে কষ্ট হল' তখন ওলগা পেত্রভনা সত্যিই চমকে ওঠে, এ কথাগুলোয় ফুটে উঠেছিল তার পুরো মূর্তিটা, তার মুখের ছোট্ট ভঙ্গিটা পর্যন্ত — তার এই স্বভাবটাতেও তার মাঝে মাঝে ভারি বিরক্তি বোধ হত। এক সময় এটাকে সে বলত, 'সোজা

ব্যাপারকে প্যাঁচানো,' অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যেই একটা সঙ্গত কারণ খোঁজা, আর কারণ পেয়ে মাপ করে দেওয়া।

হ্যাঁ, সৈনিকের কথায় স্বামীর চেহারা তার চোখের সামনে ফুটে উঠল যেন জ্বলজ্বলে উষ্ণ বর্ণের এক তৈলচিত্র আঁকছে সৈনিক, অথচ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পের বা অনুকৃতির কোনো কৌশলই সৈনিক একেবারে প্রয়োগ করে নি।

কিন্তু স্বামীকে অংশে অংশে চিনলেও গোটাগুটি কখনো সে চিনতে পারছিল না। সৈনিকের কথা থেকে যে নেচায়েভ উঠে দাঁড়িয়েছে আর ওলগা পেত্রভনা যাকে অত ভালো ভাবে জানত, সেই অন্যমনস্ক, লাজুক, একটু যেন বা উদ্যোগহীন, শুধু নিজের অঙ্ক আর ড্রয়িং নিয়ে, শুধু মানসিক এবং একদিক থেকে হিসেব কষার যান্ত্রিক শ্রমে নিমগ্ন লোকটার যেন কোনো মিল নেই। স্লেপৎসভের নেচায়েভ পোষাক গায়েই জল ভেঙে এগোয় আর যে কোনো হাওয়ার ঝাপটেই তার নেচায়েভের সর্দি লাগত, যত রকম সম্ভব রোগের কল্পনায় ত্রস্ত থাকত। এ নেচায়েভ বহু লোকের কাছে আদরণীয়, আর সে নেচায়েভ ছিল কুনো, অমিশুক, লোকে সম্মান করত, সেই সঙ্গে একটু উপহাসও বাদ যেত না। এ নেচায়েভ কাউকে ভয় পায় না, এমন কি মার্শালকেও নয়, যে তাকে গুলি করে মারতে পারত; আর সে নেচায়েভ ইনস্টিটিউটের পরিচালকের ভয়ে কাঁপত, যে পারত শুধু তার অভিমানে ঘা দিতে। যে নেচায়েভকে ওলগা পেত্রভনা আগে জানত তার মধ্যে দুঃসাহস ছিল না, নির্ভীকতা ছিল না, ছিল না এমন মোহনীয়তা, স্লেপৎসভের নেচায়েভের মধ্যে যা আছে তার কিছুই ছিল না।

এ নেচায়েভ দেখা যাচ্ছে সিগারেট খেত! অথচ তামাকের ধোঁয়াই সহ্য করতে পারত না ভিতালি। এ পেয়েছে লাল পতাকা অর্ডার, ব্যাটালিয়নের সেনাপতি সে, রেজিমেণ্টের!

কাহিনী শোনার সময় কয়েকবার একান্ত অকপটেই ওলগা পেত্রভনার মনে হয়েছে: 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে, সৈনিকের কোনো একটা বিদঘ‌ুটে ভুল হয় নি তো? হয়ত একেবারেই অন্য কোনো লোকের কথা বলছে সে — একই নাম, একই উপাধি ভিতালি নেচায়েভ। যথাস্থানে আসে নি সে, ভুল ঠিকানা পেয়েছে...'

ভিতালি নিকোলায়েভিচ নিজের জখমের কথা জানায় নি তাকে, প‌ুরস্কারের কথা, খেতাবের কথা, পদের কথা। বোধ হয় ভেবেছিল এতে ওলগা পেত্রভনার আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু স্লেপৎসভের কাহিনী আর নিজের এলোমেলো চিন্তার মধ্যে স্ম‌ৃতি তার যতই উত্তেজিত ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল, ততই স্বামীর চিঠি ও তার এক একটা বাক্য মনে পড়ে যেতে লাগল তার, এ কথা সে অস্বীকার করতে পারলে না যে মোটের ওপর ভিতালি তার খবর সবই জানিয়েছিল, তার ঝঞ্চাট, ঝামেলা, এক ইউনিট থেকে আরেক ইউনিটে, এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে বদলির কথা। একটা বাক্য তার মনে ভেসে উঠল: 'এবার দ্বিতীয় বারের আঁচড়, সব ভালোই চলছে।' খবরগ‌ুলো অবশ্য জানিয়েছে সে ঠাট্টার স‌ুরে, কেননা ওলগা পেত্রভনার উদ্বেগ বাড়াতে সে চায় নি।

স্লেপৎসভের কাহিনীর একটা শব্দও যাতে বাদ না যায়, তার জন্যে কান পেতে রইলেও একই সঙ্গে ওলগা পেত্রভনা মনে করতে লাগল এই 'আঁচড়ের' খবর পেয়ে সে চিঠির কী উত্তর দিয়েছিল। মনে পড়তেই সে ঘেমে উঠল। কী সব তুচ্ছ, বাজে কথায় চিঠিটাকে বিশ্রী করে তুলেছিল সে। এমন কি ফ্রন্টের কষ্ট যে সে আন্দাজ করতে পারছে এটুকুও লেখে নি। অথচ যে কষ্ট সে সহ্য করেছে সেটা অসহ্য, যন্ত্রণাটা ম‌ৃত্যুর যন্ত্রণা।

ছেঁড়া ব‌ুট পায়ে, জীর্ণ এক উর্দি গায়ে কী ভাবে না খেয়ে কাদা ভেঙে চলেছে ভিতালি নিকোলায়েভিচ এই কথা যখন

বলছিল স্লেপৎসভ তখন ভারি মায়া লাগছিল ওলগা পেত্রভনার, কর্ত্রীসুলভ মায়া, তার মধ্যে খানিকটা এমন কি এই তৃপ্তিটুকুও ছিল যে তাকে নইলে স্বামী তার অসহায়, অচল — এক সময় এ কথাটা বার বার মনে করিয়ে দিতে তার কখনো ক্লান্তি হত না। কিন্তু কাহিনী যতই এগুল, ততই সে টের পেল কথাটা কী বাজে। নিজের ক্লিষ্ট দুর্ভাগা চেহারাটার কথা সে ভাবেই নি হয়ত, নিজের প্রয়োজনবোধ তার কম ছিল, স্ত্রীর কাছ থেকেও কখনো সে বিশেষ কিছু চাইত না। বিনয়ের গর্ব ছিল তার। কিন্তু সত্যিই কি বিনয়ী ছিল সে? গর্ব ছিল তার? ওলগা জানে না। ভিতালিকে সে চেনে কম। নাকি, এই সৈনিকটিই তাকে ঠিক চেনে না? আসল ভিতালি নেচায়েভকে জানে কে? ওলগা পেত্রভনা, যে তার সঙ্গে কাটিয়েছে দশ বছর — তিন হাজার ছয় শো পঞ্চাশ দিন, নাকি এই লোকটা যে তাকে দেখেছে মাত্র তিন দিন?

অবশ্যই কৈফিয়ৎ একটা তার আছে। যুদ্ধের দিনগুলো সে কাটিয়েছে সাইবেরিয়ার এক ছোট্ট শহরে, রাজ্যের শীত ও অস্বাচ্ছন্দ্যে সে শহর গড়া। সেটা মনে হত বিশেষ ক'রে আরো এইজন্যে যে আদি বাসিন্দা চালদোনেরা তাদের কালো কালো কাঠের বাড়ির মধ্যে গুটিয়ে বাটিয়ে দিন কাটাত বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই, শীতের কষ্ট সইতে হত না।

খুবই কষ্ট ক'রে সে এলাকায় দিন কেটেছে তার। কায়ক্লেশে একঘেয়ে বয়ে গেছে জীবন, মনে হয়েছিল এর চেয়ে খারাপ আর হয় না। মস্কোয় ফেরার স্বপ্নটা তার প্রায় একটা বাতিকে পরিণত হয়েছিল। প্রতি দিন যুদ্ধটা তার কাছে মনে হয়েছে অভিশপ্ত, কেননা মস্কো ফেরা মুলতুবী রাখতে হয়েছে তার ফলে। অবিশ্যি তার প্রাণশক্তি এখানেও বজায় ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই মোটের ওপর সহনশীল একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে

পারে সে, একসার বাধা ঠেলে এলাকার অচলায়তন গতানুগতিকতার বাঁধন ছিঁড়ে এগোয় সে। তার প্রাণশক্তির সঙ্গে মিলেছিল আধাসচেতন লীলালাস্য, সুন্দরী নারীর ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও প্রাণশক্তির এটাও একটা প্রকাশ; এর ফলে নিজস্ব একটা ঠাঁই, ভালো একটা চাকরি আর উপকারী বন্ধুবান্ধব জোটাতে সাহায্য হয় তার।

পরে সে খোঁজ পায় স্বামীর সহকর্মীরা কোথায় আছে। চিঠি লিখত সে। পরে সাইবেরিয়ার অন্য একটা বড়ো শহরে তারা ডেকে আনে তাকে, যুদ্ধের আগে পর্যন্ত নেচায়েভ যে ইনস্টিটিউটে কাজ করত, সেখানেই কাজ পায় সে (একচল্লিশ সালের অক্টোবরে ইনস্টিটিউটটা উঠে এসেছিল মস্কো থেকে)। তার আসা ও কাজ পাওয়ায় বিশেষ সাহায্য করেছিল নেচায়েভের বন্ধু রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ ভিনোকুরভ — নামকরা ইঞ্জিনিয়র ও উদ্ভাবক। প্রায়ই ভিনোকুরভের কাছে যেত ওলগা, তার সাহচর্য যে ভিনোকুরভের ভালো লাগে, এটা টের পেয়ে তার খুশি লাগে নি, তা নয়। অমন লেখাপড়া জানা একটা লোক, তার পরিচিত ও সহকর্মীদের মধ্যে অমন একজন নামকরা মানুষ, তার কাছে কিনা ওলগা পেত্রভনার সাহচর্য প্রীতিকর — যদিও মস্কোয় তাদের পরিচয়ের প্রথম দিকে একসময় ভিনোকুরভ তার দিকে কোনো মনই দেয় নি, ওলগা পেত্রভনা তখন ছিল মাত্র নেচায়েভের স্ত্রী, তার বেশি কিছু নয়।

এ জায়গাটা ছিল মন্দের ভালো, তাহলেও এক রুক্ষ অর্ধাশনী জীবন কেটেছে এখানে।

তার মানে কি এখানে, সাইবেরিয়ায়, ওলগা পেত্রভনা স্বামীর কথা ভাবত না? না, সব সময়ই তার কথা ভাবত সে, জানত সে আছে, যুদ্ধের যে দুর্ভাগ্য তার একটা দিকই হল এই যে স্বামী কাছে নেই। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রণাঙ্গনে

লড়বার জন্যে তার স্বামীকে পাঠাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না; স্বামী তার সাঁকো কি এলাকার রক্ষাব্যবস্থার প্রকল্প রচনারই কাজ করবে। এটা ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ততায় বিশ্বাসী ওলগা পেত্রভনার পক্ষে আর কিছু ভাবা সম্ভব ছিল না। তাই ভিতালি নিকোলায়েভিচ যুদ্ধে যাওয়ায় ওলগা পেত্রভনার বিবেক পরিষ্কারই থাকে, যে পুরুষ যুদ্ধে যায় নি, তাদের স্ত্রীদের প্রতি, যেমন ভিনোকুরভের স্ত্রীর প্রতি একটা প্রীতিকর তাচ্ছিল্য পোষণেরও অধিকার পায় সে। সেই সঙ্গে, ভিতালি নিকোলায়েভিচ যুদ্ধে গেলেও সেটা যেন ঠিক যুদ্ধে যাওয়া নয়, কেননা মাত্র ইঞ্জিনিয়রিঙের কাজেই তার লাগা সম্ভব, ফলে স্বামীর ভাগ্য নিয়ে একটা নিশ্চিন্ততার মোহ ছিল তার। তার ওপর স্বামীর চিঠিগুলোও ছিল নিশ্চিন্ত করার মতোই, এমন কি ফুর্তির সুরই তাতে ফুটে বেরত, শঙ্কা দূর হয়ে যেত তার।

'কেন আমায় মায়া করতে গেল সে?' সৈনিকের কাহিনীতে হঠাৎ যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে ভাবল সে, 'আমায় ভোলাবার কোনো অধিকার ছিল না তার...' কিন্তু এ কথা ভাবলেও একই সময় সে টের পেল যেন বা আত্মপ্রবঞ্চনাই করা হচ্ছে একটু, ওর নিশ্চিন্ততা ছিল ছলনা, এমন কি সেই সময়েও মাঝে মাঝে সেটা টের পেত সে।

৮

'তখন ভাবিও নি যে ভিতালি নিকোলায়েভিচের সঙ্গে আবার দেখা হবে,' কিছুটা চুপ ক'রে থাকার পর আবার বলতে শুরু করলে স্লেপৎসভ, 'বুঝতেই তো পারছেন, অমন একটা ফ্রণ্ট, দু'হাজার কিলোমিটার! কত ইউনিট, কত ডিবিসন, কত আর্মি, সব রেল স্টেশনই সৈন্যে ভর্তি, সব গাঁয়েই সৈন্য, এমন কি

সবচেয়ে পেছন দিকের শহরেও যান না কেন, সেই যে বলে, লোকের চেয়ে সৈন্য বেশি।

'প্রায় তিন বছর কেটেছে। সবই অন্যরকম, আমিও আর সে মানুষ নেই। মনে হত যুদ্ধ যেন চলছে প্রায় দশ বছর, আরো একশ বছর বোধ হয় চলবে। একটা কথা বলতে খুবই ভালোবাসতেন ভিতালি নিকোলায়েভিচ, 'যুদ্ধে ভালো লোক হয়ে ওঠে আরো ভালো, খারাপ আরো খারাপ।' এই কথাগুলো নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবতাম। বোধ হয় কথাটা ঠিকই। তবে জীবনে কী না হয়। যুদ্ধে ভালো লোকের মনেও ধারণা হয়, দূর ছাই, শেষ কালে তো মরতেই হবে, তাই সবকিছুই চলবে, সবই ন্যায্য। ধারণা হয় যে সরকারের উচিত তার কথা ভাবা, সরকারী মাল বেপরোয়া নেওয়া চলে, কেননা সরকার তো তোমার জীবনই নিচ্ছে, পরোয়া করছে না। যুদ্ধে পরের জিনিস নিলে সেটা চুরি ব'লে কেউ ধরে না, ছিনিয়ে নিলে সেটা লুট করা হল না, তুমি যদি না নাও, তাহলেও সবই তো চুরমার হয়ে যাবে আচমকা কোন একটা বোমায়, কত ওস্তাদিতে বানানো কতকালকার সব জিনিস এক মিনিটেই শেষ। তাই লোকে আর কিছুরই কদর করতে চায় না। এমন কি ভালো লোকেও। আর খারাপ লোকেরা তো একেবারেই পিশাচ বনে যায়।

'উহুঁ, যুদ্ধে লোকের স্বভাব নষ্ট হয়, যুদ্ধের পর যত রকম চুরি ছ্যাঁচড়ামি আমাদের বেড়েছে, যত রকম অসাধুতা।

'এটা অবিশ্যি এমনি কথায় কথায় বললাম। তবে মোটের ওপর ব্যাপারটা সুবিধের নয়। কিন্তু কী যেন বলছিলাম... হ্যাঁ, ততদিনে আমি পাকা সৈন্য, খেতাব পেয়েছি সার্জেণ্ট, ডিবিসনের হেডকোয়ার্টারে আলাদা একটা সিগন্যাল কম্পানিতে বিভাগের কম্যাণ্ডার হয়েছি। পরে জখম হই, হাসপাতালে যাই, সেখান থেকে মজুত রেজিমেণ্টে। সেখানে

জোয়ানদের তালিম দিতাম, মাস্টার হয়ে গেলাম আর কি, দেখা গেল লড়াইয়ের টেলিফোন যোগাযোগের বিদ্যাটা আনকোরাদের বুঝিয়ে বলার একটা ক্ষমতা ছিল আমার।

'কিন্তু শীগ্গিরই একটা দুর্যোগ ঘটল। একেবারে লাজলজ্জা চুলোয় দিল সব, ভাবল আমাদের ছাড়া গতি নেই। সবাই মদ টানতে লাগল বেশি রকম। একবার ফেঁসে গেল, একদিন রাস্তায় ব্রিগেডের কম্যান্ডার, কর্নেল আটকালে ওই মাতালদের। সবাই জানত লোকটা নিজেই মদ খেতে ভালোবাসত, সেইজন্যেই মাতলামির বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তার অত চাড়। লোকে তাই বলত, তবে বোধ হয় কথাটা ঠিক নয়, আমি নিজে তাকে কখনো মাতাল দেখি নি। আমার ছোকরাগুলোকে খুব এক চোট নিলে, আর যে সব সার্জেণ্ট টেলিফোনিস্ট ছিল তাদের হুকুম দিলে ফ্রণ্টে পাঠাতে। নতুন সাজ পোষাক দিলে আমাদের, আমেরিকান বুট দিলে ভারি টেকসই, ফৌজী ট্রেনে বোঝাই করা হল আমাদের, আমাদের সার্জেণ্টরা যাদের সঙ্গে পীরিত পাকিয়েছিল সে সব মেয়েগুলোর কী হাউমাউ।

'তাই চুয়াল্লিশ সালের গোড়ায়, শীতকালে, এলাম ফ্রণ্টে। অঢেল বরফ পড়েছিল সেবার। সুন্দর শীত, চারিদিকে অপার বন — পাইন গাছ, সারি সারি মাস্তুল একেবারে। গোলাগুলি কিছুই চলছে না, জার্মান আর আমরা দু'পক্ষ থেকেই শুধু রসুই ঘর আর শেল্টার ঘাঁটির ধোঁয়া। আর অঢেল গাছের দৌলতে শেল্টারগুলো আমাদের একেবারে রাজপুরীর মতো, ট্রেঞ্চগুলোও আমরা বাঁধাই করেছিলাম তক্তা দিয়ে — যেন কোথাকার সব জার্মান বাবু... যুদ্ধেরও নানা মুখোশ আছে। এমনও হয় যেন তেমন ভয়ের কিছু নেই, বলতে কি যেন মজারই ব্যাপার। যখন অবিশ্যি গোলাগুলি চলে কম... মানে

এলাম তো এই স্বর্গরাজ্যে, ফের ভর্তি হলাম ডিবিসনে, সিগন্যাল কম্পানিতে। বেশির ভাগ সময় ডিউটি দিতাম হেডকোয়ার্টারে, টেলিফোনে কখনো এ রেজিমেণ্ট কখনো সে রেজিমেণ্টের সঙ্গে কথা কইতাম: কী খবর, কী হালচাল, কিছু ঘটে নি তো?

'তা একদিন এই টেলিফোনের মধ্যে শুনি — আর গলা তো কম নয়, কত তোমার ইউনিট, প্লেটুন, দল — শুনি কি, একটা গলা যেন চেনা-চেনা মনে হল। তবে মনে তো কতই হয়! হপ্তা দুয়েক কাটল, একদিন ফের সেই গলাটা শুনলাম আর বলতে শুনলাম বেশ জোরে ফুর্তির সুরে: 'এই হল একটা কাজের মতো কাজ!' শুনেই চমকে উঠলাম আমি, কথাবার্তায় বাধাই দিয়ে বসলাম: 'সিনিয়র লেফটেন্যাণ্ট নেচায়েভ?' 'ক্যাপ্টেন নেচায়েভ। কে ডাকলে?' 'সার্জেণ্ট স্লেপৎসভ, মনে আছে হয়ত?' 'উহুঁ, মনে নেই!' 'তা তো বটেই, কতদিন আর মনে থাকবে। সঙ্গে ছিলাম তো মাত্র তিন দিন, তাও কত আগে, একচল্লিশ সালে, ইয়েলনার কাছে।' 'কী বললে, ইয়েলনার কাছে?' 'আমি ছিলাম আপনার টেলিফোনিস্ট, চেরেপানভের সঙ্গে।' 'আন্দ্রিউশা নাকি?' (তখন আমায় উনি আন্দ্রিউশা বলে ডাকতেন।) 'আন্দ্রিউশাই।'

'কিছুদিনের মধ্যেই আমি কমরেড নেচায়েভের ব্যাটালিয়নে যাবার একটা ছুতো জোগাড় করি। ডিবিসন থেকে ব্যাটালিয়নে যেতে চায় এমন লোক কম। ব্যাটালিয়ন হল ফ্রণ্টের কাছে, বিপদ সেখানে বেশি। কিন্তু আমাদের আবার ব্যাপার এই: যেতে চাইছে যখন তখন কিছুতেই ছাড়ব না। অনেক দিন ধ'রে সাধ্যসাধনা ক'রে তবে ছাড় পেলাম। ফের হাজির হলাম কমরেড নেচায়েভের পাশে। আর এই দ্বিতীয় বার যতদিন ছিলাম তার

মধ্যে ওঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে যায়। লোক চিনতে আমার ভুল হয় নি।

'চেরেপানভ সঙ্গে নেই, এই নিয়ে অবিশ্যি আফসোস করলাম আমরা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর চেরেপানভ চিঠি লিখেছিল, ফ্রন্টে আসার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে। যদিও সৈন্যদল থেকে তাকে বরাবরের মতোই খালাস দেওয়া হয়েছিল। আমি কমরেড নেচায়েভকে বলতাম, 'লিখুন ওকে, চলে আসুক।' উনি কেবলি বলতেন, 'নিশ্চয় লিখব, চলেই আসুক।' কিন্তু লেখেন নি। বুড়োর জন্যে মায়া হত।

'কমরেড নেচায়েভও তখন আর ঠিক একচল্লিশ সালের মতো নন। পোষাক আশাক তখন ভালোই, নিজের দিকে, এমন কি নিজের সাজসজ্জার দিকেও তখন নজর বেশি। টারপলিনের তৈরি হাইবুট নয় আর, চামড়ার হাইবুট। অবিশ্যি ঠিক নরম চামড়ার নয়। সব অফিসারেরই তখন নরম বুট, তবে ওঁর তেমন ছিল না।

'আগেই বলেছি, থাকতাম বনের মধ্যে, চার থাক কাঠের ডাগ-আউটে, কোনো গোলায় তার কিছু হবে না, আর আগুন পোয়াবার জন্যে কাঠেরও কোনো অভাব নেই। একেবারে স্বর্গ — যদি ওই দুষমন আর ওই উকুনগুলো না থাকত। মাপ করবেন ওলগা পেত্রভনা, কিন্তু এই উকুনগুলো আমাদের একেবারে জ্বালিয়ে খেয়েছে। লোকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলেই অমনি উকুনও জেঁকে বসে। অথচ সৈন্যেরা যখন আক্রমণ করছে, গর্তের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, পোষাক বদলাবার সময় নেই, হাত মুখও ধোয়া হচ্ছে না, তখন উকুন থাকলেও যেন আর থাকে না — কে আর সেদিকে মন দেয়। আর যেই গা হাত ধোবার সুযোগ হল, পরিষ্কার ইজের গেঞ্জি জুটল, অমনি ওরা এমন ছেঁকে ধরে যে একেবারে অসম্ভব। মস্ত এক উকুন নিধন যজ্ঞ

শুরু করতে হল — তামাকের থলি সমেত আমাদের সব সম্পত্তি ওতেই দিলাম।

'মনে আছে ভিতালি নিকোলায়েভিচ গল্প করেছিলেন: গোড়ায় গোড়ায়, মানে একচল্লিশ সালে সমস্ত অফিসার সৈন্যদের মধ্যে ওঁর গায়েই ছিল সবচেয়ে বেশি উকুন। কিছুতেই ভেবে পান না কী ব্যাপার। একজন সৈন্য তাঁকে জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়। বলে, 'অনেক ভাবেন যে। ভাবনায় উকুন বাড়ে।' ভিতালি নিকোলায়েভিচ এই গল্পটা আমাদের শুনিয়ে বলেন, 'এই ঝানু সৈনিকটি আমায় যা বোঝালে, তা নিয়ে ভেবে ভেবে বুঝলাম ব্যাপারটা কী। ভাবনায় উকুন বাড়ে — এই হল আসল কথা! তার মানে যে সব লোক মাথা খাটায় বেশি অথচ হাত দিয়ে কুটোটি ভাঙতে পারে না, তাদের গায়েই উকুনের বাসা।' এর পর থেকে নিজের দিকে নজর দিই, ঘন ঘন গা ধোবার চেষ্টা করতাম... নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকতে বিরক্ত ধ'রে গিয়েছিল... উকুনও রেহাই দিলে আমায়...

'কথাটা ঠিক, আমিও নজর করেছিলাম, ভিতালি নিকোলায়েভিচ তখন নিয়ম ক'রে গা হাত পা ধুতেন, রাতে পোষাক ছেড়ে ঘুমতেন, ঘুমাবার সময় এমন কি সব ভাঁজ ক'রে গুছিয়েও রাখতেন। আমায় বলতেন, যখন ঘরে ফিরব তখন লিওল্যা (আপনাকে লিওল্যা বলে ডাকতেন তিনি, ওলগা পেত্রভনা) অবাক হয়ে যাবে, খুশি হবে, আমায় আর চিনতেই পারবে না, ভালোবাসবে আরো বেশি ক'রে; হাসতেন কেমন মনমরার মতো, ওঁকে তো আপনি চেনেন ওলগা পেত্রভনা, বলতেন, 'তবে কে জানে, লিওল্যার পক্ষপুটে ফেরা মাত্র ফৌজী অভ্যেস সবই ভুলে যাব বোধ হয়...'

'সাদাসিধে লোক ছিলেন বটে, সকলের কাছেই খোলামেলা।

নানা রকম সব কথা শোনাতেন আমাদের। গোটাগুটি এক একটা উপন্যাস একেবারে মুখস্থ, নানা জ্ঞানবিদ্যার কথাও... দুনিয়ায় কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। ওঁকে তখন একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখনো তাহলে তিনি কেন পদাতিক দলে রয়েছেন, ব্যাটালিয়নের কম্যাণ্ডার হয়েই আছেন। তিনি কিন্তু হাসতেন, বলতেন, 'ভালো লেগে গেছে রে।' হয়ত সত্যিই ভালো লেগে গিয়েছিল, তবে আমার ধারণা যেখানে বিপদ কম, খানা বেশি, তেমন একটা জায়গায় ব্যবস্থা ক'রে নেবার ক্ষমতা ওঁর ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না।

'এমনি ক'রেই দিন কাটছিল। তবে জমকালো ডাগ-আউটে একই জায়গায় চিরকাল তো আর থাকা যায় না... উকুন আর ছিল না বটে, কিন্তু শত্রু ছিল।

'বরফ গলতে না গলতেই এসে গেল সব দেখা-না-দেখা কত কামান, বনের মধ্যে লোকে লস্করে হাতিয়ারে যন্ত্রে পাশ ফেরার আর উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত ঘুম বিশ্রামের পালা শিকেয় তুলে এগুলাম। এগুলাম নদীটা পর্যন্ত। মানে আমাদের প্রথম কম্পানি আর কি, মার্চের মুখেই জোর ক'রে নদী পেরিয়ে পশ্চিম তীরে ঘাঁটি গাড়লে। কিন্তু বাকি কম্পানিগুলো আর গোটা রেজিমেণ্ট কিন্তু পেরে উঠল না। নৌকো ছিল না, জার্মানরা আগেই তা হয় সরিয়ে নিয়ে যায়, নয় ধ্বংস করে ফেলে।

'ওপারে জার্মানরা আমাদের সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে, আর সৈন্যেরা আমাদের কেবলি হাউইয়ের সঙ্কেত পাঠাচ্ছে: লড়াইয়ের রসদ পাঠাও, রসদ পাঠাও! ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার হুকুম দিলেন হাতে যা উপায় আছে তার ভরসাতেই নদী পেরোও। কিন্তু জলের দিকে কেউ আর এগুতে চায় না, গোলাগুলিতে নদী একেবারে ফেনিয়ে উঠছে, তার ওপর

আবার জার্মানদের দেবতা এল ওদের সাহায্যে: ভয়ানক ঝড় উঠল, নদীতে ঢেউ উঠল একেবারে সমুদ্রের মতো।

'কে একজন এই সময় কার এক ঘরের উঠানে জেলে নৌকো পেয়ে টেনে আনল সেটাকে — ডিঙ্গি নৌকো, জলে নামালে, লড়াইয়ের রসদ ভরা বাক্স প্যাঁটরা চাপালে তাতে, কিন্তু নৌকো এমনি পলকা যে আঁতকে উঠতে হয়। দেখি ব্যাটালিয়ন কম্যাণ্ডার তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মুখ ভার ক'রে, হঠাৎ নিজেই এগিয়ে গেলেন নৌকোর দিকে। আমি গিয়ে বললাম, 'কমরেড ক্যাপ্‌টেন, আমি আপনাকে যেতে দেব না।' 'যেতে দিবি না মানে?' 'মানে তাই, যেতে দেব না। নৌকো টিকবে না, তলিয়ে যাবে।'

'কোনো জবাব না দিয়ে নৌকোয় উঠতে যাচ্ছেন। আমি বললাম, 'অন্তত সাঁতার দিতে জানেন তো?' হাসলেন, 'আমি? আমি ছিলাম ইনস্টিটিউটে পয়লা নম্বরের সাঁতারু। মস্কো এলাকার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিলাম।' এতে অবিশ্যি একটু হালকা লাগল। জিজ্ঞেস করেন, 'আর তুই?' বললাম, 'তা সাঁতারে আমি খারাপ নই, ইয়েনিসেই নদীতে বেড়ে উঠেছি তো।' বলেন, 'চমৎকার!' (চমৎকার কথাটা বলতে ভারি ভালোবাসতেন, আমরাও বলতে শুরু করেছিলাম, চমৎকার। নজর করে দেখেছি ওলগা পেত্রভনা, আপনিও চমৎকার কথাটা লাগিয়েছেন কয়েকবার। কেমন যেন সকলের কাছেই ওঁর মুখের কথাগুলো রপ্ত হয়ে যায়। আমি তো এখন বাড়িতেও চালাই... বৌ হাসে, 'শিখেছিস শুধু ওই এক কথা: চমৎকার আর চমৎকার!' আরো একটা জিনিস। অবাক হলে প্রায়ই বলতেন, 'আচ্ছা?' আমরা কিন্তু অমন ক'রে শুধোই না, প্রথম প্রথম হাসি পেত, পরে আমিও অমনি বলতে শুরু করি।)

'বললেন, 'চমৎকার! তাহলে একবার দেখিয়ে দেওয়া যাক।' ব্যাপারটা দাঁড়াল যে আমরা নদী পাড়ি দিচ্ছি, পেছনে পড়ে থাকছে সৈন্যেরা, লজ্জা হল আর কি। ওরাও যে যাতে পারে উঠে বসল।

'কী ভাবে যে নদী পেরলাম সে আর জিজ্ঞেস করবেন না, তবে পেরলাম, গিয়ে ঘাঁটিও গাড়লাম, আর শীগগিরই অন্যান্য ব্যাটালিয়নও পেরিয়ে এল... এর পরই ডিবিসনের কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল জাখারচেংকো আমাদের কাছে আসেন, কমরেড নেচায়েভকে নিজের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকেন — এটা দ্বিতীয় বার। গেলে বেঁচেই থাকতেন। জেনারেল তখন আমায় দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্যাতি পদক দেন (তৃতীয় শ্রেণীর পদক আগেই পেয়েছিলাম), আর ভিতালি নিকোলায়েভিচকে দেন পিতৃভূমির যুদ্ধ পদক।'

৯

সৈনিক যখন ভিতালি নিকোলায়েভিচের গল্প বলে যাচ্ছিল তখন ওলগা পেত্রভনার মনে পড়ছিল যে পনেরো বছর আগে বিয়ে করার পর ওলগা পেত্রভনা তার স্বামীকে ঠিক এইভাবেই নিয়েছিল, যেভাবে সৈনিকটি নিয়েছে তার কম্যাণ্ডারকে। তখন সে ছিল ঠিক এই রকমই ভাস্বর, খোলামেলা, অকপট, সুরসিক, এবং যে কাজ নিত সবেতেই শান্ত, নিপুণ। পরে তার অনুভূতি স্থূল হয়ে গেছে, নাকি স্বয়ং নেচায়েভই তার স্বচ্ছতা, স্ফূর্তি, বিজয়দীপ্তি হারিয়ে বসেছে? নাকি এ সব জিনিস সে আর লক্ষই করে না — অভ্যেস হয়ে গেছে, ধ'রে নিয়েছে চিরাচরিত ব'লে। নাকি এ সবই তার ক্ষীণ হয়ে এসেছিল জীবন যাত্রার পেষণে, সংসারে এবং দেশে যে সব বিকটত্ব দেখা দিয়েছিল তার

চাপে? (দুটো ব্যাপারেই ভয়ানক মনঃকষ্টে ভুগেছে সে) তার ম্লানিমার জন্যে ওলগা পেত্রভনাও কি দায়ী নয়, যদি অবশ্য সে সত্যিই ম্লান হয়ে গিয়ে থাকে?

কাজ করত সে। খাটত অনেক — এমন কি স্বাস্থ্যাবাসে যাবার সময়ও চুপি চুপি নিজের নকশাগুলোকে নিয়ে যেতে ভুলত না। কিন্তু কেমন ছিল তাদের আত্মিক জীবন, নিজস্ব জীবন? কাজ ছাড়া আর কী করত সে? সে কথা ভাবতে গিয়ে এখন হঠাৎ ভয়ানক স্পষ্ট হয়ে এমন একটা ব্যাপার তার মনে পড়ল যা সে আগেও জানত, কিন্তু কখনো সেটাকে অমন গুরুত্বপূর্ণ ব'লে ভাবে নি। তার আলস্যের ফলে যে শিক্ষাটা ওর অসমাপ্ত থেকে যায় সেটা শেষ করার জন্যে আর কেউ নয় ভিতালিই তো জেদ করেছিল, সেই তো তাকে বই পড়তে শেখায়, বুঝিয়ে দেয়। জীবনের বহিরঙ্গের মধ্যে থেকে গোপন কিন্তু প্রধান জিনিসটা ধরতে পারার নৈপুণ্য ও প্রশস্ত বোধশক্তি তার কিছুটা-বা অসাড় মেধার মধ্যে সন্তর্পণে, চুপিসারে, তার অভিমানে ঘা না দিয়ে সেই তো জাগিয়ে তোলে। এর ফলেই তো আজ সে এমন লোক হতে পেরেছে যাকে সহকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, সবাই যাকে গুরুত্ব দিয়ে নেয়, হতে পেরেছে সেই নারী যাকে ভালোবেসেছে কঠোর স্বভাব রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ ভিনোকুরভ। ওলগা পেত্রভনার জন্যেই নিজের স্ত্রীসন্তানদের পর্যন্ত ত্যাগ করতে সে দ্বিধা করে নি।

কেমন একটা অনুতাপ ও ব্যথিত অস্বস্তির সঙ্গে মিশে এই স্মৃতিগুলো তার দ্রুত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে জট পাকিয়ে ভেসে উঠছিল মনের মধ্য দিয়ে। স্লেপৎসভ যখন নদী পার হবার কথাটা বলতে শুরু করলে কেবল তখনই এ সব স্মৃতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থমকে গেল।

মুখখানা তার হঠাৎ লাল হয়ে উঠতে দেখেছিল স্লেপৎসভ, ভেতরে ভেতরে কিসে যেন আগুন ধরেছে। ঠোঁট কামড়ালে ওলগা পেত্রভনা, চোখ মুদলে। তার বিবরণের ঠিক কোন খুঁটিনাটিতে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটল সেটা স্লেপৎসভের জানার কথা নয়।

সে প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল কারণ স্লেপৎসভ যখন এই কথা বলে যে ভিতালি সাঁতারে প্রাইজ পেয়েছিল — আর সত্যি সত্যিই ওলগা পেত্রভনার তখন মনে হয়েছিল যেন সে হুবহু ভিতালির গলার স্বর, তার কথা বলার টানটা পর্যন্ত শুনছে — তখন ওলগা পেত্রভনার হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে ভিতালি আদৌ সাঁতার জানত না, তা নিয়ে বরাবর তার একটা লজ্জা ছিল। তাই নদী তীরে সে যা কিছু বলেছিল তা সবই বাজে কথা, মিছে কথা, যদি অবশ্য সাধারণ স্বার্থের জন্যে আত্মোৎসর্গের নিখাদ সোনাকে মিছে কথা, বাজে কথা ব'লে অভিহিত করা যায়। সেই মুহূর্তে ওলগা পেত্রভনা টের পেয়েছিল তার দম আটকে আসছে। আর আড়াই বছর পরে সে যেটা জানল সেটা যে স্লেপৎসভ এখনো জানে না এই কথা ভাবতেই মনটা তার নিপীড়িত আকুলতায় উদ্বেল হয়ে উঠল সেই মানুষটার জন্যে যে চারিদিকে গুলিবর্ষণের মধ্যে ঝোড়ো নদীতে পাড়ি দিয়েছিল এক পলকা নৌকোয়; এই ভেবে তার গর্ব হল যে সে মানুষ তার কথাই ভেবেছিল, তাকে ভালোবাসত। কাকে সে হারাল সেটা সে যে বোঝে নি এই একটা অস্থির ক্ষোভে মন ভ'রে উঠল তার।

টের পেল সে এই নতুন ভিতালি নেচায়েভকে ভালোবাসতে উন্মুখ, তার এই দুঃসাহস, মেধা, মৃত্যুর প্রতি তাচ্ছিল্য, তার এই মোহনতা — তার সেই সবকিছু যা মানুষ ও পুরুষ সম্পর্কে ওলগা পেত্রভনার নিজ আদর্শের সঙ্গে মেলে। কী ক'রে

সে নেচায়েভকে নীরস একঘেয়ে বলে ভাবতে পেরেছিল যখন সর্বোত্তম মানবিক গুণ তার মধ্যে ছিল অঢেল এবং অপরূপ এক সামঞ্জস্যে? এ সবই তার গলে গেছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো।

এ সব চিন্তাই সে ঝেড়ে ফেলতে পারত, বহুবারই সে তা ঝেড়ে ফেলেছে এই ভেবে যে জীবনের স্থূল চাহিদার কাছে বিমূর্ত ভাবনায় কোনো অর্থ হয় না। হ্যাঁ, সংসারের নিরাপত্তা ও তার অস্তিত্বের সুষ্ঠুতার জন্যে সে এই 'নিষ্ফল কাঁদুনি' ঝেড়ে ফেলতে পারে কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

কিন্তু এখন সে আর এই সব ভাবনার হাত ছাড়াতে পারল না, হাতকাটা সৈন্যের উজ্জ্বল চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, তার নির্মল উষ্ণ ঝলক তাকে সরতে দিচ্ছে না, সাংসারিক অভিজ্ঞতার ওপর, আশেপাশের লোকজনদের দৃষ্টান্তের ওপর ভর করতে সে পারছে না। এ চোখ তাকে বলছিল: তুমি ছিলে বীরের সহচারিণী, কিন্তু বোঝো নি।

একটা শোক, একটা ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল ওলগা পেত্রভনা, অচিরেই সেটা তার অলক্ষ্যেই পরিণত হল কেমন একটা বিষাদে, বলতে কি কেমন একটা উষ্মায়। প্রায় বিদ্বেষের চোখে সে স্লেপৎসভকে দেখতে শুরু করলে, যেন মনে মনে জবাবদিহি করছিল তার কাছে: 'আমি তো আর তাকে খুন করি নি, করেছি? কেন ছাই অমন চেয়ে আছ একদৃষ্টে? আমার দোষটা কোথায়?'

শুকনো চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মনে মনে এই ভাবেই যুক্তি দিলে সে। চোখ তার স্থির হয়ে রইল কোণের একটা মাকড়সার জালে, পলেস্তরার একটা ফাটলে, ভাবতে লাগল ফ্ল্যাটটার চুনকাম মেরামতি করা দরকার, এবং এই মুহূর্তে সে

ভাবনার কোনো প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও সেটা সে আঁকড়ে ধ'রে রইল, প্রায় গোঁয়ারের মতো, হিংস্রের মতো ভাবতে লাগল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাফসুফ, মেরামতি! জীবনটা জীবনই, ধন্ধ ধ'রে বসে থাকা চলে না।

উঠে দাঁড়িয়ে ঝটকা মেরে টেবলের আলো জ্বালালে সে। এই সময় করিডরে কী যেন নড়াচড়া শুরু হল, দরজা খুলল, ভেসে এল ভাজা পেঁয়াজের গন্ধ, মাঝ গ্রীষ্মের বৃষ্টির মতো স্টোভ জ্বলার শব্দ, বসন্তের ঝড়ের মতো ঝাড়ুর খড় খড়, সংসারের আরো নানা গন্ধ ও গুঞ্জন, সবই তুচ্ছ কিন্তু খোদ জীবনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ওলগা পেত্রভনার মনে হল যেন ঘরখানায় বড়ো বেশি ঠাণ্ডা বাতাস, শীগগিরই আসছি ব'লে তাড়াতাড়ি ক'রে সে ফিরে গেল তার নিজ সংসারের পরিচিত গন্ধ ও শব্দগুলোর মধ্যে।

১০

সবুজ ঢাকনার তলে টেবল ল্যাম্পটার আলোয় নদীর তলদেশের মতো সবুজাভ ও রহস্যময় হয়ে উঠল ঘরখানা। আর ঘরটা আলো হতেই জানলাটা হয়ে উঠল অন্ধকার, হঠাৎ যেন গভীর রাত নেমে এসেছে। স্লেপৎসভ পকেটে তাঁর তামাকের থলিটা একবার হাতড়ে দেখলে, কিন্তু সিগারেট পাকালে না। ওলগা পেত্রভনার ফেরবার আশায় ব'সে রইল সে নিশ্চল হয়ে, যেন যা তার বলার কথা তার কিছুই যেন সে এলোমেলো করতে চায় না। ওলগা পেত্রভনা কিন্তু আসছিল না, তাহলেও স্লেপৎসভের মধ্যে কোনোই অধীরতা দেখা গেল না, সবুজ আলোটা যেন তাকে প্রশান্তিতে ভরে তুলেছিল, সে আলো যেন তার কাহিনীরই একটা অঙ্গ, যে আধা-রূপকথার

রাজ্যে সে এখন বিচরণ করছে তারই একটা স্বাভাবিক বিকিরণ। ভাবছিল সে, এখানে, এই উষ্ণ, নিবিড়, আলো-জ্বলা জগতটার জন্যে নেচায়েভ যে অমন উন্মুখ হয়ে থাকতেন, সেটা সত্যিই অকারণে নয়। নেচায়েভের সঙ্গিনী, এ গৃহের কর্ত্রীর প্রতি কোমলতায় মন ভ'রে উঠল তার।

ওলগা পেত্রভনা ফেরার পর গল্প চালিয়ে গেল সে:

'আপনার কথা, ওলগা পেত্রভনা, আপনার স্বামী এতই গল্প করেছেন যে মনে হয় যেন আপনি আমার কাছে কতকালের চেনা; আর শুধু কি আমি, আমার বৌ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আমার ছেলেরা — এরাও সবাই আপনার কথা জানে, আপনার জন্যে যা বলবেন করতে রাজী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কথা উনি আমায় সবই বলেছেন। বলেছেন, কী ভাবে সব সময় আপনি ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, কাজ করেছেন, ইউরা কোলে থাকতেই ইনস্টিটিউট শেষ করেছেন। আজ ইউরাকে দেখলাম, একেবারে বাপের আদল, ওই রকমই উঁচু মন, সৎ। সৎ — এই হল সবচেয়ে বড়ো কথা।'

এই সময় গাঢ় রঙের স্যুট পরা একটি লোক ঢুকলে ঘরে। বেশ লম্বা চেহারা, চোখে চশমা, মুখখানা জোয়ানের মতোই, কিন্তু চুল পাকা। স্লেপৎসভের পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথা নেড়ে নমস্কার করলে। নতুন লোকটা যেই হোক গল্প থামিয়ে গ্রাম্য রীতি অনুসারে সাড়ম্বরে সসম্মানে অভিবাদন জানাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল স্লেপৎসভ — কিন্তু ওলগা পেত্রভনা কিছুই বললে না এবং নতুন লোকটাও একটা সুদীর্ঘ পরিচয়ানুষ্ঠানের জন্যে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে শুধু অস্ফুট স্বরে কী যেন বললে, সেটা সম্ভবত তার উপাধিই হবে, তারপর গিয়ে আশ্রয় নিলে সেই আরামকেদারাটাতেই যেখানে সকালে ঘুমিয়েছিল স্লেপৎসভ। সৈনিক তাই অনিশ্চিতের মতো আরো খানিকটা

দাঁড়িয়ে থেকে ব'সে পড়ল এবং গল্প চালিয়ে গেল। শুধু টেবলের কাছ থেকে একটু সরিয়ে নিলে চেয়ারটা যাতে আগন্তুকের দিকে পেছন ফিরে না বসতে হয়।

বলবার সময় আগন্তুকের অস্তিত্বের কথা সে ভুলেই যাচ্ছিল, শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ মনে পড়ায় সৌজন্যের খাতিরে মুহূর্তের জন্যে অল্প একটু মাথা ফেরাচ্ছিল তার দিকে।

স্লেপৎসভ বলছিল, 'তাঁর শেষ কথাগুলো, শেষ ভাবনাও আপনাকে নিয়ে। আপনাকে নিয়ে আর দেশকে নিয়ে। দেশকেও ভালোবাসতেন তিনি, কিন্তু তা নিয়ে কথা বলতেন কম। শুধু জীবনটাই দিয়ে দিলেন দেশের জন্যে, আমাদেরও বলে গেলেন, দরকার পড়লে যেন্ জীবন দিতে পারি।

'জখম হয়েছিলেন জার্মান ব্যূহ ফতে করার সময়, আমি তখন কাছে ছিলাম না, ছুটে গেলাম দেখতে, ওঁকে একটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পেছন দিকে। কিন্তু ভয়ানক ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়িটা, যন্ত্রণা হচ্ছিল ওঁর। তখন আমরা তাঁকে তুলে স্ট্রেচারে শোয়াই। উনি আমার বাঁ হাত ধ'রে জোরে চাপ দেন। এত জোরে যে হাতে কালশিটে প'ড়ে যায়। এই যে এইখানটায়... মানে সে হাত তো আমার এখন আর নেই... এই হল ব্যাপার। উনি আমায় বলেন, আপনার কাছে যেন আসি, ওঁর সব কথা, আপনার জন্যে ওঁর সব ভালোবাসার কথা যেন আপনাকে বলি... টুকিটাকি জিনিসও যেন আপনাকে পেঁছে দিই, মানে স্মৃতি হিসাবে আর কি... ভালো কথা, এই লগারিদম স্কেলটা সৈন্যেরা পায় একটা বাড়িতে, সবাই জানত কমরেড নেচায়েভ ইঞ্জিনিয়র তাই এটা এনে দেয় ওঁর কাছে। উনি সেটা আপনার জন্যে উপহার হিসাবে জমিয়ে রাখেন, সে কথা আমায় বলেছিলেন। হাত ঘড়িটা — এটাও একটা ট্রফি, একজন সৈন্য এটা ওঁকে এনে দিয়েছিল, উপাধি তার তেরেখভ,

অল্প বয়স, পরে মারা পড়ে... এই হল ব্যাপার, ওলগা পেত্রভনা... পরে অবিশ্যি লড়াইয়ের প্রচারপত্রে বলা হয় যে আমাদের ব্যাটালিয়ন কম্যান্ডারের মৃত্যুর জন্যে প্রতিশোধ নেব... মরদ সবাই — একসঙ্গে সবাই কাঁদছে, এমন ব্যাপার দেখেছেন কখনো? সে খুব কম দেখা যায়...'

চুপ ক'রে গেল স্লেপৎসভ, ভয়ানক ঢিপ ঢিপ করছিল তার হৃৎপিন্ড, শেষ পর্যন্ত সেটা যখন থামল, তখন ঠাহর হল ঘরখানা স্তব্ধ নীরব। এ গল্প শুনিয়ে যাকে স্পষ্টতই অমন বিচলিত ক'রে তুলেছে, তার জন্যে মায়া হল তার। আরামকেদারায় বসে থাকা লোকটার কথাও এই সময় মনে পড়ল তার, সৌজন্যের খাতিরে তার দিকে অর্ধেক মাথা ঘোরালে সে। আর সেই মুহূর্তেই তার প্রতি কেমন একটা অনির্দিষ্ট বিরূপতাও সে বোধ করল, কেন কে জানে, হয়ত এইজন্যে যে লোকটা আরামকেদারায় গা এলিয়ে আছে যেন তার নিজের ঘর, মুখখানায় তার অটল প্রশান্তি। হয়ত এটাও একটা কারণ যে লোকটার আবির্ভাবের পর থেকে ওলগা পেত্রভনার ব্যবহার যেন আগের চেয়ে বদলে গিয়েছিল: ঘন ঘন চেয়ার ছেড়ে উঠছিল সে, ফের বসছিল, নুনদানিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, কয়েকবার স্লেপৎসভের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকায় লোকটার দিকে। কিন্তু এই আবছা অনুভূতিগুলো এতই ওপরকার ব্যাপার যে তার দিকে বিশেষ মন গেল না স্লেপৎসভের। কিছুটা নীরব থাকার পর সে লোকটার দিকে অর্ধেক ফিরে বললে:

'আমি জখম হই ওই চুয়াল্লিশ সালেরই ডিসেম্বরে, হাঙ্গারিতে। বহুকাল চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরি, সাইবেরিয়ায়। জানেনই তো, শত্রু আমাদের ও এলাকা পর্যন্ত পেঁছিতে পারে নি, আমাদের ওখানে সবই ঠিক ছিল, কোনোই ভাঙচুর নেই।

বলতে কি, হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে তাজ্জব ব'নে গেলাম, মাইরি, মাইরি! গোটা বাড়িটা একেবারে আস্তো ... অবিশ্যি কলখোজটা আগে বেশ ধনধান্যে ভরাই ছিল, যুদ্ধের সময় অবস্থা তার ভারি কাহিল হয়ে ওঠে... মরদ কম, ফ্রণ্টের জন্যে ফসল দিতে হত অনেক, প্রায় সবই... প্রথম দিকে ভেবে পেতাম না কী কাজে লাগব, বেকার ঘুরে বেড়াতাম। বৌ আমার মনের জ্বালাটা বুঝত, ধনি্য মেয়ে বটে। সারা দিন দাওয়ায় ব'সে থাকি, সিগারেট খাই, সবাইকে গালাগালি দিই, সব দাঁতগুলো কড়মড় করি — তার জন্যে গালমন্দ কিছু করত না, শুধু মাঝে মাঝে কাঁদত, তাও চুপি চুপি একটু আধটু। সেটা অবিশ্যি আমার নজরে পড়ত, কিন্তু মনটা আমার যে পোড়া-পোড়া, কী করব। তা আস্তে আস্তে সয়ে গেল, প্রথমে চৌকিদারের কাজ নিলাম, তারপর রাখালির কাজ, তারপর মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনে আমার এক বন্ধু আমায় একটা হাত বানিয়ে দিলে, লোহার হাত, চিমটের মতো আর কি, শীগগিরই ট্র্যাক্টরে চেপে বসলাম। খবরের কাগজেও আমার কথা লিখেছিল, আমি নাকি প্রায় এক বীর। তবে বীর তো আর আমি নই, এ সবই যা করেছি নিজের জন্যে, বুঝেছিলাম যদি একা একা থাকি, লোকের কোনো কাজে না লাগি, তাহলে মারা পড়ব। দু'লোকের নর্ম পূরণ করেছি। ফসল তোলা শেষ হতেই ছুটি নিয়ে চলে এলাম...'

১১

নিজের বিরূপতা জয় ক'রে এই শেষ কথাগুলো স্লেপৎসভ বললে আরামকেদারায় বসা লোকটার দিকে ফিরে, নেচায়েভের ঘরে যে লোক বসে আছে তার প্রতি অভদ্রতা করার ইচ্ছে হল

না তার। গল্পের সময় বার বার উঠ বস করছিল ওলগা পেত্রভনা, এই সুযোগে ফের উঠে দাঁড়াল সে।

'এবার খেতে বসা যাক,' ব'লে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অতীত স্মৃতিতে স্লেপৎসভ তখনো আলোড়িত, লক্ষ করল যে ওলগা পেত্রভনাও আলোড়িত হয়ে উঠেছে, কোমল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার গমনপথের দিকে, তারপর ফের লোকটার দিকে ফিরল। লোকটা কিন্তু মুখ হাঁড়ি ক'রে, অথবা স্নায়বিক কোনো একটা উত্তেজনায় চুপ ক'রেই রইল। অস্বস্তি বোধ ক'রে স্লেপৎসভ বললে:

'এই হল ব্যাপার, মশায়... মানে আপনার নামটা ঠিক...'

'রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ,' বললে লোকটা।

'এই হল ব্যাপার, ভিয়াচেস্লাভ ইভানোভিচ,' বিরল অমন একটা নাম পুরো ধরতে না পেরে ব'লে চলল স্লেপৎসভ, 'ওলগা পেত্রভনা ভেঙে পড়েছেন... বোধ হয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি হল... সব অত খুঁটিয়ে... কিন্তু ঐ যে বলে, গানের কথা তো বদলানো যায় না... অমন একটা মানুষকে হারানো...'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে সায় দিলে লোকটা।

স্লেপৎসভ মন দিয়ে দেখলে ওর দিকে, জিজ্ঞেস করলে:

'বিধবা মানুষ, বন্ধুবান্ধবরা যেমন সাধ্য সাহায্য করে নিশ্চয়?'

লোকটা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর তেমনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে:

'হ্যাঁ।'

এবং যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু দুয়োর খুলে ঢুকল

ওলগা পেত্রভনা। প্লেট নিয়ে এসেছিল সে, সাজিয়ে রাখতে লাগল টেবলের ওপর।

এই সময় ওপাশে কে'দে উঠল মেয়েটি, কিন্তু কান্না শুনেও ওলগা পেত্রভনা আগের মতোই ধীরে ধীরে সযত্নে প্লেট সাজাতে থাকল। শেষ পর্যন্ত আধখোলা দরজায় পাশার গোলগাল মুখটা দেখা গেল। বললে:

'কেবলি কাঁদছে, ওলগা পেত্রভনা,' এই বলে আড়চোখে তাকালে সৈন্যের দিকে। এবারেও গিয়ে সে তার 'সেশে খেশে' মন্ত্র পড়ে মেয়েটিকে শান্ত করবে কি...

স্লেপৎসভ মুচকে হেসে জবাব দিলে তাকে আর বিরক্ত স্বরে ওলগা পেত্রভনা বললে:

'এক্ষুণি যাচ্ছি।'

খুকিটার কান্না শুনে কষ্ট হচ্ছিল স্লেপৎসভের, কিন্তু ওলগা পেত্রভনা কাছে যেতেই কান্না থেমে গেল।

আচমকা এই রকম কান্না থেমে যাওয়ায় স্লেপৎসভের মুখে প্রথমটা হাসি ফুটেছিল, কিন্তু হঠাৎ সে হাসি যেন অসাড় হয়ে গেল, কোমল হাসি হয়ে উঠল বিস্ময়ের হাসি, প্রায় ছেলেমানুষের মতো বোকা-বোকা হাসি, তারপরে একেবারেই সে হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে — কেমন যেন বিব্রত, বিহ্বল এবং শেষ পর্যন্ত মরার মতো গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। তাকিয়ে দেখল সে লোকটার দিকে, ঘরের মাঝখানে আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন জানে না থাকবে কি যাবে।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্লেপৎসভ, এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দ্রুত দৃঢ় পদে এগিয়ে গেল নিজের ঝোলাটার দিকে, তার ভেতর থেকে বার করলে একটা শাদা পুঁটলি, টেবলের কাছে এসে পুঁটলিটা খুলতে লাগল।

খুলে নানা রকম জিনিস বার ক'রে রাখলে টেবলে, আর যে রুমালটায় তা বাঁধা ছিল সেটি সযত্নে পাট ক'রে পকেটে পুরলে। উর্দির পকেট থেকে এক তাড়া ফটোগ্রাফ বার ক'রে সেটাও টেবলে রাখলে উপুড় ক'রে। তারপর ফিরে গিয়ে আবার বাঁধলে ঝোলাটা।

এই সময় ছোট্ট তীব্র একটা ঘণ্টা শোনা গেল, দুয়োর খুলল, লাজুক হেসে ঘরে ঢুকল ইউরা। গায়ে তার ওভারকোট, হাতে ফোলিও ব্যাগ। হাঁপাচ্ছিল সে, ছুটে এসেছে পাছে সাইবেরিয়া থেকে আসা সৈনিক, তাইগাবাসী, মৎস্যশিকারীকে আর দেখতে না পায়। দেখলে সৈনিক যায় নি, ঘরখানা চনমনে নানা গন্ধে ভরপুর: ফৌজী খাকির গন্ধ, ভালুক মাংসের গন্ধ, ধূম্রপক্ক মাছ, ফ্রণ্টের রাস্তা আর তাইগার গন্ধ।

একটু লাজুক হেসে ইউরা এগিয়ে গেল সৈনিকের কাছে, আশা করেছিল সৈনিক তাকে জড়িয়ে ধ'রে কাছে টেনে নেবে, সকালের মতোই ভালোমানুষের মতো সাগ্রহে বক বক ক'রে কিছু একটা বলবে। সৈনিক কিন্তু আনমনার মতো ওর কাঁধে থাবড়া মেরে নীরবে কীসের যেন অপেক্ষা করতে লাগল। তাতে ইউরাও আড়ষ্ট বোধ করলে কেমন যেন, সেও দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। আপন আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে ঘরের তিনজনই দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল, কী যেন প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ঘরে এল ওলগা পেত্রভনা, স্লেপৎসভ তার দিকে না তাকিয়ে শুকনো গলায় দ্রুত ব'লে গেল:

'ওই টেবলের ওপর, সেই জিনিসগুলো আর কি। ওঁর ঘড়ি, চশমা, ফাউণ্টেন পেন, ডায়েরি বই, চিঠিপত্র, ফোটো। উপহারগুলোও আছে, আপনার জন্যে লগারিদম স্কেল, আপনার ছেলের জন্যে ড্রয়িং বাক্স আর হাত ঘড়ি। আরো

দুয়েকটা জিনিস আছে, ওঁর কাছে যা ছিল সবই। বাস। আমায় এবার যেতে হয়। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।'

ফৌজী কোটটা পরতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ চোখ পড়ল ইউরার দিকে, মুহূর্তের জন্যে তার চোখটা হয়ে উঠল ইস্পাতের মতো, কোটটা রেখে সে ফের এগিয়ে গেল টেবলের দিকে, হাত ঘড়িটা নিয়ে সে নীরবে সেটা গুঁজে দিলে ইউরার হাতে।

ওলগা পেত্রভনা টেবলের ওপর ছুরি কাঁটা রেখে সহজ গলায় বললে:

'সে কী? মানে, আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন না? কী আফসোস... আপনার সদাশয়তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। ভারি কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু থেকে যান না? তাছাড়া অত দূর থেকে এসেছেন, সাইবেরিয়া থেকে, তাই না? আসতেও পয়সা নিশ্চয় কম লাগে নি... না, না, সত্যি বলছি, টাকা লাগবে আপনার? কোনো সংকোচ, কোনো ভদ্রতা করবেন না, বলুন। সত্যি, ভিতালি নিকোলায়েভিচের পরিচিত, ফ্রন্টের কমরেড হিসাবে। বলুন... আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন? কোথায় উঠেছেন আপনি?'

ওলগা পেত্রভনা যতক্ষণ বলছিল, স্লেপৎসভ ততক্ষণে নীরবে তার ফৌজী কোট পরার চেষ্টা করছিল, কিছুতেই পেরে উঠছিল না। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না, যা ঘটেছে তাতে আর পঙ্গুকে সাহায্য করতে গেলে যে অস্বস্তি সম্ভব তার আশঙ্কায় সবাই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

ওলগা পেত্রভনার শেষ কথার জবাবে স্লেপৎসভ বললে:

'আত্মীয়দের ওখানে রাত কাটাব। মস্কোয় আত্মীয় আমার

আছে। সাইবেরিয়ার লোকেরা আজকাল নেই কোথায়? সবখানেই আছে তারা।'

শেষ পর্যন্ত ফৌজী কোটটা পরে থলি আর টুপিটা হাতে নিলে সে।

'তা ঠিক,' খাবারের আলমারি থেকে রুটি বার ক'রে টেবলে রাখতে রাখতে বললে ওলগা পেত্রভনা, 'আমাদের ইনস্টিটিউটেও সাইবেরিয়ার লোক আছে, বৈষয়িক দপ্তরের উপ-অধ্যক্ষ। কিছু দিন হল এসেছেন। আপনি হয়ত চিনবেন ওঁকে, লেওন্তি বরিসোভিচ স্ভের্বেয়েভ। তবে তা সত্যি, সাইবেরিয়া তো এইটুকু জায়গা নয়...'

'হ্যাঁ,' স্লেপৎসভ বললে, 'সাইবেরিয়া অনেক বড়ো জায়গা। আসি ইউরা... ওলগা পেত্রভনা... চলি মশায়।'

থলিটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

১২

স্লেপৎসভকে দরজা পর্যন্ত পেঁৗছে দেবার জন্যে পেছু পেছু গেল ইউরা, কিন্তু পরে খাবার ঘরে আর ফিরল না, বেশ শোনা গেল খাবার ঘরের দরজা পেরিয়ে ও চলে যাচ্ছে।

বাইরের দরজা বন্ধ হবার পর ইউরার পায়ের শব্দ খাবার ঘরের ডান দিক থেকে দরজার পাশ দিয়ে বাঁ দিকে রান্নাঘরে অথবা শোয়ার ঘরে মিলিয়ে যেতেই রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ ঝটকা মেরে ওলগা পেত্রভনার দিকে ফিরল, বললে:

'কী করলে তুমি! বুঝতে পারছ কী করেছ? উঁচু মনের একজন লোক এসেছিল আমাদের এই ঘরে, খাঁটি লোক, বুঝেছ, মহাত্মা লোক, আর তুমি তাকে টাকা দিতে চাইলে!'

ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে ব'লে চলল সে, 'ভিতালি নিকোলায়েভিচের স্মৃতির প্রতি কী নিষ্ঠা তার, সেটা দেখলে না, কী ভালোবাসা!' এবং পুরুষের সমস্বার্থতায়, নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের চিরন্তন এক গোপন ঐক্যবোধে ওলগা পেত্রভনার দিকে তীব্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে, 'ঠিকই, স্বামী তোমার ছিল অসাধারণ এক লোক। অনবদ্য লোক। এমন একজন লোককে... এমন লোককে ভোলা অনুচিত। এমন লোককে ভুলে যেতে পারে কেবল... কুত্তার বাচ্চা।'

বাক্যের এমন রূঢ় সমাপ্তিতে সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের কোনো কথা বলার ইচ্ছা তার ছিল না। স্লেপৎসভের সঙ্গে ওলগা পেত্রভনার শেষ কথাগুলো অত্যন্ত রকমের বিশ্রী, এবং চরিত্রের এই রকম একটা বিশ্রী দিক প্রকাশ করায় রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ অত্যন্ত চটে গিয়েছিল তা সত্যি। কিন্তু যে গালাগালিটা সে দিয়েছে সেটাকে অল্পই বলা যেত, যদি না সে জানত যে ওলগা পেত্রভনাকে ছাড়া সে থাকতে পারবে না, সব সত্ত্বেও সে তাকে ভালোবাসে, এবং এমন কি এখনো যখন সে তাকে দেখতে পারছে না, প্রায় ঘেন্নাই করছে, তখনো সে ভালোবাসা তার যায় নি।

সেই সঙ্গে এটাও তার জানা ছিল যে স্লেপৎসভের প্রতি এই রূঢ়তার মধ্য দিয়ে ওলগা তার প্রথম স্বামীর স্মৃতি ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল শুধু ভিনোকুরভের জন্যেই, সংসারের শান্ত নিষ্কণ্টক জীবন ধারার জন্যেই, ভিনোকুরভকে ভালোবাসার জন্যেই সে যেন লড়াই করছিল নিজ অপরাধবোধের সঙ্গে। তাই ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই তার এই একটা প্রীতিকর গর্ববোধও ছিল যে তার জন্যেই অন্য লোকটাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে, তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে — এবং তা করা হচ্ছে এমন একজনকে

যে অসাধারণ লোক। এবং শেষত, যুক্তিহীন হলেও সেই সঙ্গেই একটা তিক্ত ঈর্ষাবোধ না ক'রে সে পারছিল না — তবে ঈর্ষা কি আর কখনো যুক্তি মেনে চলে। কিন্তু তার এ ঈর্ষাটা যুক্তিহীন এই দিক থেকে যে সেটা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে নয়, শুধু এই অনুমানটা কেন্দ্র ক'রে যে রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ নিজেও যদি মারা যায় অথবা দীর্ঘদিনের জন্যে কোথাও উধাও হয়, তাহলে ওলগা পেত্রভনা তৃতীয় আরেকজনকে ভালোবাসবে এবং তাকে ভালোবাসবে ঠিক এমনি প্রবল, নিশ্চিত, দ্বিধাহীন ভাবেই, নিজের উদ্বেগ ও উষ্ণতা দিয়ে ঘিরে রাখবে তাকে, যে কোনো উপায়ে রক্ষা করবে সে ভালোবাসা।

এই অনুভূতি — ওলগার জন্যে ভালোবাসা ও কামনা, সেই সঙ্গে তার মধ্যে যে আত্মিক স্থূলতা ও সংবেদনহীনতা দেখা গেল তার জন্যে ব্যথা, সুন্দর একটি মানুষের স্মৃতিকে অপমান করার জন্যে ক্ষোভ, সেই সঙ্গে ওলগা পেত্রভনা তাকে, তার বর্তমান স্বামীকে এত ভালোবাসে ব'লে একটা সুখগর্ব, আবার বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে তাকে সে ভালো নাও বাসতে পারে এই আশঙ্কা — এ সবই তার হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলল যা নিমের মতো তেতো, মধুর মতো মিষ্টি। তবে নিমের ভাগটা এবার ছিল বহু পরিমাণ বেশি। স্লেপৎসভ যখন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন স্ত্রীর গালে চড় মারতে পারত ভিনোকুরভ। কিন্তু একটা কথাও সে বলে নি, ঠিক করেছিল আদৌ সে এতে মাথা গলাবে না, এটা তো তার ব্যাপার নয়, ওলগা পেত্রভনার অতীতের ব্যাপার; আফসোস হচ্ছিল যে শোবার ঘর থেকে স্লেপৎসভের কাহিনীর খানিকটা তার কানে গিয়েছিল, তারপর খাবার ঘরে এসে একজন সাক্ষী হয়েই সে বসে। কিন্তু স্লেপৎসভ যখন চলে গেল, চাপা শব্দে

বন্ধ হল সদর দরজা, এবং কিছু একটা জঘন্য ব্যাপার ঘটল এটা পুরো না বুঝলেও অমনি কিছু একটা অনুভব ক'রে ইউরা যখন খাবার খেতে না এসে চলে গেল দরজার পাশ দিয়ে তখন ভিনোকুরভ না ফেটে পড়ে পারল না।

'কী করলেন আপনি?' ফের বললে সে, আরো বেশি বেঁধাবার জন্যে তুমি ছেড়ে আপনিতে চলে এল সে, 'এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কোথাও সে ওঠে নি, আত্মীয়ের কথাটা ও মিছে ক'রে বললে, সেটুকুও কি আপনি বোঝেন নি? এটুকুও কি আপনার মাথায় ঢোকে নি যে টাকার জন্যে যদি আসত তাহলে সোজা সোনার ঘড়িটা আর বাকি জিনিসগুলো বেচে দিলেই চুকে যেত? এটুকুও আপনার খেয়াল হল না?'

দু'চোখে ঘৃণা নিয়ে সে তাকিয়ে দেখছিল ওলগা পেত্রভনাকে।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' ধীরে ধীরে প্রায় শান্ত সুরে বললে সে, 'সত্যি, আপনার মতো একজন লোকের জন্যে ভিতালি নিকোলায়েভিচের স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমি পারলাম কী ক'রে?' উদ্দেশ্যহীনের মতো ওলগা পেত্রভনা হেঁটে গেল টেবিল বরাবর, তারপর খাবারের আলমারিটা পেরিয়ে দু'পা এগুল দুয়োরের দিকে, কিন্তু ফিরে এল, চেয়ারে বসলে, যে চেয়ারটিতে বসেছিল সারাদিন। তারপর কেঁদে ফেললে, 'ও যে আর কখনো... কখনো... কখনো...' কান্নার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

প্রথম দিকে এ কান্নায় রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচের মনে কোনো ভাবান্তর হয় নি। বরং উল্টো। মনে হয়েছিল কী ধূর্তের মতো সে আত্মরক্ষা করছে, কী আচমকা তার বিরুদ্ধে

যোগ দিচ্ছে ভিতালি নিকোলায়েভিচের সঙ্গে। কিন্তু শীগগিরই নতুন একটা মোচড় দিল বুকে। সত্যি, এর আগে তো ওকে কখনো কাঁদতে দেখে নি সে, কথাটা মনে হতেই টের পেল কী ভয়ানক নাড়া খেয়েছে ওলগা। একটা অপরাধবোধ খোঁচাতে লাগল তাকে। মনে হল স্লেপৎসভের প্রতি ওলগা পেত্রভনা যে রকম একটা হঠকারিতা ও উদাসীনতা দেখিয়েছে, সেও তাই। বললে:

'থাক ওল্যা, থাক গে, এখন তার সময় নেই। লোকটাকে এখন গিয়ে ধরে ফিরিয়ে আনা দরকার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলেই চট ক'রে উঠে দাঁড়াল ওলগা, চোখ মুছলে, স্লেপৎসভের রেখে যাওয়া খাবারের মোড়কগুলো নিয়ে প্যাকেট করলে, তারপর দ্রুত তার সেই উড়ন্ত ভঙ্গিতে করিডরে গিয়ে গায়ে শাল চাপিয়ে স্বামীর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আঙিনায়।

আঙিনায় কেউ নেই, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

'কমরেড স্লেপৎসভ!' ডাক দিল ওলগা পেত্রভনা।

আঙিনা পেরিয়ে ওলগা পেত্রভনা ছুটে গেল রাস্তায়। সেখানে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে দেখলে। গলিটায় জনপ্রাণী নেই। বাঁ দিকে ছুটল ওলগা, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'কমরেড স্লেপৎসভ, কমরেড স্লেপৎসভ!' প্রায় ছুটে পেঁছল মোড় পর্যন্ত। স্লেপৎসভকে দেখা গেল না। মোড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ফিরল সে।

প্রথমটা কিছুই সে ভাবতে পারছিল না, তারপর স্লেপৎসভের সঙ্গে তার শেষ কথাবার্তাটা পুরো ভেসে উঠল মনে, সাইবেরিয়ার লোকদের নিয়ে সেই উদ্দেশ্যহীন কথাটাও। তার মনে হয়েছিল স্লেপৎসভ যখন সাইবেরিয়ার লোক তখন ইভাকুয়েশনের প্রথম দিকটায় ওলগা পেত্রভনা যেখানে ছিল

স্লেপৎসভও বোধ হয় সেখানকারই বাসিন্দা। আর হাতকাটা সৈনিকটি উ'চু মনের লোক ভিনোকুরভের এই কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে সেখানে ওই ছোটো শহরটাতেও ভালো লোক থাকা সম্ভব। অথচ ওলগা পেত্রভনা তাদের ভাবত একঘেয়ে তুচ্ছ লোক হিসাবে, রুক্ষ হৃদয়হীন লোক সব, যত তাড়াতাড়ি পারে সেখান থেকে চলে যাবার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সত্যি কথা বললে, ওলগা পেত্রভনা যদি তাদের প্রতি দরদ না দেখিয়ে থাকে, তাদের জন্যে আগ্রহ বোধ না ক'রে থাকে, তাদের জীবনের মধ্যে না ঢুকে থাকে, সে চেষ্টাটুকুও না ক'রে থাকে, তাহলে ওরাই বা কেন দরদ দেখাবে তার জন্যে, আগ্রহ দেখাবে? এমন কি তার সবচেয়ে যে আপন লোক, তার মৃত স্বামী, তার জন্যেও তো তার কোনো আগ্রহ ছিল না, তাকে সে বোঝে নি, বোঝবার চেষ্টাটুকুও করে নি। আজ কেবল স্লেপৎসভ আসাতেই জীবনটা তার ফুটে উঠল দিনের আলোয় আর সে নির্মম আলোয় অনেক কিছুই দেখা গেল একেবারে অন্যরকম।

বাড়ির ফটকের দিকে ফিরতে ফিরতে এই কথা ভাবছিল ওলগা পেত্রভনা।

রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচও ওদিকে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে উঠেছিল বুলভারে, পথচলতি লোকেদের কিছু চেয়ে দেখেছিল, তারপর সেও ফিরল একাই। ফটকের কাছেই দেখা হল দুজনের। ওলগা পেত্রভনার হাত ধরলে রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ, বললে, 'মাপ করো আমায়।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে,' বললে ওলগা পেত্রভনা, 'কিন্তু বুঝতে পারছ তো...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বটেই তো...'

'আমি যে...'

'জানি, জানি। চলো যাই।'

ধীরে ধীরে ফিরে এল ওরা, ধীরে ধীরে সি'ড়ি ভেঙে উঠল নিজেদের ফ্ল্যাটে। দরজা খুলতেই দেখা গেল ইউরা দাঁড়িয়ে আছে করিডরে। কিছুই জিজ্ঞেস করলে না সে, শুধু উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিপাত করলে দরজার দিকে, যেন অপেক্ষা করছিল পেছনে সৈনিককে সে দেখতে পারে। কেউ নেই।

'খেতে বসতে হয়,' বললে ওলগা পেত্রভনা।

তিনজনেই এল খাবার ঘরে। সাইবেরিয়ার খাবারের মোড়কটা ওলগা পেত্রভনা জানলার পর্দার ওপাশে গুঁজে দিলে। তারপর ফের খাবার পরিবেশন করতে লাগল। তারপর যে চেয়ারে বসে সে প্রথম কে'দেছিল সেখানে বসতেই আবার কে'দে ফেললে সে, যেন চেয়ারটাই জল টেনে আনছিল তার চোখে। রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ কাছে গিয়ে অস্ফুট স্বরে নানা রকম সান্ত্বনার কথা বলতে লাগল।

ইউরার কথা ভুলে গিয়েছিল ওরা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে কঠিন চোখে তাকিয়ে দেখছিল ওদের। মায়ের কান্নায় পীড়িত বোধ করছিল সে, কিন্তু কোনো করুণা হচ্ছিল না। ফ্যাকাশে, কঠোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে প্রতিজ্ঞা করছিল — বহু প্রতিজ্ঞা, বহু অঙ্গীকার, — শপথ নিচ্ছিল: সৎ লোক হবে সে, ভালো লোক, অকপট, বিদ্বান, এক কথায় সৈনিকটি যা বলেছিল, 'সোভিয়েতী লোক'।

এ প্রতিজ্ঞা কি সে পালন করবে? পালন করবে যদি চারিপাশের সবাই তাকে সাহায্য করে নীতিশিক্ষা দিয়ে নয়, যতকিছু ইতরতা থেকে নিজেদের আত্মশুদ্ধি দিয়ে।

আর আন্দ্রেই স্লেপৎসভ? ওলগা পেত্রভনা ও রোস্তিস্লাভ ইভানোভিচ তাকে খুঁজে পায় নি এইজন্যে নয় যে সে আঙিনাটা

পেরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। বরং উল্টো, সকাল বেলায় যে বেঞ্চিটায় বসে বুড়ি উল বুনছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্লেপৎসভ গিয়ে বসে সেই বেঞ্চিটাতেই। তৃষার্তের মতো সে এখানে তার সিগারেট পাকিয়ে টানতে থাকে। নেচায়েভের সংসারের প্রতি শ্রদ্ধাবশেই সে একবারও সেখানে সিগারেট খায় নি, আর এখন ডুবন্ত লোক যেমন করে বাতাস গিলতে চায় তেমনি করেই তামাকের কড়া ধোঁয়া টানতে লাগল সে।

অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। গোটা দিনটাই তাহলে গেল — ভোর থেকে সন্ধে। স্লেপৎসভ ভাবছিল কী দ্রুত, প্রায় বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কেটে গেল সারা দিনটা, সেই সঙ্গেই কী ভরাট, কী প্রকাণ্ড দিন, এই একটা দিনের মধ্যেই তার জীবনের কতকিছু বদলে গেল, নতুন আলো পড়ল সেখানে। এই আশ্চর্য দিনটার সে আলোয় সবকিছুই স্থানচ্যুত হয়ে স্থির হয়ে উঠল নতুন জায়গায়, নতুন বিন্যাসে। সে আলো পরিষ্কার, দপ দপ করে না তা, কমে বাড়ে না, সে আলো নির্মম। খর রৌদ্রে হারিয়ে যাওয়া ছায়ার মতো মনে হল তার আদরের ছবিগুলো সে আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে।

কানে এসেছিল তার, ওলগা পেত্রভনা তাকে ডাকছে, দেখেছিল তাকে খুঁজতে ওলগা পেত্রভনা আর তার স্বামী রাস্তায় ছুটে গেল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল সে, পাছে তাকে দেখে ফেলে। ফ্রন্টের সামনে শত্রুর মুখে সৈন্যেরা যা করে সেই ভাবে আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল সিগারেটটা। ম'রে গেলেও এখন সে আর ওদের সঙ্গে কথা কইতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত ফিরল ওরা, অদৃশ্য হল বাড়িটার ভেতর, বিরাট আঙিনাটার মধ্যে স্লেপৎসভ এখন একা। কিছুক্ষণ ব'সে কাটাল সে, তারপর উঠে ফটকের দিকে গেল। এইখানে থেকে মুখ তুলল সে: সামনে তার মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত শতাধিক আলোর চৌকো, কোনোটা ঝলকাচ্ছে — কোনোটা মিট মিট করছে, কোনোটা জ্বলছে। দৃশ্যটা সে প্রথমটা নেহাৎ যান্ত্রিক ভাবে, মাত্র কোনো একটা সুন্দর জিনিস দেখার মতো ক'রে দেখলে, পরে মনে হল জিনিসগুলো জানলা, তার ওপারে আছে মানুষ। মনে পড়ল শীতকাল, তখনো আত্মরক্ষার পর্ব চলছে, ক্যাপ্‌টেন নেচায়েভ তখন একবার বলেছিলেন ঠিক এই জানলাগুলোর কথাই, অন্য কোনো জানলা নয়, ঠিক এই জানলাগুলোই। এই রকম একটা কথা বলেছিলেন নেচায়েভ: স্বদেশ মানে তো শুধু বার্চ কি পপলার গাছে ঢাকা একটা কুঁড়ে, কি খানিকটা বন, খানিকটা মাঠ, শুধু এই তো নয়, কবিতায় কি উপন্যাসে সাবেকী রেশ টেনে যা লেখা হয়। স্বদেশ মানে দুই ঘরের শহুরে ফ্ল্যাটও বটে, ঠিক তেমনি একটা ফ্ল্যাট যার ওপরে ওই রকম আরো চারটে, নিচে আরো দুটো এবং গোটা বাড়িখানায় আরো পঞ্চাশ ফ্ল্যাট। সাধারণ একটা বাসা, রোজ সকালে যেখানে ঝির ঝির শব্দ তোলে কলের জল, একটা টেলিফোন, শুভক্ষণে তোমার কথা কারু কখনো মনে পড়লে যা বেজে উঠবে। স্বদেশ — এ হল সারি সারি এই রকম একশটা জানলার মাঝে দুটি জানলা, যার বৈশিষ্ট্য এইটুকু যে সেখানে তোমার বৌ ছেলে থাকে। এটাও আমাদের পিতৃপুরুষেরই মাটি, মস্কোর পবিত্র মাটিই, যদিও কুড়ি তিরিশ মিটার উঁচুতে। আর বড়ো স্বদেশটাকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে তুই এই ছোটো স্বদেশটুকুও রক্ষা করছিস, তার জন্যে প্রাণ দিতেও তুই রাজী।

যে দুটো জানলার কথা বলেছিলেন নেচায়েভ সেটা খুঁজতে লাগল স্লেপৎসভ। খুঁজে পেতে দেরিও হল না — হলুদ, সবুজ, লালচে, বেগুনি এবং শুধুই জ্বলজ্বলে আলোয় উদ্ভাসিত রাশি রাশি মানব কুলায়ের মাঝখানে — সবজে আলোর সেই জানলাদুটি। আর সে জানলাদুটো নিয়ে ক্যাপ্টেন নেচায়েভের কথা মনে হতেই চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো মাথা ঝাঁকালে স্লেপৎসভ, ঠোঁট কামড়ে ধরলে যাতে কান্না না বেরয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে যে নৈরাশ্য গ্রাস করেছিল তার মধ্যেও স্নিগ্ধ, উষ্ণ, নরম কী একটার স্পর্শ যেন থেকে গিয়েছিল। সেটা সে টের পেলে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিল না। খেয়াল হল, সে স্পর্শটা শুধু ভেতরে প্রাণের মধ্যেই নয়, বাইরেও, দেহেও। এই সূত্র ধ'রে এগুতে এগুতে অচিরেই তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হল তার হাতটায়: সে হাতের ওপর কেমন একটা মধুর ভার টের পেলে সে, এখনো যেন তা আকর্ষিত, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, — কোমল কী একটা যেন সে বহন করছে।

এ সেই ছোট্ট খুকিটি, দৃষ্টি যার ঠিক খুকির মতো নয়। কচি খুকি — এই যে মানব শিশুটি এখনো মাত্র এইটুকু, সবই তার ভবিষ্যতে, কী অনির্বচনীয়কেই না সে ধারণ করতে পারে। সেই বোধ হয় নরম ক'রে দিলে তার জ্বলে যাওয়া বুক, ভিজিয়ে দিলে, সহজ করে তুললে।

অচিরেই নিজের ওপর দখল ফিরল আন্দ্রেই স্লেপৎসভের। জোরে মুখ মুছে নিলে সে, ঝোলাটা টেনে তুললে কাঁধের ওপর, তারপর স্টেশনের পরিচিত ফিরতি পথে পা বাড়ালে। সামনে তার এখন, বোঝাই যায়, স্টেশনের চত্বরে দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত,

টিকিটের জন্যে লাইন; আপন মনে গুঞ্জন করলে স্লেপৎসভ: 'যাক, একটু ঘুমিয়ে নিতে যে পেরেছিস আন্দ্রেই স্লেপৎসভ, সেটা মন্দ হয় নি। সকালে বেঞ্চিটায়, পরে গদি আঁটা চেয়ারে।' ঠিক করলে আগামী কাল সন্ধ্যার ট্রেনের জন্যে টিকিট কাটার চেষ্টা করবে সে, মস্কো শহরটাও দেখে নেওয়া যাবে দিনের বেলা।

ইয়োজাস বালতুশিস

শেষ প্রশান্ত সুখ

বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন মহিলাটি — একেবারে বুড়ি। বসেছিলেন আরামকেদারায় হাতলের ওপর হাতদুটি রেখে। আমার কথা শুনছিলেন মন দিয়ে, ভারি একটা মার্জিত রুচি ও অমায়িকতা প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন:

'তা এলেন কী মনে ক'রে?'

তাড়াতাড়ি ক'রে ফের বললাম যে অনেক দিন ধ'রে খুব কঠিন রোগে ভুগছি, বাঁচার প্রায় আশা নেই, ওঁর অনেক গুণগান শুনেছি লোকের কাছে, উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার, ষাট বছরের প্র্যাকটিস, ওঁর পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।

'ডাক্তারি আর করি না। অনেক দিন পেনসন নিয়ে আছি,' বললেন উনি, 'জানেন না সেটা?'

'খুব জানি ডাক্তার। কিন্তু বাঁচার যত উপায় আছে সব পরখ না ক'রে আমি মরতে চাই না। এমন কি পেনসনভোগীর পরামর্শও আমার খুব কাজে লাগবে।'

একটু হাসলেন উনি।

'আজকাল কত ডাক্তার,' ফের গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কত হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারি। আর আপনি এসেছেন আমার কাছে। আমার কাছে কেন বলুন তো?'

কী বলব, কী ক'রে বোঝাব ঠিক ভেবে পেলাম না। উনিও আরাম ক'রে হাত এলিয়ে চুপ করে রইলেন। কপালখানা উঁচু, ঢিপ হয়ে ওঠা, তুষার ধবল চুল, পরিষ্কার নীল চোখ, — বার্ধক্যে তা এতটুকু আবিল হয় নি — এই সবকিছু থেকে একটা মর্যাদা ঝ'রে পড়ছিল। সেটা দাম্ভিকতা নয়, মর্যাদা। বেশ চেষ্টা ক'রেই উঠে দাঁড়ালাম আমি, এগুলাম দরজার দিকে...

'একটু দাঁড়ান,' বলে উঠলেন উনি, 'আচ্ছা, আপনার ডায়াগনোসিসটা কী করেছে বলুন তো।'

'শেষ পর্যায়ের স্টেনোকার্ডিয়া, আঙিনা পেক্টোরিস,' যোগ করলাম ল্যাটিনে।

'শেষ পর্যায়ে?'

'হাঁ, ডাক্তার।'

হাসলেন উনি:

'ডাক্তারির ব্যাপার আজকাল কত লোকেই জানে দেখছি! আমার লাঠিটা দিন তো।'

লাঠিটা ছিল কোণে। আপেল গাছের ডাল থেকে বানানো, বেশ মোটা, গিংট-গিংট। লাঠিটার ওপর ভালো ক'রে ভর দিয়ে তীক্ষ্ন মনোযোগী দৃষ্টিপাত করলেন আমার দিকে।

'জামা খুলুন।'

লাঠি ভর দিয়ে ঠুক ঠুক ক'রে আমার চারিপাশে ঘুরে দেখতে লাগলেন। হার্টের শব্দ, ফুসফুসের শব্দ শুনলেন, বুক পিঠে টোকা দিলেন, নাড়ী টিপে আমায় একবার দাঁড় করিয়ে বসিয়ে এবং শুইয়ে দেখলেন; এমনি দেখলেন, কয়েকবার উঠ বোস করিয়ে আবার পরীক্ষা করলেন।

'পোষাক পরুন এবার।'

লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে পাশের ঘরে গেলেন উনি, হাত ধুলেন, বাসনের ঝনঝন শব্দ শোনা গেল। ফিরলেন ঠিক আগের মতোই প্রশান্ত মুখ নিয়ে, যা দেখে কিছুই আঁচ করা যায় না।

'ডাক্তার... এবার আর মারা যাব না তাহলে?' সাহস ক'রে একটু রসিকতা করলাম।

'বাঁচবেন না!'

'বাঁচব না?'

'হ্যাঁ, বাঁচবেন না!'

মনে হল আর এক মুহূর্ত পরেই শুরু হবে হার্ট অ্যাট্যাকের পালা — প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর দ্বারদেশে পেঁৗছে দেওয়া সেই যন্ত্রণা। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ হল মহিলাটির প্রতি। অভিজ্ঞ ডাক্তার, উনি কি এটুকুও জানেন না যে রোগী সবচেয়ে বেশি ছলনার প্রত্যাশী। না হয় রোগীই আমি, কোনো আশাই নেই, যম নয় শিয়রের কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তুমি ডাক্তার, তুমি বলবে আজ আমায় কালকের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে, বাহাদুর লোক আমি, শীগগিরই ভালো হয়ে উঠব, এখনো বহু দিন বাঁচব, অনেক দিন কাজ করব, নানা জায়গা ঘুরব... শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যদি বিশ্বাস থাকে মরছি না, তাহলে মরতে কষ্ট হয় না। উনি কি এ জিনিসটাও বোঝেন না?

'বাঁচবেন না,' যেন আমার ভাবনাটা অনুমান ক'রেই উনি ফের বললেন।

'কিন্তু ডাক্তার...'

'সবাই আমরা মরব।'

শান্তভাবে বসলেন আরামকেদারায়, হাতলের উপর হাত এলিয়ে দিলেন। একটু হাসলেন।

'আপনার বদলে অন্য কেউ তো মরতে রাজী হবে না। আমার হয়েও কেউ মরবে না।'

একটু চুপ ক'রে নির্দেশ দিলেন:

'এবার বাড়ি যান। এক হপ্তা পরে আসবেন। আমায় একটু ভেবে দেখতে হবে।'

'ভেবে দেখবেন?'

'হ্যাঁ, ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে ভাবে। তার জন্যে সময়ও লাগে। সমস্ত অ্যানালিসিস রিপোর্ট আর কার্ডিওগ্রাম যা আছে

নিয়ে আসবেন। আমায় একটু দেখতে হবে। ডাক্তাররা শুধু ভাবেই না, মাঝে মাঝে দেখেও।'

'মাপ করবেন ডাক্তার, আপনি কি আমার আগের ডাক্তারদের বিশ্বাস করছেন না?'

'আর আপনি? আপনি নিজে বিশ্বাস করেন?'

আমায় বিব্রত দেখে একটু হাসলেন উনি।

'আমার শুধু এইটুকু জানা আছে যে কিছুই আমি জানি না, মনে হয় সক্রেটিস বা অমনি কেউ একজন কথাটা বলেছিলেন। যাচাই ক'রে নেওয়া দরকার।'

একটু চুপ ক'রে থেকে যোগ করলেন:

'ডাক্তারও তো মানুষ। তারও ভুল হতে পারে।'

এইভাবেই শুরু হয় আমাদের পরিচয়। এক সপ্তাহ পরে আমার সমস্ত রিপোর্টগুলো উনি মন দিয়ে পড়লেন, প্রেসক্রিপশনগুলো বার বার দেখলেন, তারপর সবগুলোকে দলা পাকিয়ে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে:

'বাড়ি গিয়ে পায়খানায় ফেলে দিয়ে ফ্লাশ টেনে দেবেন...'

'কিন্তু ডাক্তার...'

'দাঁড়ান,' আঙুল নেড়ে বললেন, 'আগেই চুক্তি করে নিই। ডাক্তারি ব্যাপারে সর্বদাই একটা ত্রিভুজ দেখা দেয় — রোগী, রোগ আর ডাক্তার। রোগী আর ডাক্তারে যদি একমত থাকে, তাহলে দুজনে মিলে চট ক'রেই রোগকে কাবু করে ফেলে। আর রোগী যখন ডাক্তারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, নিজের রোগের পক্ষ নেয়, তখন একলা পড়ে যায় ডাক্তার। তার সব জারিজুরি তখন বৃথা। আমার জানা দরকার কার পক্ষে আপনি? আমার পক্ষে নাকি নিজের রোগের পক্ষে?'

'কিন্তু ডাক্তার... এ আবার কী প্রশ্ন? যা হুকুম দেবেন সব করব।'

'শুনে ভারি আনন্দ হল। তাহলে এবার মদ্যপান করা যাক।'

'মদ?' স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি।

'চিকিৎসা শুরু করার এই আমার প্রথম সর্ত।'

নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হল না।

কাঠের বাড়ির দোতলায় তাঁর ফ্ল্যাটে উঠতে হলে সিঁড়ি ভাঙতে হয় মাত্র বারো ধাপ, আর সেইটুকু উঠতেই চার বার আমি থেমেছি দম হারিয়ে অসাড় হয়ে, চোখে অন্ধকার দেখেছি...

'আমায় মারতে চান ডাক্তার?'

'কী যা-তা বলছেন।'

মুখের পেশীর এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না, বৃদ্ধা উঠলেন, লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে গেলেন পাশের ঘরে। শীগগিরই দুটি কাট-গ্লাসের উঁচু গেলাস, এক বোতল মদ আর প্লেটে কিছু বিস্কুট নিয়ে ফিরলেন। সুরা ঢাললেন ফেনিল, নিজে এক গ্লাস নিয়ে বললেন:

'এবার আসুন গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে খাওয়া যাক।'

'ডাক্তার, খেতেই হবে এই আপনার দৃঢ় বিশ্বাস? আমি তো প্রথম ঢোকেই পটল তুলব...'

'নিন, খেয়ে নিন।'

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির শব্দে যেন চমকে উঠল বাতাস। সন্তর্পণে গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ালাম আমি।

এবং বেঁচেই রইলাম। শুধু তাই নয়। উষ্ণতার একটা মধুর তরঙ্গ খেলে গেল সারা দেহে, মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলোর কথা, যখন রোগ ছিল না আমার, উৎসবের দিনে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পানপাত্র তুলতাম ভবিষ্যতের নামে, জীবনের

নামে, আয়ুষ্মান অপরূপ সেই জীবন, স্পর্ধিত, উদ্দাম। হঠাৎ মনে হল বুঝি সে দিনগুলো যেন অত অতীতের নয়, অমন চিরকালের মতো বিগত নয়।

'ডাক্তার, আপনি যাদুকরী!..'

'এবার আপনাকে প্রেমে পড়তে হবে।'

'প্রেমে পড়তে হবে?' অবাক হলাম আমি, 'ডাক্তার, কী বলছেন!'

'চিকিৎসা শুরু করার আগে এটা আমার দ্বিতীয় সর্ত।'

কথাটা উনি বললেন একেবারে শান্ত ভাবে। মনে হল যেন-বা একটু মুচকি হেসে। কিন্তু মোটেই তামাসা করছিলেন না উনি। নীল চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই চেয়ে আছেন। কপালটা একই রকম উঁচু, তুষার ধবল চুল, মুখের ভাবটা এমন যে তাঁর কথায় সন্দেহ করা অসম্ভব।

'কিন্তু ডাক্তার... আমি বিবাহিত।'

'বৌয়ের কথা পরে। সে তো আছে আইনমতোই। কিন্তু আপনাকে প্রেমে পড়তেই হবে।'

'আমার যে ছেলেপিলেও আছে ডাক্তার,' সাবধানে বললাম আমি, 'তিন তিনটি।'

'ছেলেপিলেয় প্রেমে বাধা হয় এই প্রথম শুনছি।'

কী যে বলা যায় ভেবে পেলাম না। এমন ডাক্তার আমি জীবনে দেখি নি। কারো সঙ্গেই এ'র মিল নেই। চিকিৎসার পদ্ধতিও একেবারেই আলাদা।

'শেষ কথা, আমি যে হার্টের রুগী ডাক্তার। জোরালো ভাবাবেগ আমার পক্ষে ক্ষতিকর। প্রেমে পড়ার স্রেফ কোনো অধিকারই আমার নেই!'

'আপনার রোগটা হার্টের নয়।'

'হার্টের নয়? বলেন কি, আমার যে আঙিনা পেক্টরিস।'

বৃদ্ধা আমার দিকে একটু কটাক্ষে হাসলেন।

'যাই বলো, ডাক্তারি বিদ্যা দেখছি আজকাল সবাই বেশ বোঝে।'

ওঁর চোখের দৃষ্টি সইতে না পেরে অনিচ্ছাতেও হাসলাম আমি।

'খোলসা ক'রে বলুন ডাক্তার।'

'ঠিক খোলসা ক'রেই তো আপনাকে বলছি।'

'ধরা যাক আপনার পরামর্শ মেনে প্রেমেই পড়লাম।'

'আমার পরামর্শ মেনেই তো চলবেন।'

'কিন্তু প্রতিদান পাব কার কাছ থেকে? কোথায় সে মেয়ে? রূপ আমার কখনোই ছিল না, এখন আবার তার ওপর রুগী, একেবারে জীর্ণ। বয়সও গেছে, পঞ্চাশের ওপারে।'

'মাপ করবেন, কোন মেয়ের কথা বলছেন আপনি?'

'মানে ধরা যাক কাউকে পছন্দ করলাম... আপনার পরামর্শ মতো নয় ভালোই বাসলাম। কিন্তু মেয়েটি? সে কি কখনো আমায় ভালো বাসতে পারে?'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে কোনো মেয়ের কথা বলি নি।'

'বলেন নি?'

'বলেছি প্রেমের কথা। আপনার প্রেমে পড়া দরকার।'

'কার প্রেমে?'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আমার ব্যাপার?'

'তাছাড়া প্রতিদানেরই বা কী দরকার। সে তো ব্যবসাদারী হিসেব: আমি তোমায় ভালোবাসব, তুমি আমায়... ভালোবাসবেন, বাস ফুরিয়ে গেল।'

এইভাবেই চিকিৎসা শুরু করলেন উনি। আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য চিকিৎসা। যতদিন যায় ততই আশ্চর্য। নির্মম এক সঙ্গীতিনিষ্ঠায় আমার জীবনের সমস্ত শৃঙ্খলা, অভ্যাস, নিয়ম তিনি ভাঙলেন। চুলোয় গেল পথ্যের রুটিন।

'প্রাণ যা চায় খাবেন। এবং যে পরিমাণে চায় সেই পরিমাণেই।'

বললেন, 'বেশি যেন হাঁটাহাঁটি করি, শক্তিতে যতটা কুলোয়। বলাই বাহুল্য, থেমে থেমে, দম নিয়ে। খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে হবে দিনে ছয় ঘণ্টা। রাতে জানলা খোলা থাকবে।'

'কিন্তু জানলা আমাদের বন্ধ,' বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, 'শীতের জন্যে কাগজ দিয়ে সব ফাঁক সাঁটা।'

'কাগজ খুলে ফেলুন। সকালে ব্যায়াম করেন?'

'ঠাট্টা করছেন ডাক্তার!'

'ঠাট্টা পরে হবে। আপাতত প্রতি সকালে ব্যায়াম করবেন। প্রথম প্রথম পাঁচ মিনিট, পরে দশ মিনিট। ব্যায়ামের ফর্দ আমি আপনাকে বানিয়ে দেব।'

'ফর্দ কী বলছেন ডাক্তার? কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলাই আমার বারণ।'

'বারণটা ভুল নয়। হাত তুলতে হবে তারও ওপরে। প্রথমে আমার অভিভাবকত্বে শুরু করবেন, পরে ব্যায়াম-চিকিৎসার ডিসপেনসারিতে। ভিলনিউসে ওই রকম একটা ডিসপেনসারি আছে শোনেন নি কখনো।'

এমন সুরে কথা বলতেন যে আপত্তি এমন কি সন্দেহ প্রকাশও অসম্ভব। নিজে উনি কখনো প্রেসক্রিপশন দিতেন না, তবে অন্য ডাক্তারের লেখা প্রেসক্রিপশন ওঁকে দেখাতে হত, ডোজ কেটে সেটাকে ছোটো ক'রে দিতেন তিনি। বলতেন:

'মানুষের দেহ নিজে থেকেই রোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। দরকার সেটায় সাহায্য করা। সাহায্য করা, কিন্তু ঘোড়ার ডোজে ওষুধ দিয়ে ভারাক্রান্ত করা নয়, অনেক ডাক্তারেরই যা অভ্যেস। একটা অঙ্গ সারে, ওদিকে দশটা অঙ্গ জখম হয়।'

'ডাক্তার, কিন্তু সে তো হোমিওপ্যাথির নীতি।'

'আজকাল দেখছি ডাক্তারি বিদ্যে কত লোকেই বোঝে!' আমায় থামিয়ে দিয়েছিলেন উনি, 'হোমিওপ্যাথির মাথায় ঘোল ঢালার জন্যে অত ব্যস্ত কেন। সাবেকী এই বিদ্যেটার সবই কিছু তো আর খারাপ নয়।'

'মাপ করবেন...'

'তা রোগীদের মাপ করতেই হয় বৈকি।'

যতবারই আসতাম, ততবারই তন্ন তন্ন ক'রে উনি আমার অবস্থা পরীক্ষা করতেন, কোমর পর্যন্ত সব জামা খুলে ফেলতে হত। লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে চারিপাশে ঘুরতেন। তারপর হুকুম দিতেন:

'এক সপ্তাহ পরে আসবেন।'

আমিও আসতাম। প্রত্যেকবারই এসে দেখতাম, ধবধবে শাদা চুলের এই নিঃসঙ্গিনী বৃদ্ধা বসে আছেন তাঁর শান্ত আরামকেদারায়, আয়েস ক'রে এলিয়ে রেখেছেন হাত দুখানা। ঘরখানায় অবান্তর কিছুই নেই। দেয়াল বরাবর বই-ভরা তাক, টেবল, নিচু একটা ছোট্ট টেবল, তাতে দেশী বিদেশী পত্রপত্রিকা ছড়ানো। বেশ কয়েকটা ভাষা তিনি চমৎকার জানতেন, ডাক্তারদের যা স্বভাব — রস সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ প্রচুর, প্রতিটি বই পড়ে সে সম্পর্কে মতামত দিতেন। সন্ধ্যায় রেডিও বা টেলিভিজন খুলতেন, কোলে নিতেন হাতীর দাঁতের একটি সিংহ। জিনিসটা জাপানী। দেখতে অদ্ভুত: আকারে বড়ো

নয়, কিন্তু মনে হত যেন দানব; বলিষ্ঠ, ব্যাদিত মুখে হুঙ্কার, অবলীলায় লুটিয়ে আছে তার দুরন্ত লেজ।

আমার দৃষ্টি লক্ষ ক'রে একবার বলেছিলেন, 'সিংহটায় বিরক্ত লাগে আপনার?'

'না, না, বিরক্ত লাগবে কেন!' থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম আমি।

'তা ভালো।'

একটু চুপ ক'রে দেখে বললেন, 'খুব দামী সিংহ।'

'বলাই বাহুল্য, হাতির দাঁতের জিনিস!'

ফের চুপ ক'রে গেলেন তিনি, তারপর চাপা কিন্তু গভীর একটা তিক্ততায় বললেন:

'কী কম আপনার বোধশক্তি!' তারপর সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ে খুঁজে পেলেন?'

'মেয়ে?' বিব্রত বোধ করলাম আমি, 'মাপ করবেন ডাক্তার, কিন্তু আপনি তো সে পরামর্শ দেন নি...'

'আমি বলেছিলাম প্রেমে পড়া দরকার। আর ভালোবাসার মতো কোনো বস্তু না পেলে মেয়েই খুঁজুন,' কড়া ক'রেই বললেন উনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হেসে ফেললেন, 'তা রোগীকে একটু লাই দিতেই হয় বৈকি।'

এইভাবেই কাটল এক মাস, তারপর আরো দু'সপ্তাহ। তারপর একবার খুব মন দিয়ে আমার বুক পরীক্ষা করলেন, বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে, লক্ষ করলাম থুতনিটা ওঁর কাঁপছে, চোখের পাতায় জল ফুটে উঠল।

'ভালোর দিকে মোড় ফিরেছে,' মৃদু স্বরে বললেন উনি।

নিজেও আমি কিছুকাল থেকে টের পাচ্ছিলাম: সত্যিই বদল। ঠাহর হয় কি হয় না, তাহলেও বদল সন্দেহ নেই।

দেহযন্ত্রের কোন এক গভীরে, হয়ত বা অবচেতনায় অনভ্যস্ত, দুর্বিশ্বাস্য নতুন কিছু একটার জন্ম হয়েছে, বাড়ছে। যেন একটা গোপন হর্ষ, যেন একটা আসন্ন সুখের পূর্বাভাস। দেখা দিয়েছে নড়ে চড়ে বেড়াবার ইচ্ছে, কিছুর জন্যে ছটফট করা, কিছু নিয়ে ব্যস্ত হবার উদ্বেগ। লোকের প্রতি যে আকর্ষণ, তাদের সঙ্গে আলাপ করার যে বাসনা বহুদিন লোপ পেয়েছিল সেটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে...

মেজের ওপর জোরে লাঠি ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা, আরেকবার দীর্ঘ সন্ধানী দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে।

'এক সপ্তাহ পরে আসবেন।'

তাই এলাম। আরো বহু সপ্তাহই এসেছিলাম তাঁর কাছে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি উঠতাম। সমস্ত সত্তাটা যেন তাজা হয়ে উঠেছিল, হৃৎপিণ্ড বাজত স্বচ্ছন্দে, দৃষ্টিতে এসেছিল সজীবতা।

'প্রায় ভালো হয়ে গেছি, ডাক্তার!'

'এক সপ্তাহ পরে আসবেন।'

'কিন্তু আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি, ডাক্তার! বুঝতে পারছেন, ভালো হয়ে যাচ্ছি।'

'লোকে আজকাল ডাক্তারি বিদ্যে দেখছি অনেক বোঝে।'

কিন্তু একদিন মুখ তাঁর সত্যিই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব দিলেন:

'আসুন আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাবেন।'

'সানন্দে, ডাক্তার। কিন্তু ক্ষতি হবে না তো? শুনেছিলাম, হার্টের পক্ষে কফি ক্ষতিকর।'

'বটে? লক্ষ করি নি কখনো। চুরাশি বছর খাচ্ছি, টের পাই নি।'

কাপগুলো রয়েছে সেই টেবলেই, যেখানে একদা কাটগ্লাসের পানপাত্রে ছিল মদ। আমায় কফি ঢেলে দিলেন উনি, তারপর নিজের জন্যে। কেবল এতক্ষণে আমার নজরে পড়ল যে উনি একটা শাদা ব্লাউজ পরেছেন, আমার সামনে এ রকম ব্লাউজ ওঁকে আগে কখনো পরতে দেখি নি, শাদা চুলের কবরীটাও নতুন, পেছন দিয়ে বেণী ক'রে খোপা বাঁধা। কফি ঢেলে গালে হাত দিয়ে এমন ভাবে হেসে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে বিশ্বাস করা কঠিন যে তার বয়স আশীর কোঠায়, সমবয়সীদের যিনি অনেক দিন হল বিদায় জানিয়েছেন, এবং জানেন যে তাঁর পালাও দূরে নয়। শুধু তাঁর ব্লাউজটা, মুখের ওপর হাসিটাই যে জ্বলজ্বল করছিল তাই নয়, জ্বলজ্বল করছিল তাঁর শাদা চুল, পরিষ্কার নীল চোখ, তাঁর সবকিছু থেকেই আলো ঝরছে। বয়স যেন কম, সুন্দরী, যেন শিশির ঝরা মাঠের মধ্যে লাজুক কোন মেয়ে, যেন এক নববধূ...

'এক সপ্তাহ পরে আসবেন। আমায় ভুলবেন না...'

এক বছর কাটল। ওঁর সিঁড়িতে ওঠার সময় থেমে থেমে যে দম নিতে হত, সে কথাটা আর বহুদিন মনেই হয় না। অবর্ণনীয় সে উদ্বেগ আজ অতীতের ব্যাপার, যাতে যন্ত্রণা শুরু হলেই গরম একটা কোণ নিয়ে লোক এড়িয়ে প'ড়ে থাকতাম, অথবা মাঠ ঘাট ধরে পড়িমরি কেবল হেঁটেই যেতাম, ভুলেই যেতাম যে হাঁটার কোনো অর্থ হয় না, কোথাও পালাবার নেই, মরণ ওঁৎ পেতে আছে, নিজেই আমি সে মরণকে বয়ে আনছি। আর এ সবই এই বৃদ্ধার কল্যাণে — আশ্চর্যা, একাকিনী, দুর্বোধ্যা এই মহিলা।

'উহুঁ,' হাসলেন উনি, 'আপনি নিজেই বাঁচতে চাইছিলেন। সেই হল রহস্য!'

'কিন্তু ডাক্তার, অন্যেরাও কি আর বাঁচতে চায় না? সবাই তাই চায়।'

'সবাই নয়।'

'আমি অন্তত এমন লোক দেখি নি যার বাঁচার সাধ নেই।'

'আমি দেখেছি। দেখেছি অনেক।'

মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া ভেসে গেল তাঁর। হাতের ওপর গালের ভর দিয়ে তিনি চুপ করে রইলেন।

'একটু বড়ো হয়ে উঠলেই যেন তাড়াতাড়ি আয়ুটুকু ফুরোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে,' বললেন চিন্তিতের মতো, আমায় লক্ষ ক'রে নয়, যেন নিজের মনেই।

'কে তেমন ব্যস্ত হয়, ডাক্তার?'

'লোকে,' মনমরার মতো বললেন উনি, 'সিগারেট ফোঁকে, মদ টানে মাত্রা ছাড়া, রাত জেগে খাটে, দিনে ঘুমোয়, যখন যা জোটে তাই খায়। আত্মহত্যা করে সবাই।'

'ডাক্তার...'

'আপনিও ছিলেন ওই রকম,' প্রায় কড়া ক'রেই থামিয়ে দিলেন আমায়, 'আরো খারাপ। বাঁচার ইচ্ছেই ছিল না আপনার।'

'বাজে কথা!'

'মনে ক'রে দেখুন। এসেছিলেন একেবারে জীর্ণশীর্ণ, হতাশ, আর সবচেয়ে বিচ্ছিরি, লোককে আর তখন ভালোবাসতেন না, এমন কি নিজেকেও নয়। আমি কিন্তু প্রথম দেখেই বুঝেছিলাম: স্বভাব না বদলালে শীগগিরই মরবেন, এবং খুবই শীগগিরই।'

এত দীর্ঘক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন, অভ্যেস মতো হাত দুটি

হাতলে আয়েস ক'রে এলিয়ে দিয়ে। শেষ কালে মৃদু স্বরে বললেন:

'যমও ঠিক ওই ধরনের মরাদেরই খোঁজে। ওই তার তৃপ্তি। কিন্তু জীবনের তাতে তৃপ্তি কোথায়?'

এবং এতদিন পর্যন্ত যে ভাবে হুকুম করেছেন সেভাবে নয়, অনুরোধ করলেন:

'প্রায়ই আসবেন কিন্তু। সপ্তাহে দুবার।'

'সানন্দে, ডাক্তার। কিন্তু আমি তো বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি, তাই উল্টে ভাবছিলাম আপনাকে আর ঝামেলায় ফেলব না।'

আমার দিকে চকিত একটা দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন:

'কোনো ঝামেলাই হবে না আমার। তবে অবিশ্যি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আসবেন না।'

বলেই মেঝেয় লাঠি ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন।

এর পর থেকে আমি প্রতিবারই এসে দেখেছি মোটা, নকশা তোলা কফি-কোজি ঢাকা কফিপটে কফি তৈরি। পাশেই খানিকটা মুড়মুড়ে বিস্কুট, কিছু ফল। প্রতিবারই টেবলের সামনে উনি বসে থাকতেন বেশ একটা উৎসবের পোষাক পরে, একটু যেন বা লাজুক ভঙ্গিতে। সঙ্গেই সঙ্গেই তাকাতেন না আমার দিকে। ধূমায়িত কফি ঢালতেন। শুরু হত আমাদের আলাপ। অফুরান তাঁর ভাণ্ডার। যে কোনো প্রসঙ্গেই কথা বলতেন অবাধে, পাকা যুক্তি দিয়ে নিজের মত বা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। শুধু একটা বিষয় তিনি তুলতেন না, নিজের কথা, নিজের অতীত জীবন। এমন কি তাঁর নামটা পর্যন্ত আমি জানতে পারি কেবল আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় বছরে। নাতালিয়া তলভাইশেনে। রুশী নাম। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম:

‘আপনি বোধ হয় জাতিতে রুশী?’

‘আপনার কাছে কি সেটা খুবই গুরুত্বের ব্যাপার?’

আমায় বিব্রত দেখে বললেন:

‘কফি খান। বিস্কুট নিন। মঙ্গলবারে অপেক্ষা ক’রে থাকব। আসবেন তো?’ সোজা আমার চোখের দিকে তাকালেন।

কিন্তু আসা কঠিন হয়ে উঠছিল। স্বাস্থ্য ভালো হয়ে উঠতেই আমার অর্ধরুগ্ন রুটিনের কাঠামো আর টিকছিল না, বেড়ে উঠল কাজ, কর্ম, সমস্যা, আগ্রহের চৌহদ্দি। নতুন নতুন লোকের উদয় হতে থাকল আমার দিগন্তে — বলা ভালো, পুরনো লোকই, তবে ফের আমার কথা মনে পড়ছিল তাদের। ধীরে ধীরে, কিন্তু অমোঘ ভাবেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনবোধ স্তিমিত হয়ে এল। লজ্জার সঙ্গে আরেকবার টের পেলাম যে ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি তারাই ভুলে যায় যারা ভালো হয়ে উঠছে।

অথচ উনি অপেক্ষা করতেন। নীরবে, ধৈর্য ধ’রে। গায়ে একটু বিশেষ দিনের পোষাক, নকশা তোলা কফি-কোজির তলে কফিপট, ডিশে বিস্কুট, ফল।

‘আমায় আপনি ভুলে গেছেন,’ দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আমায় একবার বলেছিলেন, ‘কফিটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।’

সেবার আলাপটা তেমন জমে নি। তারপর এক সপ্তাহ কাটল, দু’সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, কিন্তু এই যে মহিলাটি আমায় জীবনে ফেরার পথ দেখিয়েছেন, তাঁর খবর নেওয়ার মতো সময় কি উপলক্ষ ক’রে উঠতে পারি নি।

এই ভাবেই বসন্ত এল। পাতা ফুটল ভিলনিউসের সমস্ত লাইমগাছে। স্বচ্ছ শ্যাম মরকতে ছেয়ে গেল সব পার্ক আর

স্কোয়ার। লেনিন চকে কূজন তুলল পায়রা। নগরের মাথার ওপর উ'চু হয়ে উঠল স্বর্গের নীল। শীতের ভারি পোষাক কাঁধ থেকে নামিয়ে আশ্চর্য রূপসী হয়ে উঠল মেয়েরা। রাস্তা স্কোয়ার ভাসিয়ে দিলে বসন্তে, লোককে যা কিছু পীড়িত করে সবই সে নিয়ে গেল উড়িয়ে। শিশুর কলহাস্য, বুড়োর স্মিতানন আর প্রতিটি বুকের মধ্যে আনন্দ জাগিয়ে তুলল বসন্ত।

ঠিক এমনি এক দিনেই একজন মহিলা এলেন আমার কাছে। আগে তাঁকে কখনো দেখি নি। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন।

'নাতালিয়া তলভাইশেনে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন, যদি সম্ভব হয় একবার আসবেন।'

জীবনে এমন ঘটনাও ঘটে যখন অনেককাল দেখা না হওয়ার পর কাউকে দেখে হঠাৎ মনে হয় এ তো সে নয়, এ যে অন্য লোক, যাকে চিনতাম, যার সঙ্গে হৃদ্যতা, যাকে দেখতে চাই, তার সঙ্গে এর একেবারেই যেন মিল নেই। আমার ঠিক তাই হল। কাঠের বাড়ির দোতলায় আরামকেদারায় গা এলিয়ে যিনি বসেছিলেন তিনি এক অপরিচিতা লোলচর্মা বৃদ্ধা, কোন এক করাল ছায়ায় ধূসর হয়ে উঠেছে মুখখানা। ম্লান অপলক্ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

'ধন্যবাদ,' প্রায় অলক্ষ্যে নড়ে উঠল ঠোঁট দুটি।

'মাপ করবেন, ডাক্তার...' তাঁর চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে অস্ফুটে বললাম আমি।

আঙুলের কাঁপুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মাপ চাইবার দরকার নেই।

দু'পাতা কাগজ তুললেন টেবল থেকে, তাঁর হাতের লেখায় ঘন ক'রে ভরা।

‘আমি এখানে সব লিখে রেখেছি,’ বললেন ঠোঁট প্রায় না নেড়ে, ‘যদি শরীর খারাপ হয়, ফের রোগ ধরেছে বলে মনে হয়, তাহলে পড়ে দেখবেন, কী করতে হবে, কী ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করা দরকার তা জানতে পারবেন।’

‘মাপ করবেন ডাক্তার, লেখার কোনো দরকার নেই। এবার থেকে আমি ঘন ঘন আসব, আপনার পরামর্শ নেব...’ তাড়াতাড়ি ক’রে বললাম আমি, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে রইলাম অন্য দিকে, স্তিমিত ওঁর দৃষ্টির মধ্যে অশুভ কী যেন একটা লুকিয়েছিল, ভয় হল সেদিকে চাইতে।

‘খবরাখবর করতে আর আসবেন না।’

‘কেন, ডাক্তার? কেন ও কথা বলছেন?’

চুপ ক’রে রইলেন উনি, যেন কী ভাবছেন, যেন নিজের ভেতরেই কী শুনছেন। তারপর সলজ্জে অনুরোধ করলেন:

‘আপনি কি আমায়... চুমু দেবেন?’

আমি নিচু হয়ে চুমু দিলাম তাঁর কপালে, গণ্ডে, তারপর হাত দুখানায়, যে হাত আমার এত উপকার করেছে।

‘এবার যান,’ ফের অনুরোধ করলেন তিনি, তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে বললেন, ‘ধন্যবাদ! সবকিছুর জন্যে।’

‘আমায় ধন্যবাদ?!’

‘যান এবার!’

এ কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যে হুকুমটা না মেনে পারলাম না। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আর পারলাম না। ফিরলাম। নাতালিয়া তলভাইশেনে ব’সে আছেন আমার দিকে চেয়ে। মুখের ওপরকার ধূসর করাল ছায়াটা ভেদ ক’রে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটতে চাইল।

‘ডাক্তার!’ মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাটা।

‘যান!’

সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম। সেই সিঁড়ি যা ভেঙে উঠতে প্রথম বার অত কষ্ট হয়েছিল আমার। হঠাৎ একেবারে অশক্তের মতো থেমে গেলাম, ভেবে পেলাম না, নামব নাকি ফিরব।

'আপনার পায়ের শব্দ শুনছি না যে,' দূরাগত ক্ষীণ একটা স্বর ভেসে এল, 'চলে যাওয়ার শব্দটা শুনতে ইচ্ছে করছে। যান।'

চলে এলাম আমি।

পরের দিন — কারোলিন পাহাড়ের উষ্ণ বাসন্তী বাতাস আর বার্ডচেরির গন্ধে ঝাঁঝালো দিনটা — ফের সেই অপরিচিতা এলেন আমার কাছে। এবারও কোনো কথা না বলে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন আমায়। তারপর ছোট একটা মোড়ক এগিয়ে দিলেন:

'এটা আপনার জন্যে।'

মোড়ক খুলে চমকে উঠলাম। এ সেই সিংহটা। সেই হাতির দাঁতের জাপানী কাজ, ব্যাদিত মুখে হুঙ্কার, অবলীলায় লুটিয়ে আছে তার দুরন্ত লেজ। সেই সঙ্গে একটা চিঠি, সেই পরিচিত হস্তাক্ষর:

'ষাট বছর আগে এই সিংহটি আমায় একজন উপহার দিয়েছিলেন। খুবই বুড়ো ছিলেন তিনি... আমি এখন যেমন বুড়ো... আমায় তিনি তাঁর শেষের শান্ত আনন্দ বলে ডাকতেন। যেমন আমি এখন ডাকি। বলেছিলেন তাঁর মতো বয়সে আমার শেষ শান্ত আনন্দ ব'লে যাকে জানব তাকে যেন সিংহটা দিয়ে যাই। এবার আপনার কাছে অনুরোধ: সিংহটা নিন, আমি যত দিন বেঁচে রইলাম, ততদিন সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকুন, তারপর শেষ যে লোকটি আপনাকে আরো বাঁচাবে, আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে, ভালোবাসাবে,

তাকে সিংহটা দিয়ে যাবেন। পুরুষ থেকে পুরুষানুক্রমে লোকে যেন এই শান্ত আনন্দ পেয়ে যায়, যেন তাকে সঙ্গ দিয়ে যায় সূর্য, বাসন্তী বাতাস, নদী, পাহাড়ের চূড়ো…'

চোখ তুললাম আমি। মহিলাটি নেই। আমার দিকে চেয়ে আছে সিংহ। পরাক্রান্ত, স্থির, অবলীলায় লুটিয়ে আছে তার দুরন্ত লেজখানা।

মনে মনে জেনে রাখলাম: নাতালিয়ার আদেশ আমি পালন করব, অন্য হাতে তুলে দিয়ে যাব সিংহ। দেবার মতো লোক মিলবে বৈকি। সবই আমার এখনো সামনে। শিব, শুভ, অশুভ, ক্লিষ্ট, তিক্ত…

সবই এখনো সামনে।

চেঙ্গিস আইতমাতভ

সৈনিকের ছেলে

বাবাকে ও প্রথম দেখেছিল সিনেমায়। তখন সে বছর পাঁচেকের শিশু।

ঘটনাটা ঘটেছিল ওই মস্ত শাদা খোঁয়াড়টায়, যেখানে ভেড়ার লোম ছাঁটা হয় প্রতি বছর। খোঁয়াড়টা টালি দিয়ে ছাওয়া, সভখোজ বসতির পেছনে পাহাড়ের তলায় রাস্তার পাশে।

এখানে সে এসেছিল মায়ের সঙ্গে। মা জিঙ্গুল সভখোজের পোস্টাপিসে টেলিফোনিস্ট, প্রতি বছর গ্রীষ্মে লোম ছাঁটার মরশুম শুরু হতেই সে ছাঁটাই ঘাঁটিতে সহায়ক কর্মী হিসাবে যোগ দেয়। বীজ বোনা ও ভেড়ার বাচ্চা দেবার মরশুমের সময় দিন রাত কমিউটেটরের পাশে ওভারটাইম কাজ শেষ হতেই ছুটি নিয়ে সে এখানে চলে আসে এবং লোম ছাঁটাইয়ের শেষ দিনটা পর্যন্ত খাটে। লোম ছাঁটার মজুরি ভালোই, রোজগার মন্দ হত না। আর সৈনিকের বিধবা, প্রতিটি বাড়তি কোপেকই তার কাছে কতই না দামী। সংসারটা অবিশ্যি বড়ো নয় — নিজে আর ছেলেটি — তাহলেও সংসার সংসারই, শীতের জন্যে জ্বালানি জমাতে হয়, দাম বাড়ার আগেই ময়দা কিনে রাখতে হয়, কাপড় চোপড় আছে, জামা জুতো আছে... দরকার কী আর কম...

কারো কাছে ছেলেটিকে রেখে আসার মতো কেউ ছিল না। তাই সঙ্গে করেই নিয়ে আসে। সারা দিন সে এখানে ময়লা মেখে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াত লোম-ছাঁটিয়ে, রাখাল আর ঝাঁকড়া কুকুরগুলোর মধ্যে।

খোঁয়াড়ের দরজায় সিনেমার লোকদের আসতে সে-ই প্রথম দেখে এবং এই অসাধারণ সুখবর সবাইকে জানাতে সে-ই ছোটে প্রথম।

'সিনেমা এসেছে! সিনেমা!'

ছবি দেখান শুরু হয় কাজের পর, অন্ধকার হয়ে এলে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তার সময় আর কাটছিল না। তবে এ যন্ত্রণার পুরস্কার পায় সে। ফিল্মটা ছিল যুদ্ধ নিয়ে। খোঁয়াড়ের শেষে দুটো খুঁটির মাঝখানে ঝোলানো শাদা পর্দাটায় লড়াই শুরু হয়ে গেল, দুমদুম ক'রে উঠল গুলি, শিস দিয়ে ছুটল হাউই, সচকিত অন্ধকারটাকে একেবারে শাদা ক'রে দিলে, মাটিতে শুয়ে পড়ল সন্ধানীরা। হাউই নিভে যেতেই ফের এগুল তারা। এমন জোরে মেসিনগান চলল যে ছেলেটার বুক কেঁপে উঠল। হ্যাঁ, একেই না বলে যুদ্ধ!

মায়ের সঙ্গে সে বসেছিল লোমের গাঁইটের ওপর, অন্য সকলের চেয়ে পেছনে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল ভালো। তবে ওর অবশ্য ইচ্ছে ছিল একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে বসবে, যেখানে পর্দার কাছে মাটির ওপর সভখোজের ছেলেরা এসে বসেছিল। ইচ্ছে ছিল ওদের কাছে ছুটে যাবে, কিন্তু মা ধমক দিলে:

'চুপ কর, সকাল থেকে সন্ধে অবধি ছুটে বেড়াস, বসে থাক আমার কাছে,' এই বলে তাকে কোলে নিয়ে বসে।

প্রজেকটর ঝকঝক করছে, যুদ্ধ চলেছে। উদগ্রীব হয়ে লোকে দেখছে তা। মা নিঃশ্বাস ফেললে, ভয় পেয়ে চমকে উঠল, আর ট্যাংক যখন সোজা ছুটে এল ওদের দিকে তখন জোরে বুকে চেপে ধরল ছেলেটিকে। পাশেই গাঁইটের ওপর বসেছিল কে একজন মেয়ে, জিভ দিয়ে আফসোসের শব্দ ক'রে বিড়বিড় করলে:

'মা গো! কী যে কাণ্ড, হেই ভগবান!'

ছেলেটার কিন্তু অত ভয় লাগছিল না, বরং ফ্যাশিস্টরা মরবার সময় ফূর্তিই লাগছিল খুব। আর আমাদের সৈন্য যখন

উল্টে পড়ছিল, তখন তার মনে হচ্ছিল পরে নিশ্চয় ওরা উঠে দাঁড়াবে।

মোটের ওপর যুদ্ধে লোকে যেভাবে ধরাশায়ী হয় সেটা সত্যি খুব মজার। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার সময় ঠিক ওরা যেভাবে পড়ে, একেবারে সেই রকম। এমন কি ছুটতে ছুটতেই এমন ভাবে ও পড়ে যেতে পারে যেন কেউ লেঙ্গি মেরেছে। বেশ লাগে বটে, কিন্তু কী হয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে ফের আক্রমণ চালালেই হল, চোট লাগার কথা মনেই থাকবে না। এরা কিন্তু উঠে দাঁড়াচ্ছে না, মাটির ওপর কালো কালো নিশ্চল ঢিপির মতো পড়েই থাকছে। অন্য রকম ভাবেও পড়তে পারে সে, পেটে গুলি লাগলে যেভাবে ওরা পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যায় না তারা, প্রথমে পেট চেপে ধরে, তারপর ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ে ঘাসের ওপর, হাত থেকে বন্দুক খ'সে যায়। তারপর অবশ্য সে বলে দিত মরি নি, ফের লড়াই করত। অথচ এরা কিন্তু উঠছে না।

যুদ্ধ চলছে, ঝিকঝিক করছে প্রজেকটর। এবার গোলন্দাজদের দেখা গেল পর্দায়। অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণের মুখে, বিস্ফোরণ আর ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে ট্যাংকধ্বংসী কামান ঠেলে নিয়ে চলেছে গোলন্দাজরা, ঠেলছে একটা চড়াই উজিয়ে। দীর্ঘ চওড়া চড়াই, আকাশের প্রায় আধখানা তাতে ঢাকা। আর সেই লম্বা চড়াই ভেঙে বিস্ফোরণের কালো ঝলকের মধ্য দিয়ে কামান ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেছে ছোট একদল গোলন্দাজ। তাদের ভাবভঙ্গিতে, তাদের চেহারায় এমন কী যেন একটা ছিল যাতে বুক দুরদুর ক'রে ওঠে গর্বে, যন্ত্রণায়, ভয়ংকর মহান কিছু একটার প্রতীক্ষায়। দলে ওরা সাত জন। পোষাক জরাজীর্ণ। একজন গোলন্দাজের চেহারাটা ঠিক রুশীর মতো নয়। হয়ত কাজাখ, কি বুরিয়াৎ কিংবা অন্য কোনো জাত। হয়ত

ছেলেটা তার দিকে নজরই দিত না, যদি না মা ফিসফিসিয়ে উঠত:

'দ্যাখ, দ্যাখ, তোর বাবা...'

আর সেই মুহূর্ত থেকেই সে হয়ে উঠল তার বাবা। আর গোটা ফিল্মটাও শুধু তাকে নিয়ে, তার বাবাকে নিয়ে। মনে হল বাবা একেবারে ছোকরা, ঠিক সভখোজের ছোকরাগুলোর মতো। মাথায় উঁচু নয়, গোলগাল মুখ, চঞ্চল চোখ। ধোঁয়ায় ময়লায় কালো তার মুখখানায় আক্রোশে ধ্বকধ্বক করছিল তার চোখ, গোটা শরীরখানা তার বেড়ালের মতো একরোখা, উদ্‌গ্রীব। কামানের চাকায় কাঁধ দিয়ে নিচের দিকে কাকে যেন সে হাঁকলে, 'গোলা! জলদি!' নতুন বিস্ফোরণের গর্জনে চাপা প'ড়ে গেল তার স্বর।

'মা, এই আমার বাবা?' ফের মাকে জিজ্ঞেস করলে আভালবেক।

'কী বললি?' ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সে, 'চুপ ক'রে বসে দ্যাখ।'

'তুমি যে বললে ও আমার বাবা।'

'বটেই তো, তোর বাপ। তবে কথা বলিস না, অন্যের অসুবিধা হবে।'

ও কথা কেন সে বলেছিল? কী কারণে? হয়ত নেহাৎ এমনি, কিছুই না ভেবে, হয়ত স্বামীর কথা মনে পড়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ছেলেটি কিন্তু বিশ্বাস করলে। ভারি খুশি হল সে, বিহ্বল হয়ে পড়ল এই অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত আনন্দে। শিশুর মতোই বাবার জন্যে, সৈনিকের জন্যে মন তার গর্বে ভ'রে উঠল। একেই বলে বাবার মতো বাবা! এ তো ওই, তারই বাবা, আর ছেলেরা বলে কিনা তার বাবা নেই। এবার স্বচক্ষে দেখুক ওর বাবাকে, রাখালরাও সব দেখুক! পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে

বেড়ায় এই রাখালরা, ছেলেদের সবার খবরাখবর জানবে কোত্থেকে। ও তাদের ভেড়াগুলোকে ছাঁটাই ঘাঁটিতে ঢোকাতে সাহায্য করে, কুকুরগুলো মারামারি শুরু করলে ও ছাড়িয়ে দেয়, আর ওরা কেবলি জেরা ক'রে বিরক্ত ধরিয়ে দেয়। দুনিয়ায় যত রাখাল আছে সবাই তাকে দেখলেই প্রশ্ন করবে:

'কী রে জিগিৎ, নাম কী তোর?'

'আভালবেক।'

'কার ব্যাটা তুই?'

'তক্তসুনের ছেলে!'

রাখালগুলো চট ক'রে বুঝে উঠতে পারে না কী ব্যাপার। জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে ফের শুধোয়:

'তক্তসুনের? কোন তক্তসুন?'

'আমি তক্তসুনের ছেলে!' জোর দিয়ে জানিয়ে দেয় সে।

এই কথাই বলতে বলেছে মা, কানা ঠাকুমা বলে দিয়েছে বাপের নাম কখনো ভুলবি না। ভুলে গেলে কান মলে দিত বুড়ি। ভারি রাগী।

'আরে, দাঁড়া দাঁড়া, তুই না টেলিফোনিস্টের ব্যাটা, ওই যে ডাকঘরে কাজ করে, তাই না?'

'উহুঁ, আমি তক্তসুনের ছেলে,' নিজের জেদ ছাড়ে না সে।

তখন ঠাহর হয় রাখালদের।

'ঠিক, ঠিক। তুই তো তক্তসুনেরই ছেলে। বাঃ, সাবাস! আমরা শুধু তোকে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। রাগ করিস না জিগিৎ, সারা বছর আমাদের তো পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে দিন কাটে, তোরা এদিকে ঘাসের মতো বাড়ছিস। ছেলেদের ঠিকমতো চিনে রাখাই দায়।'

তারপর নিজেদের মধ্যে বহুক্ষণ তার বাপের কথা আলোচনা করে ওরা। ফিসফিস করে। বলে, ফ্রণ্টে যখন যায়

তখন একেবারে ছোকরা, অনেকে তাকে ভুলেই গেছে। তবে ভাগ্যি ভালো যে ছেলে একটি আছে তার। কত লোক গিয়েছিল বিয়ে না হতেই, বংশ রক্ষার মতো তাদের কেউ আর নেই!

আর এখন, মা যখন ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, তোর বাপ,' সেই মুহূর্ত থেকেই পর্দার সৈনিকটি তার বাপ হয়ে দাঁড়াল। সত্যি সত্যিই লড়াইয়ের পোষাকে বাঁকা টুপি পরা তার বাবার ছবিটার সঙ্গে খুব মিল। সেই ফোটো-টা, যেটা তারা পরে বড়ো ক'রে কাচ আর ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে।

ছেলের চোখ দিয়ে আভালবেক বাবাকে দেখছে এই এক ঘণ্টা ধরে, বাপের জন্যে ভালোবাসা আর কোমলতার একটা উত্তপ্ত অচেনা তরঙ্গে বুক তার ভ'রে উঠল। পর্দায় বাবা যেন জানে যে ছেলে তাকে দেখছে, সিনেমায় তার ক্ষণিক জীবনটাকে সে যেন ঠিক তেমনি ক'রেই দেখাতে চায় যাতে ছেলে তাকে চিরকাল মনে রাখে, চিরকাল গর্ব করে এই গত যুদ্ধের সৈনিককে নিয়ে। আর সেই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধটা আর ছেলের কাছে মজার বলে মনে হল না, লোকেরা যখন ধরাশায়ী হচ্ছে তার মধ্যে তখন হাসির কিছু আর রইল না। যুদ্ধ হয়ে উঠল গম্ভীর, বিপজ্জনক, ভয়ংকর একটা ব্যাপার। আর আপনজনের জন্যে, যে লোকটাকে কখনো সে পায় নি তার জন্যে উদ্বেগ অনুভব করতে লাগল সে এই প্রথম।

ঝিকঝিক করছে প্রজেকটর, যুদ্ধ চলছে। সামনে দেখা যাচ্ছে ট্যাংকের আক্রমণ। ভয়ংকর মূর্তিতে এগুচ্ছে সেগুলো, মাটি ছিঁড়ছে ক্যাটারপিলারে, বুরুজ ঘোরাচ্ছে, চলতে চলতে গুলি চালাচ্ছে নল দিয়ে। আর আমাদের গোলন্দাজরা একেবারে অবসন্ন হয়ে কামান ঠেলে তুলছে ওপর দিকে। 'তাড়াতাড়ি!

জলদি করো বাবা, ট্যাংক আসছে, ট্যাংক!' বাপকে তাড়া দিল ছেলে। শেষ পর্যন্ত উঠে এল কামান, ঝোপের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গিয়ে গোলা দাগা শুরু হল ট্যাঙ্কের ওপর। জবাবে ট্যাংকগুলোও আগুন ছড়াতে লাগল। কত ট্যাংক। ঘোরালো হয়ে উঠল সব।

ছেলের মনে হল যেন সে নিজেই দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, বাপের পাশেই, যুদ্ধের গর্জন আর আগুনের মাঝখানে। কালো ধোঁয়া তুলে যখন পুড়ে যাচ্ছিল কোনো ট্যাংক, চাকা থেকে যখন ছিটকে যাচ্ছিল ক্যাটারপিলার, কানার মতো হিংস্র ভাবে যখন একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তারা, তখন মা-র কোল থেকে সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। আর কামানের কাছে যখন আমাদের সৈন্যেরা লুটিয়ে পড়ছিল, তখন চুপ ক'রে গুটিয়ে আসছিল সে। গোলন্দাজদের সংখ্যা কেবলি কমছে। মা কাঁদছিল, মুখখানা তার ভেজা, তপ্ত।

ঝিকঝিক করছে প্রজেকটর, যুদ্ধ চলছে। নতুন তেজে ফুঁসে উঠল লড়াই। কেবলি কাছিয়ে আসছে ট্যাংকগুলো। বাপ তার কুঁজো হয়ে চিৎকার ক'রে ক্ষেপার মতো কী যেন বলছে টেলিফোনে। কিন্তু গর্জনের মধ্যে কিছুই শোনা গেল না। কামানের কাছেই আরো একজন সৈন্য পড়ে গেল। ওঠবার চেষ্টা করলে সে, কিন্তু পারলে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে, রক্তে কালো হয়ে উঠল মাটি। এখন রইল কেবল দুজন, তার বাবা আর একজন সৈন্য। আরো একবার গোলা দাগলে তারা, তারপর পর পর দুবার। কিন্তু চেপে ধরেছে ট্যাংকগুলো। কামানের পাশেই আরো একটা গোলা ফাটল। বিস্ফোরণ। আগুন আর অন্ধকার। মাটি ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়াল কেবল একজন, তার বাবা। ফের কামানে হাত লাগাল সে। নিজেই

গোলা ভরে নিজেই চালাল। এই তার শেষ গোলা দাগা। ফের একটা বিস্ফোরণ জ্বলে উঠল পর্দায়। বাপের কামানটা দূরে ছিটকে গেল। বাবা কিন্তু তখনো বেঁচে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, আগুনে পোড়া, পোষাকের জায়গায় জায়গায় ধোঁয়া উঠছে, এগিয়ে গেল ট্যাঙ্কের মুখে। হাতে তার হাত-বোমা। কিছুই সে দেখছে না, শুনছে না। শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করছে সে।

'দাঁড়া! বলছি!' হাত-বোমা ছুঁড়লে সে, এই ভঙ্গিতে একমুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, আক্রোশে যন্ত্রণায় মুখ তার বিকৃত।

ছেলেকে জোরে চেপে ধ'রে রেখেছিল মা। কোল ছেড়ে ছুটে বাপের কাছে যেতে চাইছিল সে, কিন্তু ট্যাঙ্কের মধ্য থেকে তখন এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল, কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল বাবা। মাটির ওপর গড়িয়ে গেল সে, ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফের দুহাত ছড়িয়ে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ল...

থেমে গেল প্রজেকটর, ছিন্ন হয়ে গেল যুদ্ধ।

এটা রিলের শেষ। আলো জ্বালিয়ে অপারেটর নতুন রিল চাপাতে লাগল।

আলো জ্বলতেই সবাই সিনেমার জগৎ, যুদ্ধের জগৎ থেকে নিজেদের বাস্তব জীবনে ফিরে মিটমিট করতে লাগল চোখ। এই সময় ছেলেটা লোমের গাঁটরি থেকে নেমে ছুট দিলে সঙ্গীদের দিকে, উল্লাসে চ্যাঁচাতে লাগল:

'দেখলি তোরা? এ আমার বাবা। দেখলি? আমার বাপকে ওরা মারলে...'

সকলের কাছেই এটা অপ্রত্যাশিত, কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কী ব্যাপার। ছেলেটা কিন্তু সগর্বে চিৎকার করে ছুটল

পর্দার দিকে যেখানে প্রথম সারিতে বসে আছে তার সঙ্গী ছেলেরা, যাদের মতামত তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মুহূর্তের জন্যে নেমে এল একটা অদ্ভুত, অস্বস্তিকর নীরবতা। এই যে ছেলেটা আগে কখনো তার বাপকে দেখে নি — সে ছেলের এমন অস্বাভাবিক আনন্দের কারণটা কারো মাথায় এল না। কিছুই বুঝল না কেউ, শুধু বিমূঢ় হয়ে চুপ ক'রে মাথা ঝাঁকালে। অপারেটরের হাত থেকে রিলের বাক্সটা পড়ে গেল, ঝনঝন শব্দ ক'রে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গড়িয়ে গেল সেটা। কিন্তু কেউ মন দিলে না সেদিকে, অপারেটর নিজেও সেটা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না। ওদিকে ক্ষুদে সৈন্যটি, মৃত সৈনিকের ওই ছেলেটি তার যা বলবার সেটা ব'লেই চলেছে:

'দেখলি তোরা, এ আমার বাবা!.. আমার বাবাকেই ওরা মারলে...' লোকে যতই চুপ করে থাকছে ততই উত্তেজনা বাড়ছিল তার, বুঝতে পারছিল না কেন সবাই তার মতোই খুশি হয়ে উঠছে না, গর্ব করছে না তার বাবাকে নিয়ে।

বড়োদের কে একজন অসন্তোষের স্বরে শাসিয়ে উঠল:

'শ্, শ্, চুপ কর, বলতে নেই।'

অন্য একজন আপত্তি করলে:

'তাতে হয়েছে কী। ওর বাপ ফ্রন্টে মারা গেছে। মিথ্যে তো নয়?'

সত্যি কথাটা বললে তার পাশের একটি ছেলে, ইশকুলে পড়ে:

'আরে না, এ তোর বাবা নয়, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন, মোটেই তোর বাবা নয়, অ্যাক্টর। অপারেটর কাকুকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।'

ছেলেটার বেদনাবিধুর অপরূপ মোহটাকে বড়োরা নিজেরা কেউ ভাঙতে চাইছিল না, তাই আশা করছিল আগন্তুক অপারেটরই যা সত্যি সেটা বলুক। সবাই মাথা ফেরাল তার দিকে। লোকটা কিন্তু চুপ ক'রে রইল, প্রজেকটরটা নিয়ে এমন ভাবে লাগলে যেন ভয়ানক ব্যস্ত।

'বাজে কথা, আমার বাবা! আমার!' চুপ করলে না ছেলেটা।

'কে তোর বাবা? কোনটা?' ফের জিজ্ঞেস করলে পাশের ছোকরাটা।

'হাত-বোমা নিয়ে ট্যাঙ্কের দিকে গেল যে। কেন দেখিস নি? এই ভাবে পড়ে গেল!' মাটির ওপর ধপাস ক'রে পড়ে গড়াল ছেলেটা, দেখিয়ে দিল কী ভাবে তার বাবা প'ড়ে গিয়েছিল। দেখাল একেবারে হুবহু যা ঘটেছিল সেই ভাবে। দু'হাত ছড়িয়ে পর্দার সামনে চিৎ হয়ে পড়ে রইল সে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে উঠল দর্শকরা। ও কিন্তু প'ড়ে রইল মরার মতোই, হাসল না। ফের একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা নেমে এল।

'হল কী তোর, ছেলেটাকে থামা, জিঙ্গুল,' ভর্ৎসনার স্বরে বললে একজন বয়স্কা রাখালিনী, সবাই দেখলে আহত কঠোর মুখে চোখে জল নিয়ে মা এগিয়ে গেল ছেলের দিকে, মাটি থেকে তুলল তাকে।

'চল খোকা, বাড়ি যাই। ও তোরই বাপ,' মৃদু স্বরে বললে সে, ছেলেকে টেনে নিয়ে গেল খোঁয়াড় থেকে।

অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে চাঁদ। কালচে নীল রাতের আকাশে ধবধব করছে পাহাড়ের চুড়ো, নিচে কালো দিঘির মতো প'ড়ে আছে বিপুল সূচীভেদ্য স্তেপ...

আর এতক্ষণে জীবনে এই প্রথম শোক কাকে বলে সে টের পেল। যুদ্ধে নিহত বাপের জন্যে হঠাৎ অসম্ভব ক্ষোভ আর কষ্ট হল তার। হঠাৎ ইচ্ছে হল মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে, মাও যেন কাঁদে তার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু চুপ ক'রে রইল মা, সেও চুপ ক'রে রইল হাত মুঠ ক'রে, কান্না গিলে।

আর বহুকাল আগে যুদ্ধে মারা যাওয়া তার বাপ যে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার মধ্যে বেঁচে উঠতে শুরু করেছিল, সেটা সে জানত না।

আবদুল্লা কাহহার

মহল্লা

চুল্লির চাকতিটা খুলে দাদী রোখাৎ পায়ে আঁচ পোয়াচ্ছিল। কিছুকাল থেকে পা দুখানা বড়ো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, কনকন করছে, ঘর তেমন ঠাণ্ডা না হলেও ভারি শীতে জমে যাচ্ছে সে। নাতি বইয়ের মলাট ছিঁড়ে ফেলেছিল, জানলার কাছে সেটা আঁটা দিয়ে জুড়তে জুড়তে বুড়ো বললে:

'আগুন পোয়াতে হয় কী ক'রে তা আর তোমায় শেখানো গেল না! চুল্লির দরজা খোলা রাখা আর আকাশ গরম করা একই কথা।'

দাদী রোখাৎ দরজা বন্ধ ক'রে সোফায় গা এলালে। তারপর শুয়েই থাকল। প্রথমটা উঠতে ইচ্ছে করছিল না, পরে আর উঠতেই পারল না। তৃতীয় দিনে বুড়ি মারা গেল।

হিকমৎ-ববো দাঁড়িয়ে রইল একেবারে বজ্রাহতের মতো। ঘরে যখন ছুটে এল ছেলে, পুত্রবধূ, নাতিরা, কান্না উঠল বাড়িতে, তখন ধীরে ধীরে বুড়োর কাঁপুনি ধরল। 'এ কী করলে আল্লা সর্বশক্তিমান? আমার এ কী দশা করলে? হুড়মুড়িয়ে সবই যে নেমে এল আমার ওপর...' তিপ্পান্ন বছর বুড়ো বুড়ি একসঙ্গে কাটিয়েছে। একই থালা থেকে খেয়েছে, গুটি পোকার মতো একই আচ্ছাদনে ঢাকা পড়েছে তাদের চিন্তা ভাবনা, অভ্যাস। কল্পনাই করা যেত না যে এদের একজন ছেড়ে যাবে, একজন থাকবে...

কৃত্যকর্ম করার পর কাফন যখন কাঁধে উঠল, তখন হিকমৎ-ববোর ভেতরে একটা কী যেন ছিঁড়ে গেল, বুকের মধ্যে রইল শুধু একটা শূন্যতা আর ব্যথা। কেঁদে ফেলল সে। মাটি দেওয়া হল রোখাৎকে, সমাধির পর ঘর আর আঙিনা ভ'রে উঠল লোকে। সমবেদনা জানাতে এল মহল্লার প্রায় সবাই। শোকার্ত

হিকমৎ-ববো মাথা নুইয়ে উদাসীনের মতো বসে রইল এক কোণে, যেন দুনিয়ায় তার আর কেউ নেই, কিছু নেই।

পরের এক সপ্তাহে বুড়ো একেবারে ভেঙে পড়ল, যেন সেচ না পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া একটা অংকুর। মাঝে মাঝে এমন চুপচাপ শুয়ে থাকত যে বোঝা কঠিন হত মরে আছে নাকি বেঁচে, হয়ত বা মরেই গেছে। মাঝে মাঝে মনে হত, বুড়ি যখন তার ঠাণ্ডা পা গরম করতে বসেছিল তখন কী বিচ্ছিরি ভাবেই না সে ধমক দিয়েছিল স্ত্রীকে। চমকে চমকে উঠত সে, যেন ভোঁতা ছুঁচ দিয়ে কে তাকে বেঁধাচ্ছে।

ঘরের লোকেরা হিকমৎ-ববোকে একলা থাকতে দিত না। ছোট নাতি আসত তার খেলনা নিয়ে, কিণ্ডেরগার্টেন থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই এসে জুটত দাদুর কাছে। বড়ো নাতিটা দিনে বার পাঁচেক ক'রে ফটো তুলত দাদুর, নানা রকম ভঙ্গিতে। ছেলে তাকে ট্যাক্সি ক'রে শহর ঘোরাত, হিকমৎ-ববোকে যদি বা বহু কষ্টে রাজী করানো যেত, সখেদে বিড়বিড় করত:

'তোর মা বেঁচে থাকতে তো আমাদের গাড়ি চাপিয়ে ঘোরাবার কথা তোর মনে হয় নি।'

একদিন জোর বৃষ্টি হল, আঙিনায় ছেয়ে রঙের যে তুষারগুলো তখনো লেগেছিল তা শেষ পর্যন্ত ধুয়ে সাফ হল। আইভানে* থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বুড়ো, চেয়েছিল বাতাসে জড়ানো ভারি ভারি বৃষ্টি ধারার দিকে। হঠাৎ দেখল তন্দুরের কাছে পুরনো একটা গালোশ** প'ড়ে আছে। বৌয়ের গালোশ চিনতে দেরি হল না তার। বেচারা রোখাতের পা শেষের দিকে ফুলে গিয়েছিল, গালোশের ওপর দিকটা তাই ইচ্ছে ক'রে

---

* বারান্দা। — সম্পাঃ

** জুতোর রবারের ঢাকনি। — সম্পাঃ

কাটা। বুড়ো সেটাকে কুড়িয়ে মুছে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। বুকে তার ফের সেই আর্ত শূন্যতাটা ফিরে এল — ঘর থেকে মড়া বার করার সময় যা হয়েছিল। সন্ধে পর্যন্ত কাঁদল সে।

রাতে হিকমৎ-ববোর ঘুম হত না। ওষুধ খেলেও ঘুমের আমেজ আসতে না আসতেই ঘুম ভেঙে যেত মাঝ রাতে, নিশ্চল হয়ে ব'সে থাকত সকাল পর্যন্ত, নয়ত চুপচাপ পায়চারি করত। আর কেবলি মনে হত রোখাতের কথা। প্রায়ই সে আচ্ছন্ন হয়ে যেত স্মৃতিতে, মাঝে মাঝে মনে হত যেন জীবন আগের মতোই বয়ে চলেছে, মাত্র দিন কয়েকের জন্যে বৌ কোথাও গেছে বোধ হয়। তারপর হঠাৎ আকস্মিক কোনো একটা শব্দেই বাস্তবে ফিরত সে, যেন ফাঁসীর আসামীর কুঠরিতে হঠাৎ ঘণ্টার শব্দটা এসে পেঁছেছে। বাপের এ অবস্থা দেখে একেবারে দমে গেল ছেলে বৌ।

একবার উধাও হল বুড়ো। সারা দিন খোঁজাখুঁজি চলল সর্বত্র — পাড়াপড়শীদের বাড়িতে, আত্মীয়স্বজনের ওখানে, চেনা পরিচিতদের কাছে। অ্যাম্বুলেন্স সেণ্টারে গিয়েও খোঁজ নেওয়া হল, শুধু কবরখানায় যাবার কথা কেউ ভাবে নি। বুড়ো ছিল কিন্তু কবরখানায়। প্রায়ই বৌয়ের কবরের কাছে গিয়ে বসত সে, ঘণ্টা দুয়েক বসে কাটাত। এবার সে গিয়েছিল সোজা কবরখানার দপ্তরে, অনেক পেড়াপীড়ি ক'রে (কবরখানার কর্তা কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না) সে কথা আদায় করে যে বৌয়ের কবরের পাশে তার জন্যে আরো একটি কবর খুঁড়তে হবে। সূর্য পাটে বসার সময় বাড়ি ফিরল হিকমৎ-ববো। কে একজন তাকে বাস থেকে নামতে সাহায্য করে, খানিকটা এগিয়েও দেয়। গলির মোড়ে ব'সে থাকত এক মুচি, সে লক্ষ করলে বুড়োর পা আর চলছে না। ছুটে গিয়ে সে তাকে নিয়ে আসে নিজের কাছে, চা খাওয়ায়। পরে বলে:

'মন খারাপ কোরো না বাপজান, বলার কী আছে, বুড়ির তোমার তুলনা নেই। কত লোক কবরে এসেছিল দেখেছিলে তো। আই আল্লা, মহল্লায় সেদিন লোকের পায়ে পায়ে জমিন দেবে গেছে এক মিটার...'

হয় চায়ের জন্যে নয়ত মুচির কথায় বুড়ো খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। গর্ব নিয়েই বললে:

'হ্যাঁ। আজো পর্যন্ত লোকে তার কথা বলে! আর কাজ করত যেখানে, কতদিন তো হয়ে গেল, কেউ ভোলে নি!'

রাস্তায় ভিড় জমে গেল হিকমৎ-ববোর চারপাশে — ঘরের লোক, পাড়ার লোক। কেউ কেউ রেগে গজরালে, কেউ মায়া ক'রে মৃদু ভর্ৎসনা করলে, কেউ বা আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে... একেবারে ঠিক বাড়ির কাছে দেখা হল ওদের ডাক্তারের সঙ্গে। প্রথমটা সে কড়া ক'রেই ভুরু কুঁচকেছিল, পরে হিকমৎ-ববোর অবস্থা দেখে আলাপ শুরু করলে রোখাৎকে নিয়ে।

'সত্যি, আম্মাজানের কথা আর মুখে বলব কী, তবে একটা কথা বাবাজান,' এই বলে বক্তৃতার ভঙ্গিতে আঙুল তুললে সে, 'আমাদের মহল্লায় সামোভার একটা খুবই দরকার। বালতি আটেকের মতো, কমে চলবে না। কবর দেবার দিন সেটা খুবই টের পাওয়া গেছে!'

বুড়ো এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার বলে চলল:

'তাহলে কী বলেন, মহল্লা থেকে চাঁদা তোলা যাক। লোক পিছু তাহলে কত ক'রে পড়বে?'

হিকমৎ-ববো চটে উঠল:

'একটা সামোভারের ব্যবস্থা আমার ছেলে যে ক'রেই হোক করবে। ফতুর হয়ে যাবে না।'

'সে তো ভালো কথা,' হাসল ডাক্তার।

সামোভার আর চা-পানের দিকে বুড়োর অবশ্য গরজ ছিল না: নিজের জন্যে কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা কি আর খামোকা করেছে। কিন্তু মহল্লার কাছে প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছে তখন বুক বেঁধে কাজে লাগতেই হল। ছেলের কাছে টাকা নিয়ে সামোভারের খোঁজে বেরুল সে। দেখা গেল জিনিসটা জোগাড় করা সহজ নয়, প্রায় মাটি থেকে তামা বার করে বাসন বানানোর ব্যাপার। এমন দোকান রইল না যেখানে সে যায় নি, এমন ম্যানেজার ছিল না যার কাছে সে আর্জি করে নি। ছেলে বৌ অবাক মানল: এত উদ্যোগ বুড়োর এল কোথা থেকে?

শেষ পর্যন্ত দরকারী সামোভারটা মিলল — অবিশ্যি মহল্লার হোমরা-চোমরা কয়েকজনের সাহায্য না নিয়ে নয়। মহল্লা কমিশনের সভাপতি সে সামোভার গ্রহণ করলে সভা ক'রে আনুষ্ঠানিক ভাবে। হিকমৎ-ববোকে যখন তিনি ধন্যবাদ জানালেন, জোর হাততালি পড়ল। এই সময় কে একজন উঠে বললে যে সামোভার হলেই সব হবে না, মহল্লায় প্রত্যেকদিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত দিন দুই তিন বিয়ে সাদী কি পাল পার্বণ লেগেই আছে। লোককে পাড়াপড়শীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসন কোসন, জাজিম, চেয়ার, হাঁড়িকুঁড়ি চেয়ে আনতে হয়... মহল্লার লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বরাবরের মতো, ধরা যাক শ দেড়েক লোকের জন্যে যা দরকার সব ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? প্রস্তাব সমর্থিত হল এবং এত বড়ো দায়িত্বের কাজটা কার ওপর দেওয়া যায় সভাপতি এ কথা জিজ্ঞেস করতেই সবাই হৈচৈ ক'রে আঙুল দেখালে হিকমৎ-ববোর দিকে। বুড়ো উঠে দাঁড়াল, ভেবেছিল সজোরে আপত্তি জানাবে, কিন্তু সবাই হাততালি দিয়ে ওকে আর কথা কইতেই দিলে না, বুড়ো হার মানলে।

কতগুলো পরিবার আছে মহল্লায়? সবাই তো আর নিজেরা সেধে চাঁদা দিয়ে যাবে না। অনেকের কাছেই যেতে হয় একাধিকবার। কেউ বলে 'কাল আসবেন,' কেউ বলে 'অমুক লোকটা ওইটুকু দিয়েছে, আমায় কেন এত দিতে হবে?' কেউ আবার অবাক হয়ে হাঁ ক'রে তাকায় — গোটা ব্যাপারটা তাকে নতুন ক'রে বোঝাতে হয়...

সকাল থেকেই বুড়ো আজকাল পড়শীদের বাড়ি ছোটে। কিছুটা টাকা উঠলেই দোকানে দোকানে ঘোরে। হাতে তার আর ফাঁকা সময় রইল না, কেবল মাঝে মধ্যেই সুযোগ ক'রে যেতে হত বুড়ির কবরে।

শেষ পর্যন্ত দরকারী বাসন কোসন সব জুটিয়ে তা ইশকুলের চালা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হল। কিন্তু অচিরেই মালুম হল, এ দৌলত সংগ্রহ করার চেয়ে তা রক্ষা করাটা অনেক বেশি কঠিন। লোকে নেয়, সময় মতো ফেরত দেয় না, তাই গিয়ে তাগাদা দিতে হয়। কেউ আবার ফেরত দেবার সময় নিয়ে আসে নল-ভাঙা কেটলি, সিগারেটের আগুনে পোড়া জাজিম, দাগ-ধরা টেবল, বাঁকাচোরা কাঁটা, কখনো বা তা একেবারেই ভাঙা, তার ওপর আবার বেহায়ার মতো চোটপাট করে: সবই নাকি অমনিই ছিল। এমন বেয়াদবদের জন্যে কম বক্তৃতা করতে হয় নি বুড়োকে, তবে আল্লার দোয়ায় লোকে শীগগিরই ধাতস্থ হল. ঝঞ্ঝাট খানিক কমল...

বসন্ত শেষ হতে চলেছে। শহরে গাছ পোঁতার পালা শেষ হল, কোন মহল্লা বৃক্ষরোপণ অভিযান ভালো ভাবে চালিয়েছে, কারা পরিকল্পনা পূরণ করে নি, তাই নিয়ে লেখা বেরুতে লাগল কাগজে। আদর্শ মহল্লা হিসাবে নাম বেরুল ইয়াঙ্গি মহল্লার, তার সম্পর্কে লেখা হল: 'প্রতি বছর শহরের ইয়াঙ্গি মহল্লা বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা অতিপূরণ করছে...' খবরটা

পড়ে শুনিয়ে বড়ো নাতি হো-হো ক'রে হেসে উঠল: গত বছরে যত গাছ পোঁতা হয়েছিল তার বেশির ভাগই শুকিয়ে গেছে।

বুড়ো রাস্তায় গিয়ে লক্ষ করতে লাগল গাছগুলো। গত বছরে পোঁতা গাছ সে গুনলে এক হাজার সাত শ', তার মধ্যে বেঁচেছে শুধু আটশ' ছয়টি...

হিকমৎ-ববোর দু' পা-ই যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল সম্পাদকীয় দপ্তরে। যে ঘরটিতে তার যাওয়ার কথা, সেটা খোঁজাখুঁজি করার সময় বেশ সঙ্কোচ লাগছিল তার; কিন্তু আসল ব্যাপারটার বেলায় বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, এমন কি চেঁচামেচিই শুরু করে দিলে। চেয়ারে বসিয়ে ভদ্রতা করে অনুরোধ করা হল যেন সমস্ত প্রস্তাব তিনি কাগজে লিখে দেন। আর দু'দিন পরে সম্পাদক সমীপেষু স্তম্ভে প্রকাশিত হল তার চিঠি, তলে স্বাক্ষর: হিকমৎ নর্মাতভ, পেনসনভোগী...

সে দিন দুপুরের খাওয়ার পর বুড়ো বসেছিল গলির মোড়ে। জুতোয় পালিশ দিচ্ছিল মুচি, গাছ পোঁতার ব্যাপারে মহল্লা কী কেলেঙ্কারি করেছে সেই আলাপ তখনো চলছে। এমন সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মহল্লার সেক্রেটারি। বোঝা যায় ওপরওয়ালার কাছ থেকে কড়া ধমক খেয়েছে সে। হিকমৎ নর্মাতভকে চিনতে পেরে সে চ্যাঁচাতে লাগল:

'যত সব লোক, কাজ আর পেলেন না। আপনার কী দায় পড়েছিল, এক পা তো কবরে দিয়েই আছেন, কোথায় চুপচাপ বসে থাকবেন, না যত সব!'

বুড়ো মুখ ফেরাল তার দিকে, কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। ঘরে ফিরল মাথা নিচু করে। ছোকরাটা বলতে চাইছিল কী? তার কবরের কথাটা জেনে ফেলেছে নাকি?..

ঘরে গিয়ে দরখাস্ত লিখলে: 'কবরখানার ব্যবস্থাপক ও

কবরখনকদের সমীপে, সম্মান পুরঃসর নিবেদন এই যে বুড়ো পপলারের তলে যে কবরটা আমার নামে খোঁড়া হয়েছে সেটার আর দরকার নেই। প্রয়োজন মতো ব্যবহারের জন্য কবরটা দপ্তরে জমা দিচ্ছি। হিকমৎ-ববো নর্মাতভ।'

লেখাটা পাঠাবার জন্যে খামটা টেনে নিতেই তার খেয়াল হল কবরখানার ঠিকানাটা সে জানে না। তবে সত্যি, কবরখানার আদৌ কি আর কোনো ঠিকানা থাকে। খামটা বন্ধ ক'রে নাতিকে সে পাঠাল কবরখানার দপ্তরে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জায় বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ НАРОДОВ СССР

На языке бенгали